

ସବୁ କ

ବାରାୟନ ସାନ୍ଥାଲ



প্রবন্ধক

বাসুদেব সান্না



দে' জ পা ব লি শিং। ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

PRABANCHAK
Two Noveletters on Master Forger-artists in Bengali
by NARAYAN SANYAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
₹ 80.00

ISBN-81-7612-889-9

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৯৮

ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

অলংকরণ : লেখক

প্রফ নিরীক্ষা : শ্রীমতী সুচিত্রা সান্যাল, শ্রীসুবাস মৈত্র

৮০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সংগ্রহ করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

কিছুদিন আগে বন্ধুবরের আমন্ত্রণে এক গ্রাম্য আশ্রমিক বিদ্যালয়ে ছেলের একটা ক্লাস নিতে হয়েছিল। আমি ওদের ছবি আঁকার বিষয়ে কিছু বলেছিলাম। সেদিন আমার শ্রোতৃবৃন্দের বয়সের সীমা ছিল তিন থেকে দশ বছর। অবশ্য ক্লাসে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাও ছিলেন।

আশ্রমটি নদীয়ায়। তাহেরপুর-বীরনগরের মাঝামাঝি। নাম : উষাগ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠাতা : প্রচারবিমুখ নিরলস সেবাত্রী : শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী।

যাঁর আমন্ত্রণে ঐ পল্লীপ্রান্তে যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ বক্তৃতা বছরের বন্ধুত্ব। প্রথম পরিচয় — বরশুল গ্রামে ; ‘শক্তিগড় টাউনশিপ’ নির্মাণের প্রসঙ্গে। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের বি. ডি. ও. আর আমি সরকারী অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার।

দীর্ঘ বক্তৃতা বছর যোগাযোগটা অবিচ্ছিন্ন। উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন নানান বায়না নিয়ে : গোবরগ্যাস প্ল্যান্টের ডিজাইন, ধর্মগোলা বা তাঁতঘর। কারণ অবসরপ্রাপ্ত-জীবনে তিনি গ্রামোন্নয়ন নিয়ে যেতেছেন। অবসর নিয়েছেন কল্যাণী সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে। সাজ-পোশাকে নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ, আলাপচারীতে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না। টিপিক্যাল গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টারমশাই বলতে যা বোঝায়।

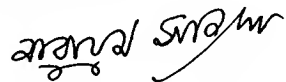
দেখলে কে বলবে ওঁর বাল্যকাল এবং স্কুলজীবন কেটেছে লন্ডনে! 1939-এ লন্ডন যুনিভার্সিটি থেকে সসম্মানে ইকনমিক্সে ডিগ্রি নেন। অবশ্য ক্লাস করেছেন কেম্ব্রিজে; কারণ যুদ্ধের ডামাডোলে লন্ডন যুনিভার্সিটির প্রাসাদগুলি তখন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের দখলে। ছিলেন কৃষ্ণ মেননের দক্ষিণহস্ত। ছাত্র-আন্দোলনের নেতা। কৃষ্ণ মেননের ন্যাশনাল হেরল্ডের সব দায়বদ্ধি তখন ওঁর কাঁধে—গ্রুফ-দেখা থেকে হিসাব রাখা। ঐ পত্রিকার তরফে তিনি বার্ট্রান্ড রাসেল, জি. বি. এস-এরও ইন্টারভিউ নিয়েছেন। 1946-এ ঐ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে ইউ. এন. ও.-র প্রথম অধিবেশনে প্রেস বক্সে বসে নোট নিয়েছেন, পত্রিকায় রিপোর্টও লিখেছেন!

ভারতীয় ও পাশ্চাত্যদর্শনের বিষয়ে কোন ‘অনুপপত্তি’ দেখা দিলে এই পল্লবগ্রাহী সাহিত্যিক আজও তাঁকে টেলিফোনে বিরক্ত করে গোবরগ্যাস-প্ল্যান্টের ডিজাইন করে দেবার পারিশ্রমিক আদায় করে থাকে।

আমাদের বন্ধুত্ব দেওয়া-নেওয়ার!

এই বইটি উৎসর্গ করছি সেই আপনতোলা আশ্চর্য পরম সুহৃদকে,

শ্রীজ্যোতি বসু।



চৈত্রশেষ, ১৩৯৩

এই লেখকের অন্যান্য বই

শিশুসাহিত্য
(যুক্তাক্ষর-বর্জিত)
হাতি আর হাতি

জাপান থেকে ফিরে
দণ্ডকশবরী
ডিজনেল্যান্ড

না-মানুষী বিশ্বকোষ (২)
(মেরুদণ্ডী)

কিশোর সাহিত্য
কালো-কালো
শার্লক ছেবো
কিশোর অমনিবাস
না-মানুষের পাঁচালী
রাষ্ট্রবল
না-মানুষের কাহিনী
নাকউচু

কথাসাহিত্য
ব্রাত্য
মনামী
অন্তরীনা
অলকনন্দা
নীলিমায় নীল
সত্যকাম
তাজের স্বপ্ন
পাশু পণ্ডিত
প্যারাবোলা স্যার
আবার যদি ইচ্ছা কর
অল্লীতার দায়ে
লালক্রিকোণ
পুরবৈয়া
মিলনাস্তক
হৌবল

বিজ্ঞানভিত্তিক
বিশ্বাসঘাতক
আজি হতে শতবর্ষ পরে
নক্ষত্রলোকের দেবতাস্বা
অবাক পৃথিবী
হে হংস-বলাকা

সদ্য-সাক্ষর সাহিত্য
গ্রাম্যবাস্তু
পরিকল্পিত পরিবার
দশেমিলি

রহস্যরোমাঞ্চ-গোয়েন্দা

জীবনীভিত্তিক
“আমি নেতাজীকে দেখেছি”
“আমি রাসবিহারীকে
দেখেছি”

লিডবার্গ
রোদ্যাঁ

নাগচম্পা
সোনার কাঁটা
মাছের কাঁটা
পখের কাঁটা
ঘড়ির কাঁটা
উলের কাঁটা
কুলের কাঁটা
অ আ ক-খুনের কাঁটা
সারমেয় গেড়কের কাঁটা
অচ্ছেদ্যবন্ধন
ছয়তানের ছাওয়াল
কাঁটায়-কাঁটায় (১)
কাঁটায়-কাঁটায় (২)

স্মৃতিচারণধর্মী
পঞ্চাশোর্ধ্বের
ষাট-একষষ্টি
আবার সে এসেছে ফিরিয়া

শিল্প-ভাঙ্কর্য-স্থাপত্য
অজন্তা অপরূপা
কারুতীর্থ কলিঙ্গ
ভারতীয় ভাঙ্কর্যে মিথুন
লা-জবাব দেহলী অপরাধ
আগ্রা

পবেষণামূলক
নেতাজী রহস্য সন্ধান
পয়োমুখম্
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা
চীন-ভারত লঙ্ঘমার্চ
অরিগামি
বাস্তুবিজ্ঞান
গ্রামের বাড়ি

দেবদাসী-সংল্লিষ্ট
সুতনুকা একটি দেবদাসীর
নাম
সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম
নয়

ঐতিহাসিক উপন্যাস
মহাকালের মন্দির
হংসেশ্বরী
আনন্দস্বরূপিণী
লাডলিবেগম
রূপমঞ্জরী

উদ্ভাস্ত-বিষয়ক সাহিত্য
বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প
বন্দীক
অরণ্যদণ্ডক

না-মানুষ ভিত্তিক
গজমুন্ডা
তিমি-তিমিঙ্গিল
না-মানুষী ‘বিশ্বকোষ’(১)
(অমেরুদণ্ডী)

ভ্রমণ-ভিত্তিক রচনা
পথের মহাপ্রস্থান

কৈফিয়ৎ

বইটির নামকরণ নিয়ে মহা ঝামেলা ভোগ করতে হয়েছে।

সুখাংশু, মানে এ বইয়ের প্রকাশকের প্রবল আপত্তি ছিল নামটাতে। অথচ কেন যে তার আপত্তি সে কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। শেষে “বাবু”, মানে ওর ছোট ভাই, একদিন জনান্তিকে সেটা জানিয়ে দিল আমাকে। বললে, ব্যাপারটা কী জানেন? দাদা তো ঐ দূরের টেবিলে বসে কাজ করে, কিন্তু কাউন্টারের কথাবার্তা সবই শুনতে পায়। ক্রেতা এসে যখন আপনার বইগুলো চায়, দাদা মনে মনে গজরায়। খদ্দের হচ্ছে লক্ষী, দাদা ওদের কিছু বলতেও পারে না ...

আমি তো বিশ-বাঁও জলে। বলি, কী বলছ মাখামুখু কিছুই বুঝি না!

— মানে কাউন্টারে এসে ওরা আপনার বইগুলো চায় তো? শুনতে খারাপ লাগবে না?

— খারাপ লাগবে? কেন?

— আপনি বুঝছেন না। সবারই ঘরে ফেরার তাড়া। সংক্ষেপে হাঁকাড় পাড়ে : ‘আমাকে একখানা বিশ্বাসঘাতক নারায়ণ সান্যাল’, ‘এদিকে একখান না-মানুষ নারায়ণ সান্যাল’, কিংবা ‘রাস্কেল নারায়ণ সান্যাল’! শুনতে খারাপ লাগবে না?

তা বটে!

তাই আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—দে’জ-এর কাউন্টারে এ বইটি কিনতে এলে অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ বাকটি বলবেন—‘নারায়ণ সান্যালের লেখা প্রবঞ্চক দিন’। সংক্ষেপে ‘প্রবঞ্চক, নারায়ণ সান্যাল’ চেয়ে বসবেন না!

আমি বিকর্ণ—দু-কান কাটা — কিন্তু তাতে সুখাংশুর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।

এ বইতে দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী। একটিই যোগসূত্র : প্রবঞ্চনার। চিত্রশিল্প জগতের। বস্তুত এ শতাব্দীর ললিতকলা-জগতের দুটি বৃহত্তম প্রবঞ্চনার। কাহিনীর মধ্যেই উল্লেখ করেছি কোন্ কোন্ সূত্র থেকে তথ্যগুলি সংগৃহীত।

একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে।

অ্যাগনেসের সঙ্গে অটো ফ্রাঙ্ক-এর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ। অটো ফ্রাঙ্ক এ কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত, নিম্প্রয়োজন। কিন্তু প্রিন্সেনগ্রাচ রাস্তার ২৬৫ নম্বর বাড়িটার কথা লিখতে বসে ২৬৩ নং বাড়িটার কথা বাদ দিতে কিছুতেই মন সরল না। সম্প্রতি আমস্টার্ডাম ঘুরে এসেছি। সেই বাড়িটা দেখে এসেছি। রাস্তার মোড়ে সেই পঞ্চদশী প্রাণচঞ্চলা মেয়েটির একটি আবক্ষ মূর্তিও। একতলায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নানান পোস্টার—প্রদর্শনী। দ্বিতলের ঘরগুলি যুদ্ধকালে যেমন ছিল তেমন ভাবেই সাজানো। যুরোপ-ভ্রমণ কাহিনী লিখিনি, হয়তো লেখার সময়ও পাব না।

এটা সেই না-দেখা মেয়েটির প্রতি একটা তির্যক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

চৈত্র শেষ ১৩৯৩

মোনালিসার প্রেমে

আলতামেরিয়া অথবা অজ্ঞাতপুত্রের প্রাচীরচিত্রের দাম হয় না, কারণ তা কেনাবেচা যায় না। দেওয়ালেই আঁকা। তাই ‘গিনিস বুক অফ রেকর্ডস’-এর মতে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে সর্বোচ্চ মূল্যের শিল্প সম্পদ: মোনালিসা! একবারই তা কেনা-বেচা হয়েছে। ক্রেতা ফরাসী সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস, বিক্রেতা চিত্রকার স্বয়ং: লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি। চারশো বছর আগে। সেবারও বিক্রেতা স্বচ্ছায় বিক্রি করেননি, বাধ্য হয়েছিলেন বেচতে। তাই সে দামটা মোনালিসার যথার্থ মূল্য নয়। ফরাসী সম্রাট শিল্পীকে দিয়েছিলেন চার হাজার ফ্লোরিন, 1517 খ্রীষ্টাব্দে (প্রায় আট-ন’শ ডলার) ‘গিনিস বুক অফ রেকর্ডস’-এ দামটা নিরূপিত হয়েছে একটি তির্যক পদ্ধতিতে। বর্তমান শতাব্দীতে ঐ ছবিখানিকে আমেরিকায় প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার জন্য একবার ইনসিওর করার প্রস্তাব ওঠে। তখনই ইনসিওর ড্যানুটা হয়েছিল দশ কোটি ডলার। অর্থাৎ 1962 সালের হিসাবে একশ কোটি টাকা।

সেটাও ঠিক দাম নয়। ওর ন্যায্য বাজারদর : সাত পয়জার!

চারশ বছর ধরে ওটা রাখা আছে পারীর ল্যুভার (আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্বের সেই শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালাটি, বাংলা হরফে যার বানান ও ‘উরুশ্চারণ’ নিয়ে বঙ্গভাষাবিদ পণ্ডিতেরা শতপন্থী) সংগ্রহশালায়। শুধু মাঝের আড়াই বছর বাদে। সেই ফাঁকটুকু নিয়েই এই গল্প। গল্প নয়, ইতিহাস। বিশেষ আগস্ট উনিশ শ এগার থেকে চৌঠা জানুয়ারী উনিশ শ চৌদ্দ, দু বছর চার মাস চৌদ্দ দিন।

এ কাহিনীর তথ্যের সিংহভাগ সংগ্রহ করেছি সেম্যুর রাইটের লেখা ‘দ্য ডে দে স্টোল দ্য মোনালিজা’ (লন্ডন, 1981) থেকে। কিছুটা অন্যান্য আর্ট-জার্নাল থেকে, যার মূল উৎস মার্কিন সাংবাদিক কার্ল ডেকার-এর গবেষণা। সেই গবেষকের স্মৃতিচারণ দিয়েই শুরু করি। উনিশ শ চব্বিশ সালের তেরই এপ্রিল। পারী শহরের উপকণ্ঠ। ঘোড়ার গাড়িটা রোড কার্ভের কাছে দাঁড় করিয়ে চালক বললে, আর যাবে না মসিয়োঁ।

হ্যাক্নি-ক্যারেজের একমাত্র আরোহী একজন অল্পবয়সী মার্কিন সাংবাদিক। ফরাসী ভাষাটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না। বস্তুত এরপর গলিপথ এত সরু যে, গাড়ি চলাচল করা সম্ভবপর নয়। গাড়ি থেকে নেমে বললেন, তখন যে বস্তিটার নাম বলেছিলাম, সেজু-মর-দে-ফঁসে সেটা কোনদিকে?

গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে কোচম্যান বললে, মসিয়োঁর কী ধারণা ঐ বস্তিটা ভাসাই প্রাসাদের মতো বিখ্যাত? ঝুঁজ দেখুন, এরই কাছে-পিঠে।

ভদ্রলোক কোচম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পদব্রজে রওনা দিলেন।

ওঁর মনে হল আজকের অভিযানের জন্য ওঁর সাজপোশাক উপযুক্ত হয়নি। সুট, হ্যাট, টাই, জুতো—সব কিছুই পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। সাংবাদিক হিসেবে ওঁর খেয়াল করা উচিত ছিল এদিকটা। যা হোক, নর্দমার কর্দম এড়িয়ে, শুয়োরের খোঁয়াড়-এর স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনক্রমে

রঙ-মিক্সিট বন্ডলে, রোকবার আসবেন। সেদিন আমার ছুটি।

— আমার শনিবার জাহাজের টিকিট বুক করা আছে। মার্সেল্‌স্‌ থেকে।

— সে-ক্ষেত্রে আমি দুঃখিত। আমার সময়ের দাম আছে।

কার্ল হিশ-পকেট থেকে ওয়ালেটটা টেনে বার করলেন। একটি পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট এবং একটি গটিশ সেক্টের মুদ্রা বার করে বললেন, সে দাম আমি নিশ্চয়ই মেটাব।

রঙ-মিক্সির চোখটা ঝলঝল করে ওঠে। জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ডিজিয়ে নিয়ে বললে, আমার পকেটে পঞ্চাশ-ফ্রাঁ নোটের ভাঙানি নেই।

— ভাঙানি লাগবে না। গোটা নোটখানাই আপনার। মসিয়োর একবেলার সময়ের দাম।

লোকটা ঢোক গিলে বললে, আর ঐ গটিশ সেক্টের কয়েনটা ?

কার্ল রাস্তার বিপরীত দিকে একটা ‘বার’-এর দিকে নির্দেশ করে বলেন, ঐ বারে বসেই আমরা আলোচনাটা করতে পারি। বলা বাহুল্য, বিল মেটাবো আমি। আর এই মুদ্রাটা একটা টেলিফোন-কল বাবদ। আপনি আপনার এম্প্লয়ারকে জানিয়ে দিন কাল রাত্রে হঠাৎ স্বর হওয়ায় আজ কাজে যেতে পারছেন না।

ভিন্ন প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল। মোনালিসা-অশহরণের ইতিকথাটা ওর পক্ষে সত্যই বেদনাবহ। সে-কথা ও ভুলে থাকতে চায়। কারও সঙ্গে কখনো আলোচনা করে না। মায় ওর সদ্যপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গেও নয়। কিন্তু পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোটখানা ভদ্রলোকের দু-আঙুলে যে তখনো ধরা আছে! ভিন্ন বললে, কিন্তু আপনি যে সত্যই সাংবাদিক, গুপ্তচর বা পুলিশের লোক না তা আমি জানব কি করে ?

— গুপ্তচর কি পুলিশে কি আজও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ?

— না, তা অবশ্য নয়। সব ‘কেস’ই চুকে-বুকে গেছে। কিন্তু আপনি কী উদ্দেশ্যে আবার সেই পুরনো কাসুন্দি নতুন করে ঘাঁটতে চাইছেন, সেটা তো আমার জানা দরকার।

কার্ল এবার পকেট থেকে বার করলেন একটি ফটোগ্রাফ। বাড়িয়ে ধরে বললেন, ঐকে চেনেন ? লোকটার মুখ বেদনার্ত হয়ে উঠল। বললে, চিনি।

— একেই কি আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন না ?

— না!

— না ? সত্যি বলছেন ?

— সত্যিই বলছি মসিয়োঁ ডেকার! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, আপনি কাহিনীর সবটা জানেন না। হ্যাঁ, এই লোকটাকে একদিন আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। সে আমলে স্বয়ং যীসাস্‌ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি হয়তো বলে বসতুম—তোমাকে তো খুঁজছি না দাদা! আমি খুঁজছি সিনরকে।

— একে এখন খুঁজছেন না কেন ?

— কারণ ওকে আমি খুঁজে পেয়েছি! ওকে আমার প্রয়োজন নেই এখন!

— আমি বিশ্বাস করি না! বলুন তো ঐর নাম কী ?

— মার্কুইস্‌ এদুয়ার্দস্‌ দ্য ওয়ালকিয়ের্নো! ছ’বছর আগেও দেখেছি শয়তানটাকে!

কার্ল ডেকার পকেট থেকে আর একখানি পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট বার করে বললেন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে ‘অস্তার-এস্টিমেট’ করেছিলাম! আপনার একবেলার সময়ের দাম অন্তত একশ ফ্রাঁ!

ভিল আর আত্মসংবরণ করতে পারল না! নোট দুখানা আর মুদ্রাটা ছিনিয়ে নিল। গুলিটা কাঁখে ফেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল সরাইখানার দিকে।
কার্ল চললেন তার শিছু শিছু।

তের বছর আগেকার দিনটিতে শিছিয়ে যাওয়া যাক এবার।

বাইশে আগস্ট, উনিশ শ' এগারো।

সময়কালটার ধারণা করতে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ বছর ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মোহনবাগান ঐ বছর প্রথম আই.এফ.এ.শীল্ড পায়, আর ঐ বছরই ‘ভগিনী নিবেদিতা’ প্রয়াত হন।

বঙ্গলে ঈজেল আর বোলা-ব্যাগে রঙ তুলি নিয়ে লুই বেনো হন্হন্ করে এগিয়ে চলেছে সীন নদীর কিনার বরাবর। মঙ্গলবার সকাল আটটা। ল্যুভার সংগ্রহশালার দরজা খোলে সকাল নয়টায়। দ্বার খোলামাত্র নির্দিষ্ট স্থানে জায়গা দখল করে ওকে বসে পড়তে হবে। এ বছর ওর ছবির কাটতি বেশ ভাল। এখন সিজন্টাইম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্যুরিস্ট এসে ছোটো ফ্রান্সে—শীতালী পাখির মতো। কিনে নিয়ে যায়—রাফায়েল, তিজিয়ানো, মুরিল্লো, রুবেন্স, মেনোমারের ‘ফ্যাক্সিমিলি’—হুবহু নকল। না, হুবহু নয়। হয় মাশে কিছু ছোট, অথবা কিছু বড়। একই স্কেলে ছবি আঁকা বারণ। যাতে নকল ছবি কেউ আসল বলে চালাতে না পারে।

যে আমলের কথা, তখন কার্লড ফটোগ্রাফি বাজারে আসেনি। রঙিন প্রিন্ট যা পাওয়া যায় তাও নিম্নমানের। তাই ঐ বেনোর মত আর্টিস্টদের কদর।

পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায়—ল্যুভারে, উফিজিতে, রাইখস্-এ প্রতিদিন স্থানীয় চিত্রকরেরা বসে বসে ওল্ড-মাস্টার্সদের কপি করে। রঙিন তেলরঙের ছবি—হুবহু নকল, শুধু মাশে কিছু বড়, অথবা ছোট। ভাল দামে তা বিক্রি হয়ে যায়। বেনো ল্যুভারের অনেক বিশ্ববন্দিত ছবির কপি করেছে। সবই বিক্রি হয়ে গেছে। এ বছর সে একটু রকমফের করবে স্থির করেছে। বর্তমানে আঁকছে একটা তেলরঙের ছবি ‘সালোঁ কেয়ারে।’

অর্থাৎ ল্যুভার মিউজিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত কামরার একটি ছবি।

ফোর-গ্রাউন্ডে কিছু দর্শক, দু’পাশের প্রাচীর পরিপ্রেক্ষিত—আইন মেনে খেয়ে চলেছে যুগল ড্যানিশিং পয়েন্টের দিকে। ‘ওয়ার্মস্-আই’-ভিউ-তে আঁকা ছবি। কারণ বেনো আঁকে মেঝেতে থাপন জুড়ে বসে। ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঐ, দু’পাশের প্রাচীরে বিশ্ববন্দিত ছবিগুলিকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। বেনো এমন নিখুঁত করে আঁকছে যে, প্রতিটি ছবিকে সনাক্ত করতে পারবে সত্যিকারের চিত্র-প্রেমিক। কিছু সেগুলি ‘ফ্রন্ট-ভিউ’ নয়, পাশ থেকে আঁকা। ও যেখানে বসে দৃষ্টিকোণটা বেছে নিয়েছে সেখান থেকে দেখা যায় বিশ্বললিতকলার পরশর তিনখানি সাজা হীরকশুণী করেজ্জোর ‘সেন্ট ক্যাথারিনের অলৌকিক বিবাহ’, টিশিয়ানের ‘আলিগরি’ আর দুটির মাঝখানে ল্যুভার-চিত্রশালার কৌতুক-রশ্মি।

লেঅনার্দোর ‘লা জ্যকোন্ডা’, অর্থাৎ মোনা লিসা।

বেনো যখন ল্যুভারে গিয়ে পৌঁছিল তখন সন্ধ্যার দরজা সবে খোলা হয়েছে। ওকে প্রত্যহ টিকিট কাটতে হয় না। গিল্ড-এর ইস্যু-করা ‘পাস’ আছে। তাছাড়া ওকে অনেকেই চেনে। আন্ত

তিনবছর সে ক্রমাগত আসছে ল্যাভারে। বেনো তন্তু করে গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্স বেয়ে ছিঁড়লে উঠে যায়।

এখন যে কক্ষে ‘মোনালিসা’ থাকে সে আমলে সেখানে ওটা থাকত না। তখন ওটা থাকত সালোঁ কেয়ারে।

তার দরজাও এইমাত্র খুলেছে। দু-একজন দর্শনার্থী প্রবেশ করেছে। প্রবেশপথে দেখা হয়ে গেল পশাদুঁ’র সঙ্গে। এই গ্যালারির রক্ষক। বলে, এরি মধ্যে হাজির?/

একগাল হেসে বেনো জবাব দেয়, উপায় কী বল? ‘সিজন’ তো বসে থাকবে না!

নির্দিষ্ট স্থানে মসৃণ মার্বেলের ওপর সে থাপন জুড়ে বসে পড়ে। ইজেলটা খাটায়। রঙ-তুলি সাজিয়ে আঁকতে শুরু করে। কয়েক মিনিট পরেই ওর নজর পড়ল করেজ্জো আর টিশিয়ানের মাঝখানে মহিলাটি অর্থাৎ মোনালিসা অনুপস্থিত। বেনো বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না। আজ মঙ্গলবার, অর্থাৎ গতকাল গেছে সোমবারের ঝাড়া-মোছার দিন। প্রতি সোমবার ল্যাভার দর্শনার্থীদের কাছে বন্ধ। সেদিন সব সাফ-সুথরো করা হয়। হয়তো ‘লা জ্যকোভা’ ছবিখানার ফ্রেম পালিশ করা হচ্ছে। অথবা হয়তো তা থেকে ফটো তোলা হচ্ছে। একটু-পরেই কর্মীরা এসে ওটা টাঙিয়ে দেবে। সে প্যালেটে রঙ মেশায়।

মন বসে না কিন্তু। কোথায় একটা কাঁটা বিচুঁবিচুঁ করছে। সালোঁ কেয়ারের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে বেনো, অথচ ঘরে লিভা জ্যকোভা নেই! এটা ওর বরদাস্ত হচ্ছে না। এ যেন বিশ্বহীন শ্রীমায়ের মন্দিরে বসে থাকা! বেনো উঠে এল পশাদুঁ’র কাছে। লোকটা টুলে বসে এই সাত সকালেই কিমছে! রাতে ঘুমায় না নাকি? বেনো ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এই! লা জ্যকোভাখানা কোথায়?

রক্ষকের তদ্রাজড়িত চোখ জোড়া খুলে গেল। এতক্ষন ওর মুখটা হাঁ করা ছিল। সেটা বন্ধ করল। জিভ দিয়ে লালা টেনে নেওয়ার একটা শব্দও হল, স্পষ্ট! তাকিয়ে দেখল সামনের দেওয়ালটার দিকে। হ্যাঁ, মোনালিসা ছবিখানা স্বস্থানে নেই বটে। সেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। মনে পড়ল—আজ মঙ্গলবার। কাল সোমবার, ঝাড়া-মোছার দিন গেছে। নিঃশব্দে তিনতলার দিকে ‘থামস্-আপ’ মুদ্রা করে আবার চোখ দুটি বোঁজে।

বেনো নিশ্চিন্ত হয়। তিনতলায় স্টুডিও। তাহলে ফটো-তোলার প্রয়োজনে ছবিখানা ত্রিভুজের স্টুডিওতে গতকাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটু পরেই কর্মীরা এসে সেটা টাঙিয়ে দেবে। সে নিশ্চিন্ত মনে আবার আঁকতে বসে।

দশ মিনিটের মধ্যেই তার তত্ত্বাভ্যাসটা ভঙ্গ হল। এক ভদ্রলোক এসে জানতে চাইলেন, মাপ করবেন, আপনি বলতে পারেন—‘মোনালিসা’ ছবিখানা কোন ঘরে আছে?

বেনো বললে, এ ঘরেই থাকার কথা। ঐ দেওয়ালে। সেখানা গতকাল স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফটো তুলতে।

ভদ্রলোক বললেন, আশ্চর্য! সারাদিন-রাতে ফটো তোলা শেষ হল না? এঁরা কি জানেন না—দূর-দূরান্তর থেকে মানুষজন ঐখানা দেখতেই ছুটে আসে?

কথা ঠিক। বেনো একটু বিরক্ত হয়ে আবার ঘুম থেকে ডেকে তুলল পশাদুঁকে। বললে, কেন এত দেরী করছে ওরা? তুমি যাও—তগাদা দাও গিয়ে।

পশাদুঁ ঘুম জড়ানো ঘোলাটে দু-চোখ মেলে বললে, এত ব্যস্ত কিসের? এসে যাবে এখনি।



বিচারালয়ে আসামী হান ভাঁ মীগেৰেঁ পিছনের দেওয়ালে
তাঁরই আঁকা নকল ছবি।



‘ইস্মায়ুস’-এর পাহুশালায় যীশু-কারাভাগ্গো



‘ইস্রায়েল’-এর পাস্তাশালায় যীশু – নকল ভেরমেয়ার (মীগেরেঁ-কৃত)



পুলিস প্রহরায় মীগেৰেঁ 'যুবক-যীশু' আঁকছেন

এবার তদ্রলোকই খঁকিয়ে ওঠেন। ব্যস্ত হব না? গোটা ল্যুভারটা তো ঘুরে দেখতে হবে সারা দিনে? আপনাদের কম্পেন-বুকটা কোথায়?

পশাদুঁর নিদ্রা ছুটে গেছে। বললে, ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন। পাঁচ-মিনিটের ভিতরই ছবি নিয়ে ফিরব আমি।

পাঁচ-মিনিটের ভিতরই ফিরে এল সে। একেবার অন্য মূর্তি। কে বলবে একটু আগে সে ঘুমোচ্ছিল! তার চোখ দুটো অন্ধি-কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!

বেনো উঠে আসে, কী ব্যাপার? কী বলল ওরা?

— ‘লা জ্যাকোভা’ স্টুডিওতে নেই। তাকে কাল ওখানে কেউ নিয়েই যায়নি।

— তার মানে?

— তার মানে আমি জানি না!...আমি...আমি সত্যিই জানি না!

প্রপার-চ্যানেলে মিনিস্টার অফ দি ইন্ট্রিয়ার মহোদয়কে যখন দুঃসংবাদটা অবহিত করা হল, তখন বেলা দেড়টা। তার পূর্বে অনেক কিছু ঘটে গেছে। পশাদুঁ দুঃসংবাদটা জানিয়েছে প্রহরীদলের প্রধান জর্জেস পিকোকে। সে বোচারা ফটো-স্টুডিও, ফ্রেম-মেরামতির ঘর, পালিশ-সেকশনের প্রতিটি বিভাগে সন্ধান করে দেখেছে; তারপর জানিয়েছে কিউরেটর মহোদয়কে। তিনিও এই অবিশ্বাস্য-তথ্যটা মেনে নেননি প্রথমে। যে দুর্গ থেকে একটি সূচ গলতে পারে না সেখান থেকে মোনালিসা চুরি হয়ে যাবে এটা ভাবা যায় না। পুলিশে খবর দিয়ে কি শেষমেশ বেহুদো বে-ইজ্জতি হবেন? ফলে সমস্ত বিভাগগুলিতে পুনরায় তল্লাসী করা হল — গতকাল ঝাড়াই-পোঁছাই কাজে কেউ ‘লা জ্যাকোভা’খানা সরিয়ে রেখেছে কি না। নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি আতঙ্কভাঙিত কণ্ঠস্বরে দুঃসংবাদটা জানানেন পারী-পুলিসের প্রিফেক্ট লুই লাপিন সাহেবকে। তিনি জানানেন ‘সুরেতে নাশিওনেল’কে অর্থাৎ জাতীয় সুরক্ষা-মন্ত্রকে। তাঁরা সংবাদ দিলেন দ্বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়কে। তিনি স্বয়ং এসে যখন ল্যুভারে উপস্থিত হলেন তখন বেলা তিনটে। সশস্ত্র পুলিশে ঘিরে ফেলল ল্যুভার। প্রতিটি নির্গমনদ্বারের সম্মুখে বেয়নেটধারী পুলিশ। প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডিটেকটিভ। ছবিখানা দেওয়াল থেকে নামানো হয়েছে এটা প্রত্যক্ষ সত্য—এবার দেখতে হবে সেটা যেন ল্যুভার প্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে কেউ না নিয়ে যেতে পারে।

ওঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, ‘লা জ্যাকোভা’কে যে অপহরণ করেছে সে ঐ প্রাসাদ-চৌহদ্দি ত্যাগ করে গেছে বক্রিশ ঘণ্টা আগে! সোমবার বেলা আটটায়!

টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। হেতু : একটা পানীয় জলের পাইপ নাকি ফেটে গেছে—সেটা এক্ষণি মেরামত করা দরকার।

যাঁরা সকাল থেকেই ভিতরে ঢুকে পড়েছেন তাঁদের বলা হল, টিকিটের মূল্য রিফান্ড নিয়ে অবিলম্বে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

বিস্মিত বিমূঢ় দর্শনার্থীরা কিউ দিয়ে একে-একে বার হয়ে এলেন। প্রত্যেককে তল্লাসী করা হল। জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার সঙ্গে এই খানা-তল্লাসীর কী সম্পর্ক বোঝা গেল না। সে প্রশ্নটা তাঁরা উত্থাপন করার অবকাশই পেলেন না। পেলেন সাংবাদিকরা। ইতিমধ্যে অনংখ্য ক্যামেরাধারী সদর-দরজার কাছে থানা গেড়েছে। ঘা হলে মাছি আর সাংবাদিকেরা বাতাসে

খবর পায়। ছাঁকান করে ধরে। কিন্তু প্রেস-কার্ড দেখিয়েও কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারল না। পাইপটা কেম্বায় ফেটেছে, কত ব্যাসের পাইপ, কোন্ কোন্ ছবি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, মেঝেতে কতটা জল জমেছে — প্রশ্ন ওদের হাজারটা, জবাব কেউ দিল না।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দা-পুলিস সিঁড়ির তলায় এক অন্ধকার কন্দর থেকে আবিষ্কার করেছে দুটি জিনিস। একখানা ফ্রেম আর বুলেট-প্রুফ কাচের একটা টুকরো! কিউরেটর নিঃসন্দেহ—সেগুলি ‘মোনালিসার’!—

বেলা চারটেয় ল্যুভারের সামনে রীতিমত ট্রাফিক জ্যাম!

আর দেরী করা যায় না! মন্ত্রী মহোদয় জাতীয়-স্বার্থে এই চরম লজ্জাজনক সংবাদটা প্রেসকে জানালেন: ‘মোনালিসা অপহৃত! কী ভাবে তা কেউ জানে না!’ প্রেস-প্রতিনিধিরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটলো যে-যার দপ্তরে।

পরদিন, বুধবার, তেইশে আগস্ট পারীর এক পাঁচতারা হোটেলের বিলাস-বহুল কক্ষ খবরগুলো তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছিলেন একজন বিদেশী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার সামনেটায় টাক, চুলগুলি ফেরানো। চোখে প্যাঁশনে, ডগলাস ফেরারব্যাক্স মার্কা সূচালো একজোড়া গোল্‌ফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

পারীর তিন-তিনটি দৈনিকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আট-কলমব্যাপী হেডলাইন:

‘অবিশ্বাস্য! চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে!’

‘ল্যুভার কানা হয়ে গেল! রাজকুমারী নেই!’

‘লা জ্যাকোভা অপহৃত! অ্যাবডাকশন না ইলোপমেন্ট?’

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল বিদেশী ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের মুখে। তিনিই এই অশহরণ-অপেরার মূল-গায়ন!

তাকৈ চিনতে হলে আরও কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে আপনাদের:

জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার বুইনস এয়ার্স-এ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বাবা ছিলেন মস্ত জমিদার। ছোটখাটো রাজাই—বনগাঁয়ে যেমন হয়। ওরা চার ভাই। ও হচ্ছে সর্বকনিষ্ঠ। শিশুবিয়োগের পর বাকি তিন ভাই জমি ভাগ করে নিল। ও রাজি হল না। সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ নগদে নিয়ে ভাগ্যক্ষেপে বার হয়ে পড়ে। প্রথমেই নিল একটা জমকালো স্বয়ং-নিয়োজিত উপাধি। আইভরি-ফিনিশ ভিজিটিং-কার্ডে মনোত্রাম করে ছাপা হল: Marques Eduards de Valfierno.

খানা গাড়ল বুইনস্ এয়ার্সেই। শিতার দৌলতে সেখানকার অনেক ধনী পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিলই। চরিত্রগুণে অনায়াসেই সে গতিটা বর্ধিত হয়ে গেল অচিরে। দারুণ ফুর্তিবাজ, চোখে-মুখে কথা। যে কোন খানদানী পার্টিতে ওয়ালফিয়ের্নো অনুপস্থিত হলে মনে হত যেন মোনালিসাহীন সালোঁ কেয়ারে।

একটা জীবিকা অবলম্বন না করলে নয়। এই খানদানি জীবনযাত্রার স্টাইলটা বজায় রাখতে হলে। কিন্তু অর্থোপার্জন মানেই কপালের ঘাম পায়ে ফেলা। সেটা ধাতে নেই ওয়ালফিয়ের্নোর। কপালটা না ঘামিয়ে মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোকে যদি একটু খেলানো যায় তাহলে বেহুন্দা

দৌড়ঝাঁপের কী দরকার ?

ওয়ালফিয়ের্নো হল : আর্ট-ডীলার !

মামা, আজতেক আর রেড-ইন্ডিয়ানদের দিকে যুরোপ-আমেরিকা ক্রমশঃ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ওসব সভ্যতার অনেক কিছুই অজানা। সেটাই সুবিধাজনক ! বিশেষজ্ঞের দল আসল-নকলের ফারাকটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছেন না। বুইনস্-এয়ার্স শহরের একাডেমি শহরতলীতে গুটিকতক শিল্পীকে নিয়ে মার্কুইস একটি ওয়ার্কশপ খুলে বসলেন — তারা পাঁচ-সাতশ' হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পসত্তার বানাতে শিখল ! চামড়ার ওপর খোদাই, শোড়ামাটির তৈজস, প্রাচীন মুদ্রা, মাটি ও পাথরের মূর্তি !

বেশিদিন চালানো গেল না। বুইনস্-এয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বেমত্বা খুলে বসল একটি কলা-বিভাগ। আর সেই বিভাগের ডীন হয়ে এসে উপস্থিত হলেন এক জার্মান বিশেষজ্ঞ। মোটা মাইনে পাচ্ছি — তাই নিয়েই খুশি থাক না বাপু — না ! তাতে তিনি সজুট্ট হলেন না। সরকারকে বুদ্ধি জোগালেন প্রাচীন আর্ট দ্রব্য বিদেশীদের বিক্রি করবার আগে তাঁর কলা-বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে ! কোনও মানে হয় ? বিদেশী টুরিস্ট বোকা বন্ডে চায়, তাতে তাদের নাক গলাবার কী দরকার বাপু ?

মার্কুইস পদ্ধতিটা বদলাতে বাধ্য হলেন।

এই পর্যায়ে তিনি যে কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন তা রীতিমতো অভিনব ! 'প্রতারণা' যদি কখনো বিজ্ঞানের একটি শাখা বলে স্বীকৃত হয়, মার্কুইস ওয়ালফিয়ের্নো তা হলে এজন্য গ্যালেলিও-নিউটনের সমপর্যায়ের সম্মান পাওয়ার যোগ্য : তথাকথিত আর্ট-কনোশার মার্কুইস ওয়ালফিয়ের্নো রায়ো-ডি-জেনিরোর একটি বিখ্যাত সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একজন আর্টিস্ট বসে মুরিল্লোর একখানি বিখ্যাত ছবি কপি করছে। মার্কুইস চিত্রকরের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রায় আধঘণ্টা নিষ্পন্দ ওৎসুক্যে ওর অঙ্কন-পদ্ধতি দেখতে থাকেন। চিত্রকর ওঁর নীরব উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন; কিন্তু তন্ময় হয়ে সে ছবি আঁকছে। অনেক পরে সে প্যালেটে আর তুলি নাথিয়ে রেখে মার্কুইসের মুখোমুখি হল। বললে, আপনি এ সংগ্রহশালায় কী দেখতে এসেছেন মশাই, বলুন তো ? আসল না নকল ছবি ?

মার্কুইস্ একগাল হেসে বললেন, জবাব দেওয়া মুশকিল। কারণ আসল-নকলের ফারাকটা নজরে পড়ছে না।

শিল্পীও হেসে ফেলে। বলে, মার্কিন টুরিস্ট মনে হচ্ছে ? মুরিল্লোখানা সংগ্রহে রাখতে চান ?

— কত দাম ?

— পঁচিশ শেসো !

মার্কুইস বিনা-দরদামে তৎক্ষণাৎ ওর হাতে প্রার্থিত দামটা ধরিয়ে দেন।

শিল্পী বলে, আর কোন ছবি কিনতে চান ? আমার কাছে আরও কয়েকখানি ভাল ছবির কপি আছে।

— আপনি সেগুলি নিয়ে ঐ লনের বেক্টিটায় আসুন। আমি একটু ধূমপান করব।

সংগ্রহশালার অভ্যন্তরে ধূমপান বেআইনি। মার্কুইস তাই বাগানে গিয়ে বসলেন। একটু পরে শিল্পী খানকয়েক ছবি নিয়ে উপস্থিত হল। ব্যক্তিগত খুলবার উপক্রম করতেই মার্কুইস বললেন, আপনি 'অডারি' ছবি আঁকতে রাজি আছেন ? যথাযোগ্য সম্মানমূল্য পেলেন ?

- ‘অডারি ছবি’ মানে? বিষয়টা কী?
- এই মুরিল্লোখানাই—ধরুন, ওয়ান-এইট্‌থ্-স্কেলে বড় করে।
ভুক্তিহীন হল শিল্পীর। অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর বলল, কত দেবেন?
- তিন শ’ পেসো!
- ‘Craquelure’ করে দিতে হবে না?
- তা করে দিলে চার শ’।
- আর ফ্রেমটাও বানিয়ে দিলে? পুরনো কাঠে, মরচে ধরা পেরেক?
- না, তা চাই না! শুধু ছবিখানাই।
- শিল্পী বলল, সইটাও চাই তো? মুরিল্লোর?
- সেটা তো বলাই বাহুল্য!
- পাবেন। পরের বুধবারে। এখানেই, এই সময়েই। তবে চার শ’ নয়, পুরো পাঁচ শ’ দিতে হবে। আর অর্ধেক নাম অগ্রিম।
- রাজি। দুটো কথা বলব। এক নম্বর : ছবিখানা এখানে নয়, আমার হোটেলের পৌঁছে দিতে হবে। দু নম্বর : আপনার পরিচয়টা জানাতে হবে।
- শিল্পী আত্মপরিচয় দিলেন। নাম—ঈভেস্ শার্প্। জাতে ফরাসী। পারীর বিখ্যাত ‘ব্যো আর্ত’ আকাদেমী থেকে চিত্রাঙ্কনের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। দীর্ঘদিন লুভারে বসে ছবির নকল করেছেন। সম্প্রতি এসেছেন দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে। আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, মসিয়োর পরিচয়?
- আমি দক্ষিণ আমেরিকারই বাসিন্দা। কিন্তু নাম-পরিচয়টা আপনার পক্ষে না-জানাই ভাল নয় কি? নেহাত যদি খানা-তল্লাসি হয়, পুলিশ-এনকোয়ারি হয়, তাহলে আপনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই নয়?
- তা ঠিক। কিন্তু ধরুন যদি একখানা ‘মুরিল্লো’ এঁকেই আমার তৃপ্তি না হয়? হয়তো আরও খান-কয়েক ছবি আপনাকে বেচতে চাইব আমি—ফুলস্কেলে। Craquelure করে। মার্কুইস বুঝতে পারেন ধুরন্ধর সহকর্মীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি। বাড়িয়ে নিতে বলেন, ‘Craquelure’ পদ্ধতিটা পারীর ব্যো আর্ত স্কুলে শেখানো হয়?
- হয় না। কিন্তু আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন আমি নিতান্ত নভিস্? এ কাজ আগেও করেছি। তবে ঝুঁকিটা বড় বেশি।
- আমার সঙ্গে কারবারে এটাই সুবিধা। সব খরচ-খরচা আমার, সব ‘রিস্ক’ আমার; তাই লাভের বারো-আনা আমার। সব টেক্‌নিক্যালিটি আপনার, তাই বখরাও বাকি চার-আনা।
- আপনি কি আশা করছেন অরিজিনাল ‘মুরিল্লো’-খানা আপনি মাত্র দু হাজার পেসোতে বেচবেন?
- না। পাঁচ শ’ পেসোর অফারটা আমার নয়, আপনার। তখনও আপনি পাকাপাকিভাবে আমার সঙ্গে বিজনেসে নামার কথা ভাবেননি। আমার আশা, অরিজিনাল মুরিল্লোখানা অন্তত ছয় হাজারে বেচব। তার চার-আনা তাহলে আপনার।
- মানে! দেড়-হাজার পেসো?
- পেসো নয়, ডলার, মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আপনার হিসাবে চল্লিশ হাজার পেসো! বজ্রাহত হয়ে গেলেন শার্প্। এত দাম! কিন্তু ও ভদ্রলোক বেচবে কী করে? কাকে? যে

কিনেবে সে কি যাচাই করে নেবে না—নকল কিনছে না আসল? সেই মর্মে প্রশ্ন করতেই মার্কুইস বললেন, সবকিছুই আপনার চোখের সামনে ঘটবে—যাতে আপনি দেখতে পান আমি নগদে কত পেলাম। কিন্তু তার আগে বলুন, ‘Craquelure’ পদ্ধতিটা আপনার কী জাতের? — শুধু ‘Craquelure’ পদ্ধতিটা নিখুঁত হলেই চলবে না, মসিয়োঁ। আমাকে অনেকগুলি সহজলভ্য রঙ এড়িয়ে মূলানুগ হব্ব ছবিটা আঁকতে হবে। যেমন ক্যাদমিয়াম ইয়ালো, কোবাল্ট ব্লু, জিঙ্ক হোয়াইট ইত্যাদি ব্যবহার করা চলবে না। তাই চার-আনা নয়—ছয়-আনা ভাগ আমার, যদি নিখুঁত নকল চান। এমন নিখুঁত; যাতে শুধু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসেই নয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তা ধরা যাবে না।

— আপনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন আগে, তারপর শতকরা ভাগের হিসাব হবে।

শাস্ত্র প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দেন :

বাজারে এই শতাব্দীর প্রথমে যে সব রঙ শিল্পীরা ব্যবহার করতেন তা দু’তিন শ’ বছর আগেকার শিল্পী—ভেরমিয়ার, মুরিলো, ফ্রান্স হাল্‌স্ বা রেমব্রাণ্ট ব্যবহার করেননি। তা তখন বাজারে পাওয়া যেত না। রঙিন পাথর ঘষে ঐসব রঙ তাঁদের নিজেদেরই তৈরী করে নিতে হত—যেমন করেছেন আলতামেরিয়ার আদিম শিল্পী থেকে অজ্ঞাতা গুহাশিল্পীরা। এছাড়া দু-তিন-চারশ’ বছরের পুরনো অয়েল পেইন্টিং-এ এক ধরনের চুল-ফাট অনিবার্য! সেটা মহাকালের স্থূল হস্তাবলম্বনের পরিণাম। সদ্য-প্রস্তুত ছবিতে কৃত্রিমভাবে ঐ চুল-ফাটের দাগ বানাতে হবে। এজন্য দুই-কোটি আঙ্গুছ ভার্নিশের প্রলেপ দিতে হবে সদ্য সমাপ্ত চিত্রে। প্রথম কোট বা আন্ডার-লেয়ারটা হবে এমন জাতের ভার্নিশ যা শুকিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় নেয়; আর তার ওপরের প্রলেপটা হবে শীঘ্র-শুকিয়ে ওঠার উপযুক্ত কোনও ভার্নিশ। দু-দুটো আঙ্গুছ ভার্নিশের প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। ফ্যানের হাওয়ায়। যেহেতু দুটি প্রলেপ ঐ হাওয়ার প্রকোশে ভিন্নভাবে শুকিয়ে উঠবে তাই রঙের ওপর মাকড়শার জালের মতো চুল-ফাট দেখা দেবে! তাকেই বলে ‘Craquelure’। তখন তার ওপর খুব হাল্কা করে গ্রাফাইট-স্প্রে করতে হবে—যাতে একটু পুরনো-পুরনো দেখায়—রঙের চেকনাই কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

প্রক্রিয়াটা আদ্যোপান্ত শুনে মার্কুইস্ জানতে চাইলেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়বে না?

— যদি না রীতিমতো কোনও বিশেষজ্ঞ—সাধারণ আর্ট কন্সিশার নয়— এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন রসায়নবিদ ছবিটা পরীক্ষা করেন।

মার্কুইস এরপর দশ-আনা ছয়-আনা ভাগে স্বীকৃত হয়ে গেলেন। শাস্ত্রের প্রথমটা মনে হয়েছিল আর্ট-আনা বখরা হওয়া উচিত ছিল—তার কেরামতির মূল্য দিতে। কিন্তু মার্কুইস-এর বিক্রয়-পদ্ধতির কেরামতি দেখে পরে তিনি মনে মনে স্বীকার করেছিলেন : লোকটার প্রাণ্য হওয়া উচিত দশ-আনা ভাগেরও বেশি!

নিখুঁত ব্যবস্থাপনা মার্কুইস-এর। শাস্ত্র গোপনে ছবিখানা অরিজিন্যাল-মাপে বর্ধিত আকারে পুনরায় আঁকতে, কৃত্রিমভাবে তাতে চুলফাট ধরাতে যে সাতদিন সময় নিলেন তার ভিতর মার্কুইস সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁর জাল বিস্তার করলেন। বিদেশী টুরিস্টদের যারা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই জাতের গাইডদের একে-একে টোকা মেঝে দু’তিনটি উপযুক্ত সহকর্মী বেছে নিলেন। যারা দোভাষী, যারা বোকাসোকা ধনী টুরিস্টদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ সংগ্রহশালার একজন গার্ডকে স্বদলে নিলেন। এমন একটি গার্ড যার বিবেক

অর্থমূল্যে ক্রয় করা যায়। তার তরফে একটিমাত্র শর্ত : কর্তৃপক্ষ যখন টের পাবেন যে, ছবিখানা চুরি হয়ে গেছে তখন যেন তার চাকরি নিয়ে টানাটানি না পড়ে।

মার্কুইস তাকে আশ্বস্ত করলেন, তুমি আমার পরিকল্পনাটা আদৌ বুঝতে পারনি। আমার সঙ্গে কারবারে এটাই সুবিধে। সব ‘রিস্ক’, সব ঝুঁকি আমার! তোমাকে যেটুকু করতে হবে তার মধ্যে বেআইনি কিছু নেই। শুধু সময়ে একটু শিছন ঘিরে থাকা। এ জন্যই ছবি-শিছু তোমাকে একশ পেসো দেব আমি!

গার্ডটা বললে, মশাই! আমি কচি খোকাটি নই! ঘটনার পরদিন তো ছবিখানা ঐ দেওয়ালে থাকবে না? তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে—আমি কী বলব?

— তখন তুমি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে — ‘এই ভদ্রলোক ছবিটা চুরি করেছেন।’ পারবে না?

— মানে? আপনি বুঝি তার আগেই কেটে পড়বেন না?

— না! তার মানে ছবিখানা পরদিন দেওয়ালেই টাঙানো থাকবে। চুরি যাবে না!

— বুঝলাম না।

— স্বাভাবিক। এস, বুঝিয়ে বলি।

সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনে গার্ডও হতচকিত হয়ে গেল।

মার্কুইস-এর আমন্ত্রণ মতো শার্ট্র এলেন মুরিল্লোখানা অপহরণের দিনে।

বিকেল সাড়ে-চারটেয় সংগ্রহশালায় এসে দেখলেন, মার্কুইস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একজন টুরিস্টকে ছবিগুলো দেখাচ্ছেন। শার্ট্র এগিয়ে আসতেই মার্কুইস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ফরাসী ভাষায় টুরিস্ট ভদ্রলোককে বললেন, ইনিই মসিয়োঁ কস্টেলো — এই সংগ্রহশালার অ্যাসিস্টেন্ট কিউরেটর; কিন্তু উনি ফরাসী ভাষা বোঝেন না। শুধু স্প্যানিশ ভাষাটা জানেন।

টুরিস্ট ভদ্রলোক শার্ট্রর সঙ্গে করমর্দন করে মার্কুইসকে নিয়ন্ত্রণে ফরাসী ভাষাতে প্রশ্ন করলেন, ইনি কি ভিতরের ব্যাপারটা জানেন?

— জানেন। কাল যখন আবিষ্কৃত হবে অরিজিনাল মুরিল্লোখানা খোয়া গেছে তখন উনিই সামাল দেবেন। এইসব কারণেই ছয় হাজার ডলার দাম পড়ে যাচ্ছে।

— উনি ফরাসী ভাষা একটুও বোঝেন না?

— বিলকূল না! ফরাসী আর গ্রীক ওঁর কাছে সমপর্যায়ের।

— হারামজাদাটা এভাবে কত ছবি পাচার করেছে?

জন্মসূত্রে ফরাসী শার্ট্রর ইচ্ছা হল জবাবে বলেন, তোমার মত হারামজাদা টুরিস্ট যতবার এসেছে!—কিন্তু বলতে পারলেন না; কারণ পরিকল্পনা মতো তিনি ওর কথা বুঝতে না-পারার অভিনয় করছেন। নাট্যকারের নির্দেশ মোতাবেক উনি জানেন শুধু স্প্যানিশ!

মার্কুইস বললেন, এবার আসুন স্যার, আমরা তের-নম্বর ঘরে যাই।

তের-নম্বর ‘হল’-এই আছে সেই মুরিল্লোখানা। ছোট্ট ছবি—দশ ইঞ্চি বাই ষোল ইঞ্চি। ওঁরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সে ঘরে পাঁচ-সাতজন দর্শনার্থী। টুরিস্ট ভদ্রলোক মুরিল্লোখানা খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। মার্কুইস বুঝতে পারেন তার উদ্দেশ্য—ছবির প্রতিটি রেখা, প্রতিটি রঙ, মুরিল্লোর স্বাক্ষর, এমনকি চুলফাটের দাগগুলো পর্যন্ত সে স্মৃতিপটে ঐকে নিচ্ছে, যাতে

ঐ ছবিখানা হাতে পেলে সে সমঝে নিতে পারে আসলখানাই সে কিনেছে।

একটু পরেই ঘড়ি দেখে কামরার রক্ষক একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

অর্থাৎ এখন সময় পাঁচটা বাজতে পনেরো। আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই সংগ্রহশালার সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। গার্ড অন্যান্য দর্শনার্থীকে অনুরোধ করল ‘হল’ ত্যাগ করতে। একে-একে সকলে বেরিয়ে গেলেন। মার্কুইস্-এর কাছে এগিয়ে এসেও স্প্যানিশ ভাষায় বললে, অব্ কৃপাকর নিকাল যাইয়ে সাব!

মার্কুইস বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি।

ষারের দিকে একটু এগিয়েই থেমে পড়েন। নাটকের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘প্রস্থানোদ্যত’ ভঙ্গি। ঐ গার্ডটিই উৎকোচে বশীভূত ওঁর সহকর্মী। অন্য সবাইকে খেদিয়ে নিয়ে দ্বার পর্যন্ত গেল। ব্যুহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় দণ্ডায়মান হয়ে চারদিকে দেখে নিল। এদিকে কেউ আসছে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ইঙ্গিত করল মার্কুইসকে।

ঐক্সজালিকের দ্রুততায় মার্কুইস ছবিখানা পেড়ে নামালেন। এজন্য গার্ডের টুলটার ওপরে উঠে দাঁড়াতে হল তাঁকে। গার্ড নিজেই টুলটা সেখানে রেখে গেছে। ছবিখানা নামিয়ে তিনি উবুড় করে ধরলেন। টুরিস্ট ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পকেট থেকে নিজের কলমটা বার করেছেন। ছবির পিছনে দ্রুতগতিতে একটি স্বাক্ষর করে দেন। পরমুহূর্তেই মার্কুইস ছবিখানা আবার টাঙিয়ে দিলেন স্বস্থানে। দ্বারপ্রান্ত থেকে গার্ড বেশ উচ্চকণ্ঠে হাঁকড় পাড়ে : যাইয়ে সাব; অব্ কৃপা কর বহার যাইয়ে।

ব্যাপারটা কী হল আদৌ বুঝতে পারলেন না শাদ্রঁ। পৃষ্ঠদেশে স্বাক্ষর-সমন্বিত অরিজিনাল মুরিল্লোখানাকে দেওয়ালে খুলিয়ে রেখে কোন চতুর্ভুজ লাভ হল ?

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। বাইরে অপেক্ষা করছিল একটা গাড়ি। মার্কুইস স্বয়ং সিঁয়ারিঙে বসলেন। তাঁর পাশে বসলেন টুরিস্ট স্বদেহরটি। মার্কুইসের ইঙ্গিতে শাদ্রঁ উঠে বসেন পিছনের সীটে।

টুরিস্ট ভদ্রলোক মার্কুইসকে ফরাসী ভাষায়—যে-ভাষাটা নাকি পরিকল্পনা মোতাবেক শাদ্রঁর অজানা—প্রশ্ন করলেন, ইস, হারামজাদাটাকে আবার হোটেল নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

মার্কুইস একগাল হেসে বললেন, কারণ হারামজাদাটি স্বচক্ষে দেখতে চান আপনি আমাকে কত দিচ্ছেন—ছবিটার দাম হিসাবে।

—শালা তো মহা-খচ্চর ! পার্টনার-ইন-ক্রাইমকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না !

শাদ্রঁ জানলার কাচটা নামিয়ে দিলেন। হাওয়া চাই! কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে তাঁর।

ওঁরা হোটেল এসে পৌঁছেই বাঁধা-ছাঁদা শুরু করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল ভদ্রলোক আজ রাত্রেই জাহাজে চাপবেন। রাত ন’টা হচ্ছে রিশোর্টিং টাইম। হোটেল এসে চেক-আউট করার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে করতেই সেই গার্ডটি এসে হাজির। মটোরসাইকেল চেপে। তার হাতে একটা ছোট পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ। ওঁরা চারজনে ঘিরে গেলেন হোটেলের ঘরে। দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবার পর সেই গার্ডটি ফোলিও ব্যাগ খুলল। সেটি বিশেষভাবে বানানো। তার ভিতর একটা চোরা-লাইনিং আছে। তা থেকে বার করল একখানা ক্যানভাস। ফ্রেম-ট্রেম নেই। শুধুমাত্র ক্যানভাস। ভদ্রলোক টেবিল-ল্যাম্পটা ছালালেন। ছবির পিছনে নিজের স্বাক্ষরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। ছবিটা চিং করেও দেখলেন। হ্যাঁ, সেই অরিজিনাল মুরিল্লোখানাই।

নিশ্চিত হয়ে এবার তিনি হিপ্পকেট থেকে ভারী ওয়ালেটটা বার করে নোট গুনতে বসেন।
আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোককে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে মার্কুইস বললেন, এবার আসুন সেলিব্রেট করা
যাক আমাদের পরস্পরের সাফল্য!

শাঈর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। বললেন, কী বলছেন মশাই! এখন কেটে পড়ার খান্দা দেখুন।
একটি মাত্র রাত হাতে আছে। কাল সকালেই তো ...

— কী? কাল সকালেই কী হবে?

— সংগ্রহশালার দরজা খুললেই সবার নজরে পড়বে মুরিল্লোখানা নেই!

মার্কুইস বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন মসিয়ো! কাল সকালে কেউ কিছু টের পাবে না!
অরিজিনাল ছবিখানা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে ও থাকবে!

— মানে! আমি যে স্বাক্ষর দেখলাম অরিজিনালখানাই উনি নিয়ে গেলেন!

হো-হো করে হেসে ওঠেন মার্কুইস। বলেন, না বন্ধু! উনি নিয়ে গেলেন মসিয়ো কস্টেলোর
আঁকা নকলখানাই। কস্টেলোকে চিনলেন তো? সেই যে হারামজাদাটা ফরাসী হয়েও শুধু
স্প্যানিশ ভাষা জানে!

ইন্দ্রজালের গোপন তত্ত্বটা এতক্ষণে বুঝিয়ে দেন :

গার্ডট গতকাল ডিউটি শেষ হবার পরে শাঈর আঁকা নকল ছবিখানা অরিজিনালের পিছনে
সেলোটেশ দিয়ে আটকে দিয়েছিল। আসল-নকল দুটি ছবি একই দিকে মুখ ফেরানো! অর্থাৎ
ভদ্রলোক ঘটনাক্ষেত্রে আগে নকল ছবিটার পিছনেই স্বাক্ষর দিয়ে এসেছেন। সেলোটেশের বাঁধন
সরিয়ে সেই শেহনের নকল ছবিখানাই গার্ড নিয়ে এসেছে তার মটরসাইকেলে চেপে!

টুরিস্ট খদ্দেরটিকে দোষ দেওয়া যায় না! সংগ্রহশালায় টাঙানো ছবির পিছনে নিজে হাতে
স্বাক্ষর করেছেন, সেই স্বাক্ষর মিলিয়ে নিয়ে তবে দাম মিটিয়েছেন।

তাঁর আর অপরাধ কী?

বিজ্ঞানের সব শাখাতেই যেমন হয় ‘প্রতারণা-বিজ্ঞানেও’ সেই একই আইন! এই শুনলে অ্যাটম
অবিভাজ্য, আলোক সরল-রেখায় চলে; ভাল করে তত্ত্বটা সমঝে নেবার আগেই শোনা গেল—না,
অ্যাটমকে ভাঙা যায়, আলোক তরঙ্গপথে চলে! মার্কুইস যে অনবদ্য ফর্মুলাটা বার করলেন
তাও বেশিদিন ঘোশে টিকল না। তা হোক, ঐ ফর্মুলা-মোতাবেক খান দশ-বারো ছবি উনি
বিক্রি করেছেন। মার্কুইস আর শাঈর বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খুলে অর্থ সম্ভয় করেছেন। এক ব্যাঙ্কে
বেশি অর্থ আমানত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে সন্দেহের উদ্বেক করে।

বছরখানেক দিব্যি চলল। অপেক্ষাকৃত কম নামী চিত্রকরের ছবি বিক্রি করা কঠিন নয়, কিন্তু
নামী চিত্রকরদের সব ছবির হক-হদিস যে আর্ট-কনোশারদের মুখস্ত। আর্ট-জার্নালে তাদের
কথা ছাপা হয়। অধিকাংশ খদ্দেরই অবশ্য অত কিছু খোঁজ রাখে না। তারা বিদেশে এসে
দাঁও মেরে ছবি কিনে কেটে পড়তে পারলেই খুশি; কিন্তু মাঝে-মাঝে ওয়াকিবহাল খদ্দেরদের
নিয়ে মার্কুইস রীতিমত বিপদে পড়ে যান।

যেমন একবার এক টুরিস্ট দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছিল সেই সংগ্রহশালায়। তাকে দেখেই আঁকে
উঠেছিলেন মার্কুইস। ভদ্রলোক ঝুঁকে জনান্তিকে দৌঁড়ে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ব্যাপার কী
মশাই? আমি যে ডুরারের উড়কাটখানা কিনে নিয়ে গেলুম সেখানা সংগ্রহশালায় আবার টাঙানো

হল কী করে ? আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নকল ছবি...

—চুপ, চুপ, চুপ! অমন কথা বলবেন না স্যার! শুনুন, আসল ব্যাপারটা। সেই অ্যাসিস্টেন্ট কিউরেটর কস্টেলোকে মনে আছে তো ? ব্যাপারটা চাপা দিতে সে একখানা ছব্ব নকল বানিয়ে সংগ্রহশালায় টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। চুরি গেছে জানাজানি হলে ওর চাকরি নিয়ে টান পড়বে না ?

— কিন্তু কেমন করে বুঝবে যে, এখানাই আসল নয় ?

— খুব সহজে। আমি প্রমাণ দেব, আসুন।

একই প্রক্রিয়ায় পাঁচটা বাজতে পনের মিনিটে ঘর খালি হলে সেই গার্ডটি দ্বারমুখে জয়দ্রথের ভূমিকাটা পুনরাবৃত্তি করল। মার্কুইস্ টুলে উঠে ছবিখানি পেড়ে নামলেন। বললেন, অরিজিনালের পিছনে আপনি নিজে হাতে সই করেছিলেন, নিশ্চয়ই মনে আছে। এবার সেটা খুঁজে বার করুন ! খরিদার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নিজের সইটা দেখতে পেলেন না। বললেন, কস্টেলো হারামজাদা তো দারুণ নকল-ছবি বানিয়েছে! আমার কাছে যে অরিজিনালখানা আছে এখানা ছব্ব সেইরকম !

— এখন তো বুঝছেন আপনার সঙ্গে কেউ তৎপরতা করেনি ? এ-সব কথা যেন বাইরের কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না। ভুলে যাবেন না— এখন আপনিও অপরাধের সঙ্গে জড়িত—আন্তর্জাতিক আইন-মোতাবেক আপনাকেও গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। জেল হতে পারে !

— তা তো বটেই। তা তো বটেই!—ভদ্রলোক পালাবার পথ খুঁজে পান না।

আর একবার একখানা ‘ভেরমিয়ার’ বেচতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হল ঝঁকে।

খন্দের রীতিমতো খলিফা! সে জানে ভেরমিয়ারের মাত্র খান-পনের ছবি বিশ্ব-ললিত কলায় স্বীকৃত। পঞ্চাশ হাজার ডলারে সে যেখানা কিনছে সেটা যে ‘অরিজিনাল’ তা বুঝে নিতে চাইল। তাই প্রত্যাবর্তনের দিনে সে ছবিখানা কিনতে রাজী হল না। খোদায়-মালুম—সে কী জাতের সন্দেহ করেছে। বললে, ছবিখানা চুরি গেছে জেনে এখানে কী-জাতের প্রতিক্রিয়া হয় তা সে সমঝে নিতে চায়।

— তার ‘রিস্কটা’ আপনি বুঝতে পারছেন ? হয়তো শহরের প্রত্যেকটি বড় বড় হোটেলে খানা তল্লাসী হবে।

— হয়তো কেন ? নিশ্চয়ই তা হবে। সে ‘রিস্ক’ আমার! পঞ্চাশ হাজার ডলার যেখানে ‘ইনভলভড’ সেখানে ঝুঁকিটা তো নিতেই হবে।

মার্কুইস্ বলেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যটা কী ? সংগ্রহশালায় টাঙানো ছবির পিছনে নিজে হাতে সই দেবেন—ঠিক পাঁচটায়, আর ছবি ডেলিভারি পাবেন সাড়ে পাঁচটায়! নিজে হাতে করা সইটা মিলিয়েই তো আপনি পেয়েই করছেন ! নকল ছবির প্রদ্বিষ্ট আসছে কোথা থেকে ?

ভদ্রলোক বললেন, সেজন্য নয় মশাই। আমি পরদিন সংবাদপত্রের কিছু কাটিংও সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাই ! বুঝলেন না—অরিজিনাল ‘ভেরমিয়ার’ তো আমার বৈঠকখানা ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারব না। কেমন করে পেয়েছি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমি ছবিখানা কিনছি, বেচব বলে। পঞ্চাশ হাজারে কিনে একলাখে ঝাড়ব। যে কিনবে তাকে স্থানীয় সংবাদপত্রের কাটিং দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, এখানকার সংগ্রহশালা থেকে সত্যিই ঐ ছবিখানা চুরি

গেছে !

মার্কুইস্‌ও পেছপা হবার পাত্র নন। পঞ্চাশ হাজার ডলার ‘ইনভলভ’ ! দলে নিতে হল আরও একজন সহকারীকে। সংগ্রহশালার রেস্টোরেটর। তার কাজ হচ্ছে ছবিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। স্থির হল, সে সোমবারে ছবিখানা ঝাড়া-পোঁছা করার জন্য নামিয়ে নেবে। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় সেটা টাঙাতে ভুলে যাবে। ছবিখানা স্টোররুমের ভেঁট রেখে মঙ্গলবার অনুপস্থিত হবে। ফ্রেশ লীডে স্টেশান ছেড়ে চলে যাবে। মূল্যবান ছবি প্রতিবার দেওয়াল থেকে নামিয়ে নেবার আগে রেস্টোরেটরকে সবাধিনায়কের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হয়—সেটাই আইন। এক্ষেত্রে আইনটা লঙ্ঘন করতে হবে তাঁকে। উনি রাজী হলেন—পাক্ষা দশ হাজার ডলারে !

সেবার রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় খরিদদার ভদ্রলোককে স্বাক্ষরিত নকলখানা হস্তান্তরিত করা হল। তারপরেই মূল ছবিটা স্টুং-রুমে রেখে রেস্টোরেটর ভদ্রলোক গা-ঢাকা দিলেন। সোমবার সংগ্রহশালা বন্ধ। মঙ্গলবার দারুণ হৈ-চৈ হল, ছবিটা খোয়া যাওয়ার কথা জানাজানি হতে। তলব করতে গিয়ে দেখা গেল রেস্টোরেটর ভেগেছে ! বুধবারের স্থানীয় কাগজে ছাপা হল দুঃসংবাদটা। পুলিশে খানাতল্লাসী শুরু করল। খরিদদার ভদ্রলোক ঐ বুধবার রাত্রেই সেই কাগজের কাটিং নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে গেলেন। ছবিখানা অবশ্য চুরি ধরা পড়ার অনেক আগেই সীমান্ত অতিক্রম করেছে। বৃহস্পতিবারে হস্তদণ্ড হয়ে ফিরে এলেন রেস্টোরেটর ভদ্রলোক। স্বীকার করলেন অপরাধ—মানে কর্তব্যে অবহেলার। তবে ছবি চুরির নয়। সেখানা যথারীতি গচ্ছিত রাখা আছে ওঁর স্টুং-রুমে। সে সব খবরও ছাপা হল পরদিন স্থানীয় কাগজে—কিছু ততক্ষণে সেই খরিদদার ভদ্রলোকের জাহাজ অতলাস্তিকে। স্থানীয় সংবাদপত্রের কপি তাঁর হাতে আর কোনদিনই পৌঁছয়নি। কিংবা কে জানে, হয়তো পরে জানতে পেরেছিলেন তিনি। কিছু কৈফিয়ৎ দাবী করতে ফিরে আসার হিম্মৎ তাঁর ছিল না। কারণ জানতেন—এ জাতীয় কারবারে কৈফিয়ৎ দাবী করতে বেগানা ফিরে যাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে খুনখারাপির ঝুঁকি নিতে হয় !

এসব দুর্ঘটনার মোকাবিলা করেছিলেন মার্কুইস্‌। তাঁকে পদ্ধতিটা বদলাতে হল অন্য কারণে। একটি আন্তর্জাতিক আর্ট-জার্নালে পড়লেন—লিসবনে একটি অরিজিনাল রেমব্রান্ট বিক্রি করতে গিয়ে এক প্রতারক ধরা পড়েছে। জানা গেছে সেটি নকল, তার পিছনে একটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। অরিজিনালখানা আছে রায়ো-ডি-জেনিরোর সংগ্রহশালায়। গোয়েন্দা পুলিশের আনাগোনা শুরু হল অতঃপর।

সহযোগী গার্ডি এসে মার্কুইসকে গোপনে সংবাদ দিয়ে গেল—প্যালে বাঘ পড়েছে ! শার্ট্‌ আর মার্কুইস নীরবে তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে বুইনস্‌ এয়ার্পোর্টে ফিরে গেলেন। এবার কী করতে চান ? অন্য কোনও সংগ্রহশালায় নতুন করে ব্যবসা খুলবেন ? — জানতে চাইলেন শার্ট্‌।

বেশ বোঝা যায় তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—চিত্রকর থেকে প্রবঞ্চক !

মার্কুইস বললেন, না। আমি পদ্ধতিটাই বদলে নিতে চাই। বুঝলেন না, এই গোয়েন্দা-পুলিসগুলো মহা হারামজাদা। যেমনি সৈয়ানা তেমনি ফিচল। ওরা এতদিনে বোধহয় আমার কায়দাটা বুঝে ফেলেছে — ঐ ছবিটার পিছনে অজ্ঞাত ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখে। হয়তো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে সেলোটেশের অস্তিত্বও বুঝে ফেলেছে। দুই আর দুই-এ চার হিসাবে হয়ত আন্দাজ করেছে কীভাবে নকল ছবিখানা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপের বাজারে গেছে। আমার বিশ্বাস—ওরা

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ফাঁদ শেতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

— বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকাতেই কেন ?

— যেহেতু লিসবনের সেই চোরাই ছবির অরিজিনালটি রায়ো-ডি-জেনিরোতে ছিল এবং আছে।

— তাহলে কি আমরা মার্কিন-মূলকে সরে যাব ?

— না! শোন শার্ট্র! এবার একটা বড় জাতের দাঁও য়ারতে হবে; যাকে বলে ‘মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার’! এমন একটা বড় জাতের অপারেশন করতে হবে; যার পর বাকী জীবন তোমাকে-আমাকে আর এ খাষ্টামোর মধ্যে না যেতে হয়!

— সেটা কী রকম ?

— ধর একটা ডীলে আমরা তিন লাখ ডলার পেলাম—তুমি এক লাখ, আমি দু-লাখ!

— তিন লাখ ডলার একখানা ছবি থেকে! আপনি কি বণ্ডিচেল্লির ‘প্রিমেরো’ অথবা রেমব্রাণ্টের ‘নাইটওয়াচ’-এর কথা ভাবছেন ?

— না। তাতে দু-জাতের অসুবিধে। প্রথম কথা—দু-খানাই প্রকাশ্যে মাপের! বগলদাবা করে পাচার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত ও দুখানাই ফ্রান্সে নেই। তুমি-আমি দুজনেই ফ্রেন্স ভালরকম ভাবে জানি। আমার পরবর্তী লক্ষ্যস্থল পারী। আরও সূচীমুখ করে বলতে পারি : ল্যুভার।

—ল্যুভার! কোন খানা ?

— লেঅনার্দোর ‘মোনালিসা’!

শার্ট্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বারকয়েক কক্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পায়চারি করে ফিরে এসে বলে, আপনি বন্ধ উন্মাদ!

— উন্মাদ! কেন পাগলামির কী দেখলে এতে ?

—পাগলামি নয়? ল্যুভার থেকে ‘মোনালিসা’ ছবিখানা চুরি করা অসম্ভব!

— চুরি তো করব না! তুমি আঁকবে, আর সেই নকলখানাই বেচব আমি!

— আপনি গোড়ায়-গলদ করছেন। ল্যুভার থেকে ‘মোনালিসা’ চুরি গেছে কিনা এখন একটা ওয়ার্ল্ড নিউজ! পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোনো মানুষ যদি স্ববরের কাগজ পড়বার মতো বিদ্যার অধিকারী হয় তবে সে স্ববর জানবেই! ‘কস্টেলো একখানা নকল আঁকেছে, আর ল্যুভার মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ সেখানাই টাঙিয়ে রেখেছেন’ - এ-কথা আপনি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না তাছাড়া ল্যুভারে যারা পাহারা দেয় তারা কোনও স্বদেয়কে ছবির পিছনে সহ্য করতে দেবে না। লক্ষ ডলার পেলেও নয়! তৃতীয়তঃ

মার্কুইস ধমক দিয়ে ওঠেন, ওসব ছেঁদো কথা বাদ দাও শার্ট্র! আমার ওপর নির্ভর কর। সোজা কথায় আমার প্রশ্নের জবাব দাও : ‘মোনালিসা’র স্ববদ নকল আঁকতে পারার হিম্মৎ তোমার আছে? এমন একখানা নকল যা পরীক্ষা করে বোঝা যাবে না?

—তা আছে। যদি তার জন্য লক্ষ-ডলার মজুরি পাই। কিন্তু...

— কিন্তু-টিভুর কথা ছাড়। ল্যুভারে বসে ‘সেভেন-এইট্‌থ-স্কেলে’ ছবিখানা আঁকতে তোমার কতদিন লাগবে?

শার্ট্র একটু ভেবে নিয়ে বললে, ধরুন তিন মাস!

— ঠিক আছে। আর সেই ছবি দেখে ঘরে বসে ‘ফুলস্কেলে’ দ্বিতীয়বার আঁকতে?

— আরও ছয় মাস!

— তা হলে তুমি তৈরী হয়ে নাও। শোন শাদ্র! সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার, সমস্ত ‘রিস্ক’ আমার। আর সমস্ত টেকনিক্যালিটি তোমার। লাভের অংশ বরাবর যেমন ছিল তাই, অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ তোমার, দুভাগ আমার। রাজী ?

— রাজী। যদি আমাকে বেআইনি কাজের কোনও রকম ঝুঁকি নিতে না হয়।

— হবে না। তুমি তৈরী হয়ে নাও। নেক্সট স্টিমারে পারী রওনা হয়ে যাও। সবাই জানবে সাউথ আমেরিকায় ঘুরে তুমি বেশ কিছু ছবি বিক্রি করে দেশে ফিরে এসেছ। সাবেক প্রফেশানেই। অর্থাৎ ল্যুভারে বসে ছবি আঁকা। ঘটনাচক্রে তুমি ছোট স্কেলে ‘মোনালিসা’ খানাই আঁকছ। ছবিখানা শেষ হলে তুমি এখানে ফিরে আসবে। আমি চারশ বছরের পুরানো ক্যানভাস তোমাকে সাপ্লাই করব। তাতে ফুল-স্কেলে ছবিখানা দ্বিতীয়বার ঐক্যে—এ তোমার কীসব চুল-ফাটের কায়দা-মায়দা আছে সব সেরে আমাকে পারীতে টেলিগ্রাম করবে ‘মেশিন সাক্সেসফুলি ইনস্টলড’! আমি তখন এখানে ফিরে আসব। ছবিখানা বেচব! বুঝতে পারলে ?

— আদৌ নয়! আসল ‘মোনালিসা’ ল্যুভারে ঝোলানো থাকবে আর আপনি এখানে এসে নকলখানা কেমন করে বেচবেন ?

এবার মার্কুইস নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে বারকতক পদচারণা করে ফিরে এসে আবার বসে পড়েন। বলেন, লুক হিয়ার শাদ্র। কী ভাবে কী হবে সেসব তোমার জেনে কাজ নেই। সেসব তোমার পক্ষে না-জানাই মঙ্গল। তুমি শুধু আমার অর্ডার মোতাবেক কাজ করে যেও আর কাজ হাঁসিল হলে আমার উপার্জনের খরচা-খরচা-বাদে লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ বুঝে নিও !

শাদ্র বঁকে বসল। বলেন, শুনুন স্যার! এতদিন তাই হয়েছে—কিন্তু এবার তাতে আমি রাজী নই। এটা রীতিমতো বিগ ডীল—বলতে গেলে এ শতাব্দীর হয়তো ‘বিগেস্ট-ডীল’—মানে চোরাই শিল্প পাচারের ইতিহাসে। হয় আপনি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলুন, নয় আমাকে বাদ দিয়ে কাজটা হাঁসিল করুন।

মার্কুইস বললেন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলে এতবড় ‘রিস্ক’ নিতাম না। আমার মনে হচ্ছিল—সব কথা বিস্তারিত না জানাই তোমার পক্ষে মঙ্গল। যা হোক, তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বলি। আজ থেকে এক বছর পরে যেমন করেই হোক ল্যুভার সংগ্রহশালা থেকে ‘মোনালিসা’ ছবিখানা চুরি যাবে। মানে তারিখ আমি নির্ধারণ করব তোমার টেলিগ্রাম পেলে। আমেরিকায় ‘মেশিনটা ইনস্টলড’ হয়েছে জানার পর। তুমি ঠিকই বলেছ, পারীর সব ক’টা কাগজে পরদিন হেড-লাইন নিউজ ছাপা হবে; ক্রমে তা সারা পৃথিবীতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ছবিটা যে চুরি গেছে এ বিষয়ে যখন কারো কোনও সন্দেহ থাকবে না তখনই আমেরিকায় বসে আমি নকল ছবিটা বেচব। সেখানা বিক্রি হয়ে গেলে ফরাসি সরকার আসল ছবিখানা ফিরে পাবে। যে নকলখানা কিনেছে সে তখন হাত কামড়াবে। এবার বুঝলে ?

— সবটা নয়। কীভাবে ‘মোনালিসা’ চুরি যাবে সে প্রশ্ন আমি আদৌ তুলছি না। আমি ভাবছি অন্য একটি প্রশ্ন : কে ওখানা কিনবে ? খন্দের পাবেন কী করে ? ওটা কোন্ মূর্থ কিনবে ? কিনলেও তো তাকে সারা জীবন সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে। কারণ...

— হেতুটা বিস্তারিত বলা বাহুল্য। কিন্তু এসব কথা—আবার বলছি—তোমার না শোনাই

মজল। শুনেচে চাও ?

— চাই। আমার দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছে জানতে।

— তবে শোন। শিল্পদ্রব্যের আন্তর্জাতিক চোরা-কাঁচবাজারের দু-তিনটি উচ্চশর্যায়ের প্রতিষ্ঠান আছে। তারা লক্ষ ডলারের নিচে কেনাবেচা করে না। আমার মাথায় আইডিয়াটা আসার পর আমি তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। একজন জানিয়েছেন—হ্যাঁ, ‘মোনালিসা’ ছবিখানা যদি ল্যুভার থেকে চুরি যায় তবে সেখানা কিনবার মতো খন্দের তাঁর হাতে আছে। আনুমানিক তিন লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যে। তুমি জানতে চাইলে ক্রেতা সেখানা নিয়ে কী করবে—তাই নয় ? তার জবাব হচ্ছে : সেখানা ফরাসী সরকারকে প্রত্যর্পণ করবে !

— তাজ্জব! তার মানে ?

— ক্রেতা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ। ফরাসী সরকারের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কয়েক শত কোটি ডলারের ডীল। বুঝতেই পারছ—মোনালিসা চুরি যাওয়ায় ফরাসী সরকার বিশ্বের কাছে অপদহ হয়ে পড়বে। ছবিখানা অবিলম্বে উদ্ধার করতে না পারলে হয়তো আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে। তাই ছবিখানা ফেরত পাওয়ার জন্য ওদের অপরিসীম আগ্রহ। আমার ছবির ক্রেতা সেই সুযোগটি নিতে চান। তিন লক্ষ ডলারে আমার কাছে কিনে তিনি গোপনে সেটি ফরাসী সরকারকে উপহার দেবেন। গোপনে এ জন্য যে, কৃতিত্বটা তিনি ফরাসী সরকারকেই অর্পণ করতে চান। যেন তারা নিজেরাই ছবিটা উদ্ধার করেছেন। নির্বাচনের আগে এটা করতে পারলে সরকার অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ক্রেতার স্বার্থে এ বাণিজ্যিক চুক্তি করতে ফ্রান্স বস্তুত বাধ্য হবে। বুঝলে ?

শাদ্রি স্বীকার করলেন—আদ্যন্ত পরিকল্পনাটা তাঁর বোধগম্য হয়েছে। এবার তিনি অন্য একটি প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনিও আমার সঙ্গে একই স্টিমারে পারী যাচ্ছেন না কেন ? আপনাকে তো ছবিটি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে আপনার কী কাজ ?

— না। একই জাহাজে আমরা যাব না। আমি যাব নেঞ্জট স্টিমারে। ছদ্মনামে। ছদ্ম-পাসপোর্টে। মার্কুইস ওয়ালফিয়েনকে আজ থেকে তুমি চেন না। আমিও চিনি না !

— তার কী প্রয়োজন ?

— সেটা তুমি বুঝবে না। বুঝলে, ভগবান তোমাকে যে অঙ্কন-প্রতিভা দিয়েছেন তাতে তুমি লাভের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে খুশি থাকতে না। বুঝলে না ? এক বছর পরে যে অপরাধটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাকে তার জন্য এখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। ‘মোনালিসা’ অপহরণের সঙ্গে কোন সূত্রেই যেন মার্কুইস এদুয়ার্দো দ্য ওয়ালফিয়েনোর নামটা যুক্ত করা না যায় সে ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে।

প্রায় তিন মাস পরে পারীর সেন্ট্রাল স্টেশনে একটি দিন। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। পারীর রাস্তায় ছাতার মিছিল। শাদ্রি আজ আর ল্যুভারে ছবি আঁকতে যেতে পারেননি। দিন কয়েক আগেই অতলাস্তিকের ওপার থেকে একটি তারবার্তায় জেনেছেন সিনর আলবার্তো গঞ্জালেস লন্ডন ঘুরে ট্রেন-যোগে পারীতে এসে পৌঁছবেন আজ। সেই মর্মে সিনর গঞ্জালেস-এর নামে একটি পাঁচতারা হোটেলে বিলাসবহুল সুইট বুক করে স্টেশানে এসেছেন তাঁকে রিসিভ করতে। ঠিক সময়ই ক্যাল-পারী এক্সপ্রেসটা স্টেশানে এসে পৌঁছালো।

শাদ্রি প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মার্কুইস-এর জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাশাপাশি

তিনখান ফার্স্ট ক্লাস কামরা। যাত্রীরা সকলেই নেমে পড়লেন।

আশ্চর্য!

মার্কুইস আসেননি। সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে শেছন ফিরতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন পোর্টম্যান্টো ব্যাগ হাতে। হেসে বললেন, সুপ্রভাত মসিয়োঁ শাদ্রঁ ! আমাকে চিনতে পারেননি। নয়?

তাজ্জব! কঠিনেরে ঝঁকে সনাক্ত করা গেল। চেহারা দেখে নয়।

মার্কুইস-এর ছিল নিপাট কামানো মুখ, চোখে কালো চশমা। ঐর ফ্রেঙ্ককাট দাড়ি, সূচালো গৌঁফ, চোখে প্যাশনে। শাদ্রঁ তোক গিলে বললেন, সুপ্রভাত মসিয়োঁ গঞ্জালেস। না! অনেকদিন পরে দেখছি তো, তাই প্রথমটায়...

বাধা দিয়ে মার্কুইস বললেন, আমাকে শুধু 'সিনর' বলে উল্লেখ করবেন। পুরো নাম উচ্চারণের কী দরকার? সিনর তো যে কোনও লোকের অভিধা। চলুন, যাওয়া যাক! উঃ কী বৃষ্টিটাই না নেমেছে!

হোটেলের রেজিস্টারে গঞ্জালেসের সই দিয়ে মার্কুইস উঠে এলেন নিজের ঘরে। অর্গলবদ্ধ ঘরের নির্জনতায় বললেন, শোন শাদ্রঁ, একখানা নয়, তোমাকে দুখানা 'মোনালিসা' আঁকতে হবে। আরও একটি খরিন্দার জোগাড় হয়েছে ইতিমধ্যে। শাদ্রঁ ভিজে ওভারকোটটা সংলগ্ন বাথরুমে টাঙিয়ে ফিরে এসে বললেন, সিনর! আমি দুঃখিত! আপনাকে পরিকল্পনাটা পাল্টাতে হবে!

— পাল্টাতে হবে! কেন? কী এমন ঘটল ইতিমধ্যে?

— ল্যুভার গেলেই দেখতে পাবেন! এই কয়েক বছরে মধ্যে পারীতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে! লা জ্যাকোন্ডা ছবিখানা এখন বুলেট-প্রুফ কাচের ফ্রেমে সুরক্ষিত!

— বুলেট-প্রুফ কাচের ফ্রেম! তার মানে?

শাদ্রঁ আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা মেলে ধরেন :

গত বৎসর, অর্থাৎ উনিশ' শ দশ সালে ল্যুভারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। জর্নৈক মদ্যপ দর্শক একটি মহিলার পোর্ট্রেটে একটি ছোরা বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়। সকলে ধরে ফেলায় ছবিটা কোনক্রমে বাঁচে। ছবিখানায় সে নাকি তার বিশ্বাসহত্যা প্রেমিকার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিল। তারপর অনেক অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। ল্যুভারের ডিরেক্টরবর্গ সিদ্ধান্ত নেন যে, অতি বিখ্যাত শিল্পসম্ভারগুলিকে বুলেট-প্রুফ কাচের আবরণে সুরক্ষিত করতে হবে। তাতে বহু প্রতিবাদধ্বনি ওঠে। কাচের ভিতর দিয়ে শিল্পসম্পদ নাকি ভাল ভাবে দেখা যাবে না। তার সৌন্দর্যহানি অনিবার্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিবাদেই কর্ণপাত করেননি। স্থির হয়েছে প্রতি বৎসর পাঁচ-দশখানি করে ছবি ঐভাবে কাচের আবরণে সুরক্ষিত করতে হবে। প্রথম ব্যাচের মধ্যেই প্রত্যাশিত ভাবে ছিল : 'মোনালিসা'।

বর্তমানে 'লা জ্যাকোন্ডা' ঐ বহুবর্ষধিনি কাচের দুর্গে সুরক্ষিত!

মার্কুইস গভীর হয়ে অনেককক্ষ চিন্তা করে বললেন, যা হোক, তোমার ছবি কত দূর? ছোট স্কেলে যে ছবিখানা আঁকছ?

— আমি 'মোনালিসা' আদৌ আঁকছি না। ওটা অপসারণ করা অসম্ভব বুঝে আমি অন্য একখানি ছবি...

মার্কুইস উত্তেজিত হয়ে বলেন, এই জন্যেই সেদিন তোমাকে সব কথা বলতে চাইনি! এসব

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কে বলেছে তোমাকে? তুমি হুকুম পেয়েছ, তামিল করে যাবে। আমি কীভাবে কী করব তা তুমি ভাবতে বসলে কেন?

— আপনি এখনো ঐ ছবিখানার কথাই ভাবতে পারছেন?

— নিশ্চয়ই! কী ভাবে এ বাধা অতিক্রম করব তা জানি না, কিন্তু করতেই হবে।

— কিন্তু কেন? তার চেয়ে যেসব ছবি সুরক্ষিত করা হয়নি তার কোন একটা...

— তা হয় না!

— কেন হবে না? আপনি ইচ্ছে করলেই তো তা হতে পারে?

— পারে না শার্ট্র, পারে না! একটি মাত্র কারণে। আমি আর কোনও ছবির কথা চিন্তাই করতে পারছি না! আমার একান্ত প্রেম একমুখী! আমি যে আকর্ষ ডুবে আছি মোনালিসার প্রেমে!

পারীর অন্যতম প্রধান রাজপথ সার্জেঁ লির্জঁ-র ওপর গোবিয়ার কোম্পানির শো-রুম। প্রকাণ্ড বড়। গোবিয়ার স্ট্রেনজিয়ার প্রাইভেট কোম্পানি। ‘বুলেট প্রুফ’ কাচ তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পেটেন্ট নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে বসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালা থেকে ক্রমাগত ওঁরা অর্ডার পান—অত্যন্ত মূল্যবান শিল্পসামগ্রীকে বুলেট-প্রুফ আস্তরণে সুরক্ষিত করার এন্ডেজামে। রোমের ত্যাটিকানে, ফ্লোরেন্সের উফিজিতে, আমস্টারডামের রাইখ্ মুজিয়ামে ওঁরা কর্মী পাঠিয়ে অনেক মহামূল্যবান শিল্পসামগ্রীকে সুরক্ষিত করেছেন। এমনকি অতলান্তিকের ওপার থেকেও—নিউ ইয়র্ক, লন্স অ্যাঞ্জেলেস্, শিকাগো থেকেও অর্ডার আসছে।

সকাল দশটা। অ্যাভিনিউ পথটি সীন নদীর সমান্তরালে। এখন শহর জাগছে। গতকাল সন্ধ্যায় এই নদীতীরের কুঞ্জ-বিতানে জোড়ায়-জোড়ায় যে তরুণ-তরুণীর দল পারীর সন্ধ্যা উপভোগ করে গেছে এখন তাদের স্মৃতি যেন স্বপ্নকথা। এখন এ পথ দিয়ে রক্তধ্বাসে ছোট্টছুটি করছে অকিসগামী যাত্রীর দল। হাতে ছাতা, এবং পোটম্যাস্টো। মাঝে-মাঝে দু-একটি ল্যান্ডো অথবা হ্যানসম। পারীর রাস্তায় মোটরগাড়ি তখনো সংখ্যালঘিষ্ট।

একটি হ্যাকনি ক্যারেজ দাঁড়ালো গোবিয়ার কোম্পানির গাড়ি-বারান্দার নিচে! নেমে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গায়ে ওভারকোট, মাথায় বাউলার টপ-হ্যাট, হাতে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালো একটা সোশিন ছড়ি। মুখে ফ্রেন্সকাট দাড়ি — অষ্টম এডওয়ার্ডের ঢঙে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে রিসেপশনিস্ট-এর কাছে নিজের ভিজিটিং কার্ডখানি দাখিল করে জানতে চাইলেন, আন-অ্যাপয়েন্টেড এসেছি, মসিয়োঁ পন্ডিফ্ কি পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন?

রিসেপশনিস্ট ওঁকে বসতে বললে। ওঁর কার্ডখানির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। সাক্ষাৎপ্রার্থী ইংরাজ। নাম : ডঃ স্যামুয়েল রিচার্ডসন। ঠিকানা লন্ডনের। কিন্তু নামের পরে তিনটি ক্যাপিটাল অক্ষরে বোঝা যায় উনি রয়্যাল আর্ট সোসাইটির ফেলো। ধুরন্ধর শিল্পবোদ্ধা। মেয়েটি বাও করে বললে, একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমি দেখছি কী করতে পারি।

অচিরেই ভিতর থেকে ডাক এল বৃদ্ধের।

গোবিয়ার স্ট্রেনজিয়ার ফার্মের সিনিয়র পার্টনার মসিয়োঁ পন্ডিফ্ মধ্যবয়সী। সাদরে তিনি আহ্বান করলেন ডক্টর রিচার্ডসনকে। বললেন, বসুন স্যার, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি বলুন? টুপিটা অভিবাদনের জন্য খুলেছিলেন, সেটা কোলের ওপর নিয়ে ডক্টর রিচার্ডসন ভিজিটাস

চোয়ারে বসলেন। বললেন, আমার ভিজিটিং কার্ডে লন্ডনের ঠিকানা আছে বটে কিন্তু আজ তিন বছর আমি/আছি ভারতবর্ষে। ইন্ডিয়াতে রাজস্থান বলে একটা অঞ্চল আছে—নাম শুনেছেন ? — শুনেছি! টডস্ রাজস্থান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানে আছে অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য। ব্রিটিশ প্যারামাউন্টির অধীনে করদ রাজ্য। আমি বর্তমানে তারই একটি রাজ্যের সংগ্রহশালার কিউরেটর। বস্তুতঃ রাজস্থানী আর গুজরাটী পট চিত্রের ওপর একটি গবেষণা করব বলেই ঐ চাকরিটা নিয়েছি। আর মাসছয়েক থাকতে হবে। হোমে যাচ্ছিলাম, পারীতে দু-দিন থাকব। ড্যাটিকানে আপনাদের কাজ দেখে একটা আইডিয়া মাথায় এল। তাই একটি প্রস্তাব নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম।

— বলুন স্যার ?

বৃদ্ধ আদ্যোপান্ত খুলে বললেন সব কথা।

উনি যে রাজ্যের আশ্রিত তাঁর দরবারে, সিংহাসনের শিঁখনে টাঙানো আছে একটি সিল্কের স্ক্রোল। মহারাজার এক পূর্বপুরুষ গত শতাব্দীতে সেটি তিব্বত থেকে নিয়ে আসেন। তিব্বতের কোন মঠাধ্যক্ষ লামা নাকি সেটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তারপর ছয়-দশক ধরে সেটি দরবার-কক্ষে শোভা পাচ্ছে। ঊঁদের ধারণা সেটা একটা রাক্ষসের ছবি। বাস্তবে তা নবম-শতকে অঙ্কিত এক ‘লাফিং-বুদ্ধা’! ডক্টর রিচার্ডসনের মতে সেটি একটি অমূল্য শিল্পসম্পদ। তাঁর আহ্বানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান মেজর-জেনারেল কানিংহ্যাম সাহেব এসে ঐ রেশমের ওপর আঁকা ছবিটি পরীক্ষা করে বলেছেন, তার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ রুপেয়া!

— রুপেয়া ? মানে ?

— ভারতীয় মুদ্রা। ধরুন লক্ষ ফ্রাঁ! কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর ওটি অপহরণের প্রচেষ্টা হয়। এদিকে রাজা কিছু ‘সুপারস্টিশাস্’—ঐ রাক্ষসমূর্তিটি দরবার-কক্ষ থেকে অপসারিত করলে নাকি তাঁর ওপর দেবতার কোপ পড়বে! এখন ডক্টর রিচার্ডসনের প্রস্তাব—গোবিয়ার-কোম্পানির তরফে কোনও কর্মী কি ভারতবর্ষে গিয়ে ঐ স্ক্রোলটি দরবারের দেওয়ালে বুলেট-প্রুফ কাচ দিয়ে সংরক্ষিত করে আসতে পারে ?

— ছবিটি কত বড় ?

— ত্রিশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি।

— মাপ করবেন। সেটিমিটারের হিসাবে বলুন।

বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, তা বটে। আমি ভুলে গেছি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে আছি। ধরুন পাঁচগুণ সে.মি. বাই পঞ্চাশ সে.মি.।

মসিয়োঁ পন্টিফ বললেন, কিন্তু খরচ যে অনেক পড়ে যাবে, ডক্টর!

— তা তো পড়বেই। আপনাদের ন্যায্য দাবীর ওপর আমি একজন কর্মীর যাতায়াতের খরচ দেব। এখানে সে যা মজুরি পায় তার দেড়গুণ মজুরি দেব। এক্ষেত্রে এমন কোন এজেন্ট কর্মী কি ফোকটে ভারতবর্ষটা বেড়িয়ে আসতে রাজি হবে না ?

পন্টিফ বললেন, হবে। আমার দুজন এজেন্ট কর্মীর কথা মনে আসছে। কিন্তু তাদের একজন ছাপোষা প্রৌঢ় মানুষ। হয়তো বউ-ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে চার-ছয় মাসের জন্য বিদেশে যেতে রাজি হবে না। দ্বিতীয়জন অল্পবয়সী, ব্যাচিলার। একজন ইতালিয়ান। লুভারের যাবতীয় কাজ সেই করেছে। আমি তাকেই বাজিয়ে দেখি।

— নো...। কিন্তু আমি তো আগামীকালই পারী ত্যাগ করে যাব। তাকে আজই...

— দেখছি।

পন্ডিফ একজন সহকর্মীকে বললেন, ভিল্‌ আচ্ছ কোথায় কাজ করছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখত। নিতান্ত ঘটনাচক্রে ভিন্সেন্সো শেরগিয়া অফিসেই উপস্থিত ছিল। বড় সাহেবের আহ্বান পেয়ে সে দেখা করতে এল।

বছর ত্রিশ বয়স। একহারা ছিগছিগ চেহারা। একটু বোকা-বোকা চাহনি।

— আপনি আমাকে ডাকছিলেন স্যার ?

— হ্যাঁ। শোন। তোমাকে একটা কাজে আমরা ভারতবর্ষে পাঠাতে চাই। মজুরি যা পাচ্ছ তার দেড়গুণ পাবে। যাতায়াতের খরচ আমাদের। ফিরে আসতে মাস ছয়েক দেবী হবে। তুমি যেতে রাজী আছ ? ইনিই সব খরচ দেবেন।

লোকটার গলকণ্ঠ বার-কয়েক ওঠা-নামা করল। ভাল করে আগভুক্তকে দেখে নিল। তারপর সে একটি সঙ্কত প্রশ্ন করল, যাতায়াতে জাহাজে আমার যে দেড় দু'মাস সময় লাগবে তখন তো আমি বেকার ?

ডক্টর রিচার্ডসন বললেন, নিশ্চয়ই নয়। সাবাথ-ডে বাদে পারী ত্যাগ করা থেকে ফিরে আসার দিনটি পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাকে দেড়া-মজুরি দেওয়া হবে। এছাড়া যাতায়াতের এবং থাকা খাওয়ার যাবতীয় রাহাখরচ।

আবার গলকণ্ঠটা ওঠা-নামা করল। লোকটা বলল, আমাকে কিছু অগ্রিম দিতে হবে তাহলে। আমি জামা-কাপড় বানাবো !

রিচার্ডসন বললেন, নিশ্চয় ! এখনই দিয়ে যাচ্ছি। লন্ডন থেকে আমি ফিরে আসব ঠিক একমাস পরে। ইতিমধ্যে তুমি তৈরী হয়ে থাক।

ওভারকোটের ভিতরের পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করে ডক্টর রিচার্ডসন জানতে চাইলেন, এখানে তুমি দৈনিক কত করে মজুরি পাও ?

— তিন ফ্রাঁ।

— ঠিক আছে। আমার কাছে সাড়ে-চার ফ্রাঁ পাবে দৈনিক। আর এই ধর তিনশ ফ্রাঁ অগ্রিম। জামা-কাপড়, স্যুটকেস ইত্যাদি কিনে তৈরী হয়ে থেক।

এতক্ষণে লোকটা হাসল।

ডক্টর রিচার্ডসন মসিয়োঁ পন্ডিফকে বললেন, লন্ডন থেকে ফেরার পর আপনার সঙ্গে অন্যান্য কথা হবে। কুন্ট-প্রুফ কাচ, ফ্রেম বা অন্যান্য যার মূল্য আমার দেয় তা মিটিয়ে দিয়ে যাব। আজ উঠি তাহলে।

করমর্দন করে উনি দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ওঁর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেছে। বললেন, মসিয়োঁ পন্ডিফ, আপনি কি ওবেলার জন্য শেরগিয়াকে ছুটি দিতে পারেন ?

— কেন বলুন তো ?

— আমি যে ঘরখানা ভাড়া নিয়েছি তার জানলার একখানা কাচ ভাঙা। কাল রাত্রে শীতে কষ্ট শেয়েছি। আপনি অনুমতি দিলে মসিয়োঁ শেরগিয়া আজ বিকালে একখানা কাচ আমার ঘরে লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

— এ আর এমন শক্ত কথা কি ?

ডক্টর রিচার্ডসন তাঁর সাময়িক আবাসের ঠিকানা লিখে কাগজখানা ঐ ইতালিয়ান ছোকরার হাতে দিলেন। বললেন, বিকেল তিনটে নাগাদ আমি তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করব। কাচ তুমি নিয়ে যেও। আন্দাজ দশ ইঞ্চি বাই...আই মীন, ত্রিশ সেন্টিমিটার বাই বিশ সেন্টিমিটার। লোকটা আবার একগাল হাসল।

ঐদিনই বেলা এগারোটা।

শাদ্রি তার রঙ তুলি গুছিয়ে নিয়ে তৈরী। মার্কুইস্ ওকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। না হলে সে ন'টার মধ্যেই সচরাচর ল্যাভারে চলে যায়। সমস্তদিন ধরে আঁকে। আঁকে : মোনালিসা। উপায় কী ? মার্কুইসের প্রেম যে একমুখী !

ডোর বেল বাজল। শাদ্রি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরে এলেন মার্কুইস। বললেন, শোন শাদ্রি। আজ সন্ধ্যায় তুমি এঘরে ছুট করে এসে পড়ো না। সন্ধ্যায় কোনও অপেরা হাউসে ঢুক পড়। রাত ন'টা পর্যন্ত তোমার কাছে এই ঘরখানা আউট অফ বাউন্ডস্ ! বুঝলে ?

— কী ব্যাপার ?

— ব্যাপার কিছুই নয়। তোমার ঘরে ঐ পুর্বের জানলার ভাঙা কাচটা মেরামত করতে একজন মিস্ত্রি আসবে। আমি চাই না তোমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে যাক। তুমিও তাকে দেখবে না। সেও তোমাকে দেখবে না।

— জানলার কাচ ! কোনও জানলার কাচ তো ভাঙা নেই এ-ঘরে।

মার্কুইস নিচু হয়ে জুতোর ঘিতে খুলছিলেন। ছদ্ম বিরক্তি দেখিয়ে বলেন, আঃ ! বড় তর্ক কর তুমি ! ঐ কাচখানা ভাঙা নয় ?

শাদ্রি অবাক হয়ে বললে, কোনখানা ?

মার্কুইস তাঁর হাতির দাঁতের মুঠওয়াল ছড়িটা তুলে নিয়ে জানলার কাচে সজোরে আঘাত করে বললেন, এইখানা !

ঝন্ ঝন্ করে কাচটা শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে !

লোকটার সময়-জ্ঞান আছে। বিকেলবেলা ঠিক তিনটের সময় শাদ্রির সদর দরজায় কল-বেল বেজে উঠল। শাদ্রি ততক্ষণে ল্যাভারে বসে মোনালিসা মক্‌সো করছে। মার্কুইস এসে দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করল সেই ইতালিয়ান মিস্ত্রি—ভিন্সেন্‌জো শের্‌গিয়া। ভাঙা কাচখানা মেরামত করতে তার ঘণ্টাখানেক সময়ও লাগল না।

মার্কুইস-এর হাতে কাজ ছিল না। বসে বসে খোশগল্প করলেন ঐ ইতালিয়ান যুবকটির সঙ্গে। ওর আদি নিবাস ইতালীর লম্বার্ডি অঞ্চলে—দুমেঞ্জাতে। বিয়ে-থা করেনি। বাপ ছিল আর্টিস্ট; নামজাদা নয়—একজন প্রথিতযশা চিত্রকরের অধীনে কাজ করত। কিন্তু ঠাকুর্দা ছিল সত্যিই নামকরা চিত্রকর।

ভিন্সেন্‌জো নেমে এসেছে আরও এক ধাপ। সেও রঙ তুলি ব্যবহার করে। তবে শুধুমাত্র রঙমিস্ত্রি হিসেবে। চুনকাম করার কাজে, অথবা ডিস্টেম্পার। ওয়াল-পেপারিং, কাচ-লাগানোর কাজেও দড়। বাইশ বছর বয়সে কাজের ধান্দায় ফ্রান্সে চলে আসে। আর দেশে যায়নি। মনের

দুঃখে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল রাগারাগি করে। লেখাপড়া বেশি শেখেনি। একটু-আধটু খবরের কাগজ পড়তে পারে। ওর দুই দাদাই লেখাপড়া শিখেছে। চাকরি-বাকরি করছে। এই রঙমিষ্টি প্রায়-বেকার ছোটভাইকে অন্ন জোগাতে তাদের বুক ফেটে যেত। যতটা না তাদের, তার চেয়ে তাদের বউদের! ভিন্সেন্‌জো তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় বলে এসেছিল—‘পায়ে হেঁটে যাচ্ছি, গাড়ি করে যদি না ফিরি তবে কোনদিনই দেশে ফিরব না!’ বেচারির সে স্বপ্ন সফল হবার কোনও সম্ভাবনাই এ ক-বছরে দেখা দেয়নি। দৈনিক তিন-ফ্রাঁ মজুরিতে গ্রাসাচ্ছাদনই কটকট। পারীর মত দুর্ভুল্যের বাজারে।

মার্কুইস ওর হাতে একটা বিশ ফ্রাঁর নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, সামনের দোকান থেকে কিছু খাবার আনতে। লোকটা নিয়ে এল। তাকেও ভাগ দিলেন, নিজেও খেলেন। ভাঙানিটা ফেরত চাইলেন না। বরং আরও ঘনিয়ে আলাপ জমালেন। বললেন, শোন ভিল্‌, তোমার স্বপ্ন আমি সফল করতে পারি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাও!

লোকটা হ্যাঁ হয়ে গেল। চৰ্ণকার্য বন্ধ হয়েছিল তার, তবু গলকণ্ঠটা ওঠানামা করল। আমতা আমতা করে বলে, মানে? আমার কোন স্বপ্ন সফল হবার কথা বলছেন আপনি?

—তারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে তুমি একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ড কিনবে। মটোর গাড়ি চেষ্টাই যাবে তোমার দেশে!

—কী বকছেন স্যার, পাগলের মতো! একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ডের দাম কত জানেন?

—কত আর হবে? ধর দশ হাজার ফ্রাঁ? আমি তোমাকে বিশ হাজার ফ্রাঁ দেব!

—বি-শ হা-জা-র! —লোকটা হ্যাঁ হয়ে গেল!

অনেকক্ষণ সে কথা বলল না। মেঝেতে আঁকিঁকি আঁকল আঙুল দিয়ে। তারপর চোখ তুলে বললে, আপনার প্রস্তাবটা কী?

একটা আবাতে গল্প ফেঁদে বসলেন মার্কুইস। প্রস্তাবটা এই রকম চেহারা নিল:

ডক্টর রিচার্ডসন ইতিমধ্যে ঐ তিববতি ছবিখানির একটি হব্ব নকল ঐঁকে ফেলেছেন। সেটি লুকিয়ে রেখে এসেছেন ভারতবর্ষেই। পুরনো সিন্ধের ওপর আঁকা ছবি—যাতে বোঝা না যায় যে সেটা নকল। ওঁর প্রস্তাব—উনি ভিন্সেন্‌জোকে নিয়ে তারতবর্ষে পৌঁছলে ভিল্‌ সবার আগে রাজদরবারের সিঁহনের দেওয়ালে ছবিখানাকে বুলেট-প্রুফ কাচে আটকে দেবে। এ কাজটা তাকে করতে হবে রাজার ব্যবস্থাপনায়, অর্থাৎ সশস্ত্র প্রহরায়। ফলে আসল ছবিটাই সুরক্ষিত করতে হবে তাকে। কিন্তু ছবিখানার সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে প্রহরায় কিছু শিথিলতা দেখা দেবে। নেহাৎ যদি তা না হয় তাহলে ডক্টর রিচার্ডসন দু-একটি রাজ-প্রহরীকে উৎকোচে বশীভূত করে সে ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন ভিল্‌-এর কাজ হবে—একদিন গভীর রাতে এসে ঐ বুলেটপ্রুফ কাচটা ফ্রেম সমেত খুলে ফেলে নকল ছবিটা সেখানে বসিয়ে দেওয়া! বাস্! তাহলেই কেব্লা ফতে! তারপরই ভিল্‌কে নিয়ে উনি ফিরে আসবেন ইউরোপে। আসল ছবিখানা নিয়ে উনি চলে যাবেন ওঁর লন্ডনের ডেরায় আর বিশ-হাজার ফ্রাঁ পকেটে নিয়ে ফোর্ড গাড়ি চেষ্টে মসিয়োঁ ভিন্সেন্‌জো পেরুগিয়া চলে যাবে ইতালীতে—সেই লম্বার্ডির দুমঞ্জাতে! যারা সামান্য রঙ-মিষ্টি বলে একদিন ওকে হেনস্থা করেছে তাদের চোখগুলো নাটানটা হয়ে যাবে! যাবে কি যাবে না সে তো ভবিষ্যতের কথা, প্রস্তাবটা শুনে সামান্য রঙ-মিষ্টির চোখ এখনই নাটা-নাটা হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেষ্টে বললে, আমি রাজী! পুরো বিশ হাজার কিন্তু!

—বুলেট-গ্রুফ কাচটা খুলে নকলখানা আঁটকে তোমার কতক্ষণ সময় লাগবে ?

— ধরুন আশঘট্টা।

— মাত্র ? তার মানে তুমি প্রথমবার আলগাভাবে আটকাবে ? না ভিল্ ! তা হবে না !

— না স্যার ! প্রথমবারে আমি খুব যত্নবুৎ করেই সাঁটব।

— তাহলে মাত্র আশঘট্টার মধ্যে কেমন করে সব কাজ সারবে তুমি ?

— যে লাগায়, সে জানে কী করে খুলতে হয়।

— আমার বিশ্বাস হয় না। ধর ল্যাভারের ঐ ‘মোনালিসা’খানা। ওটা খুলে নিতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার ?

— ঐ আশঘট্টাই ! যতক্ষণ লেগেছিল নেশোলিয়ঁর !

— নেশোলিয়ঁ ! মানে ? কোন নেশোলিয়ঁ ?

— নেশোলিয়ঁ বোনাপার্তির। কেন, আপনি জানেন না—কীভাবে ছবিটা ল্যাভারে এল ?

সেটা ভালভাবেই জানা ছিল মার্কুইস্-এর। কিন্তু তিনি অজ্ঞতার ভান করে বললেন, কীভাবে ? অশিক্ষিত ভিল্ তার জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিল এবার। ল্যাভারের অধিকাংশ শিল্পই নাকি ইতালিয়ান চিত্রকরদের আঁকা—লেঅনার্দো, তিজিয়ানো, রায়ফয়েল, বতিচেল্লি, ভেরোনিজ, এল থ্রেকো, ভেরমিয়র—কে নয় ? কোন শালা ফরাসী অমন ছবি আঁকতে পারে ? সব লুটের মাল ! নেশোলিয়ান বোনাপার্তি ইতালী থেকে সব কিছু অপহরণ করে এনেছে !

মার্কুইস তা জব্বব বনলেন। তাঁর ধারণা ছিল এল থ্রেকো ছিলেন গ্রীক, ভেরমিয়ার নেদারল্যান্ড-এর চিত্রকর—আর ‘মোনালিসা’খানাকে নেশোলিয়ান আদৌ অপহরণ করে আনেননি। চিত্রকর স্বয়ং বিক্রয় করেছিলেন ফরাসী সম্রাটকে।

তা হোক ! ভিল্কে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা আত্মদান না করানোই ওর পক্ষে সুবিধার। লোকটাকে বাজিয়ে দেখা হয়ে গেছে। বিশ হাজার ফ্রাঁতে যে কল্পিত ‘লাফিং বুদ্ধা’ অপহরণে স্বীকৃত, তাকে পঞ্চাশ হাজার অফার করলে সে লেঅনার্দোর ‘মোনালিসা’খানাও খুলে এনে দেবে। বিশেষ, সে তো ইতালিয়ান হিসেবে একশ বছর পরে নেশোলিয়ান বোনাপার্তির কুকর্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে !

অতি ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন মার্কুইস। শাঈর সঙ্গে ল্যাভারে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন বুলেট-গ্রুফ কাচের ফ্রেমের একপ্রান্তে খুব ছোট হরফে লেখা আছে GOBIER,

টেলিফোন গাইড হাতড়ে তাদের ঠিকানা জোগাড় করলেন। ডক্টর রিচার্ডসনের নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকের পরিচয়ে সন্ধান করলেন—কে ঐ বুলেট-গ্রুফ কাচের আবরণী লাগিয়েছে। ঘটনাচক্রে পেয়ে গেলেন এই বোকা-সোকা ইতালিয়ান রঙ-মিস্ত্রিটাকে। এখন ওর বিদ্রোহবাহিত ইন্ধন জুগিয়ে আর তার সঙ্গে মোটা অঙ্কের উৎকোচের লোভ দেখিয়ে বাকি কাজ সারতে হবে।

ধুরন্ধর মার্কুইস-এর পক্ষে সে কাজটা সহজেই হয়ে গেল।

কীভাবে ছবিখানা ল্যাভার থেকে অপসারণ করতে হবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উনি বুঝিয়ে দিলেন। কাজটা ভিল্কে একা-হাতে করতে হবে না। আরও দুজন সহকারী থাকবে তার সঙ্গে। তারা দুদিকের দরজায় পাহারা দেবে।

পরিকল্পনাটি নিখুঁত।

এবার আমরা বরং ফিরে আসি বিশ-এ আগস্ট উনিশ শ এগারো তারিখে। অর্থাৎ যে-মঙ্গলবার, বাইশ তারিখে মোনালিসাখানা অশ্রুত হয়েছে বলে জানা গেল তার আগের রবিবারে। ইতিমধ্যে শার্ট্র ছবিখানার একটি ছোট মাপের স্ববহনকল বানিয়েছে। সেটা নিয়ে জাহাজে চেষ্টা অতলাস্তিকের ওপারে চলে গেছে। কার্টমস্-এ তাকে কোনই বেগ পেতে হয়নি, ছবিখানা আকারে ছোট হওয়ায়। যাবার আগে সে মার্কুইস-এর কাছে নির্দেশ পেয়েছে তাকে মার্কিন মূল্যে শৌছে ছ'খানি নকল করতে হবে। হ্যাঁ, এক বা দুটি নয়, ছয়খানা! মার্কুইস চিত্রাপহরণের পূর্বেই ছয়-ছয়জন ক্রেতার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন এই ক'মাসে। চারশ বছরের প্রাচীন ক্যানভাস জোগাড় করতে হয়নি। কারণ শার্ট্র ইতিমধ্যে ইনস্‌তুৎ দ্য নাশিওনেলে পড়াশুনো করে জানতে পেরেছে চারশ বছর আগে লেঅনার্দো মূল ছবিখানা আঁকেছিলেন সূক্ষ্মশ্রেনওয়ালা একশত পশ্লার কাঠের ওপর। মূল ছবিটার মাপ সাতাত্তর সে.মি বাই তিশান্ন সে.মি। সুতরাং শার্ট্র 'অ্যাষ্টিকুইটি শপ' থেকে একটি চার-পাঁচশ বছরের পুরাতন ইটালিয়ান পালঙ্ক ক্রয় করলেন—এ পশ্লার কাঠের। তা থেকে ছ'খানি ঐ মাপের প্যানেল কেটে বার করা হল। সব কিছু নিয়ে তিনি সিমার ধরে অতলাস্তিকের ওপারে চলে গেলেন।

এপারের কথা বরং বলি :

রবিবার, বিশে আগস্ট বেলা আড়াইটে। উনিশ শ এগারো সাল। ল্যুভারের দুটি প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন তিনজন দর্শনার্থী। পোর্তে দেন প্রবেশদ্বার দিয়ে যিনি এলেন তিনি পাঠকের পরিচিত। যদিও বেশবাস দেখে তাঁকে চেনবার উপায় নেই। মাথায় সুদৃশ্য হ্যাট, গায়ে কালো ওড়ারকোট। বাঁ-হাতটার কনুই দেহের সঙ্গে সাঁটা—কারণ ওড়ারকোটের নীচে আছে গুঁটুলি-পাকানো আর একটি শোশাক। ইনি মসিয়োঁ ভিন্সেনজো শেরুগিয়া। বহুদিন ল্যুভারে কাজ করেছেন—গোবিয়ার কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে—ল্যুভারের প্রায় প্রতিটি প্রত্যন্ত বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। আজ অবশ্য এসেছেন নিতান্ত দর্শনার্থী হিসাবে।

প্যাডেলিয়ঁ সালী দিয়ে প্রায় একই সময়ে প্রবেশ করলেন আর দুজন দর্শনার্থী। দু'ভাই—ল্যামিলোভি ভ্রাতৃদ্বয়—ভিলেঞ্জো আর মিকেল। এঁরা দুজনেই ফরাসী। মার্কুইস কর্তৃক নিয়োজিত। 'সালে লা কেজ' প্রদর্শনীশালার উত্তম (Watteau) এবং ব্যুশের-এর চিত্রসম্ভার দেখতে দেখতে তাঁরা এগিয়ে চলেন সালোঁ কেয়ারের দিকে।

বেলা চারটে নাগাদ ঐ দুই ভাইয়ের সঙ্গে শেরুগিয়ার সাক্ষাৎ হল সালে দূশাতেল গ্যালারির কাছাকাছি। ওঁরা যে পরস্পরকে চেনেন, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ল্যুভারে এসেছেন এমন কথা আর আভাসমাত্র পাওয়া গেল না। শেরুগিয়া তার হাতঘড়িটা দেখল—ল্যুভার বন্ধ হতে ঠিক একঘণ্টা বাকি। মনে মনে সে আর একবার আঙড়ে নিল সিনর রিচার্ডসনের নির্দেশ। মার্কুইস ওয়াল-ফিয়েনোকে সে ঐ নামেই চেনে। ওয়ালফিয়েনোর নাম সে জীবনে কখনো শোনেনি; তাঁর পকেটে যে আলবার্তো গঞ্জালেস্-এর নামাঙ্কিত পাসপোর্ট আছে সে-কথা তো স্বপ্নেও আশা করতে পারে না! সিনরকে সে বিশ্বাস করেছে। কথা আছে, কাজ হাসিল হলে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হাতে-হাতে পাবে। ছোট মাপের নোট—এক সুটকেস বোঝাই!

বারটা বুদ্ধি করেই ধরা হয়েছিল রবিবার। যেহেতু পরদিন, সোমবার, ল্যুভার দর্শনার্থীদের কাছে রুদ্ধদ্বার। সেটা ঝাড়া-শোঁছার দিন। অর্থাৎ মঙ্গলবারের আগে অশকর্মটা জানাজানি হবে না!

শেরুগিয়া সালৈঁ দুশাতেল-এ এসে দাঁড়ালে। এই হল-কামরার দু-প্রান্তে দুটি আঁচওয়ে বা তোরণ। একটি দিয়ে যেতে পার প্যাশালার ফ্যার-এ। সেখানে পাশাপাশি দোকান—ছবির নকল, ফটোগ্রাফ এচিং, বই এবং নানান শিল্পসামগ্রী সেখানে বিক্রি হয়। দ্বিতীয় সিংহদ্বার দিয়ে যেতে পার গোটা ল্যুভার সংগ্রহশালার ‘গর্ভগৃহে’ অর্থাৎ সালোঁ কেমারে—যেখানে থরে-থরে সাজানো আছে শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্ভার! যার মধ্যমণি : লা জ্যাকোন্ডা।

অর্থাৎ মোনালিসা।

শেরুগিয়া ধীর পদে এগিয়ে গেল ‘সালোঁ দুশাতেল হল’-এর পশ্চিমপ্রান্তে। নজর পড়ল প্রকাণ্ড বড় সেগুনকাঠের দরজার পাশে ও-দিকের ছোট দরজাটার দিকে।

না সে দরজাটা আজ খোলা নেই। গা-তালা লাগানো।

শেরুগিয়া জানে, ঐ ছোট দরজাটা একটা গুদামঘরের—স্টোররুম। ভিতরে আছে ঝাঁটা, মই, ঝাড়ন, বালতি ইত্যাদি। ঐ ঘরের গা-তালার একটি চাবি এক সময়ে ছিল তার হেপাজতে। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর বাড়তি কাচ, রঙ-তুলি, যন্ত্রপাতি সে ওখানে জমা রেখে যেত। পরদিন নিজেই এসে বার করত সব কিছু। একটি চাবি বৎসরখানেক ছিল ওর হেপাজতে। সিনরের সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখনো ছিল। তারপর সে চাবিটা কর্তৃপক্ষকে জমা দিয়েছে মাস-তিনেক আগে; কিন্তু তার পূর্বে সিনর একটি ডুপ্লিকেট বানিয়ে নিয়েছেন। সেই ডুপ্লিকেট চাবিটা বর্তমানে ওর ডানদিকের পকেটে।

ঐ গুদামঘরে শুধু ঝাড়পোঁছ-কর্মীদের যন্ত্রপাতিই থাকে না, থাকে নিত্যশিল্পীদের রঙ-তুলি ক্যানভাসও। অর্থাৎ যারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ল্যুভারে ছবি আঁকে—যেমন আঁকে শার্লি অথবা বেনো। প্রতিদিন যাতে সেই শিল্পীদের রঙ-তুলি-ক্যানভাস বহন করতে না হয় তাই এ ব্যবস্থা। দিনান্তে ‘সালে দুশাতেল হল’-এর প্রহরী এসে ঐ গুদামঘরের তালা খুলে দেয়, শিল্পীরা যে যার রঙ-তুলি-ক্যানভাস জমা রাখে। খালি হাতে বাড়ি ফেরে। আবার পরদিন সকালে এসে উপস্থিত হলে কোনও প্রহরী দরজাটা খুলে দেয়; শিল্পীরা যে যার সাজ-সরঞ্জাম বার করে নেয়। এ ব্যবস্থা সপ্তাহে পাঁচ দিন। সোমবার, ঝাড়া-মোছার দিনে প্রদর্শনী বন্ধ থাকে। শিল্পীরা সেদিন আঁকার সুযোগ পায় না। এছাড়া রবিবারেও ঐ নিত্য-শিল্পীদের ছুটি—কারণ সেদিন এত ভীড় হয় যে, শিল্পীদের পক্ষে বসে আঁকার সুযোগ-সুবিধা থাকে না। এসব তথ্যটি শেরুগিয়ার ভালরকম জানা।

তার নিগলিতার্থ : যে কোন শনিবারের বিকাল পাঁচটা থেকে সোমবার সকালের মধ্যে ঐ ঘরটার দরজা খোলা হয় না। সোমবার সকালে খোলা হয় ঝাড়-পোঁছের সরঞ্জাম বার করে নিতে।

বিকেল চারটে বেজে পঁয়ত্রিশে ঘণ্টাধ্বনি হল। অর্থাৎ আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ল্যুভার বন্ধ হয়ে যাবে।

সালে দুশাতেল হল-এর প্রহরীদল সমস্বরে কলধ্বনি করে ওঠে : On ferme !

পাশাপাশি অন্যান্য গ্যালারির প্রহরীকূঠেও সমবেত শিবাধ্বনির মত প্রতিধ্বনিত হল On ferme ! অর্থাৎ ল্যুভার এবার বন্ধ হবে—যে যার পথ দেখুন !

প্রতিদিনের অতি পরিচিত দৃশ্য। রক্ষকদল দর্শকদের সবিনয়ে খেদিয়ে নিয়ে চলছে নির্গমন দ্বারগুলির দিকে। শেরুগিয়াও ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলে। তারপর সুযোগ মত স্টুট করে সরে দাঁড়ায় দরজাটার আড়ালে। প্রহরী পিছন ফিরতেই চট করে পকেট থেকে চাবিটা বার করে খুলে ফেলে স্টোর-রুমের

দরজাটা। প্রহরীটা ওকে দেখতে পায়নি; শৈলেও সে বিস্মিত হত না—কারণ সে পেরুগিয়ার মুখ চেনে। জানে যে, ঐ রঙ মিস্ত্রিটার কাছে গুদাম ঘরের একটি চাবি থাকে। সে যে চাবিটা ফেরত দিয়েছে সেটা প্রহরীর জানা থাকার কথা নয়। তা সে যাই হোক, প্রহরী এটা নজর করেনি। দরজাটা খুলেছে কি খোলেনি কোথা থেকে লালিলোভি দু-ভাই সুরুস করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। এবং তৎক্ষণাৎ পেরুগিয়াও। ভেতর থেকে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এটুকু ঘটনা ঘটেতে সময় লাগল আন্দাজ পনের সেকেন্ড।

ভিতরটা নীরস্ত্র অন্ধকার নয়। ওপরের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে দিবাবসানের শেষ আলোকরশ্মি এখনো আসছে। হয়তো ঘণ্টাখানেক পরে নীরস্ত্র তমিস্রায় ঢেকে যাবে এই গুদাম ঘরটি। তার আগেই দেশে নিতে হবে কোথায় কী আছে। যাতে অন্ধকারে ধাক্কা লেগে শব্দ না হয়। চারিদিকে ঈজেল, রঙের বাস্ত, বালতি, ঝাড়ু, বাঁটা, ঝাড়ন।

তিনজনে নিঃশব্দে দেওয়ালে ঠেঁষ দিয়ে বসল। এভাবেই সারাটা রাত ওদের বসে থাকতে হবে। বাইরে মানুষের পদধ্বনি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলা তারপর ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ। পেরুগিয়া তার হাত-ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজে তিন! অর্থাৎ লুভারের মেন গেট-এ তিন মিনিট আগে তালা পড়েছে! এখন এ প্রাসাদ সম্পূর্ণ নির্জন!

পেরুগিয়া হাসল। হাসি সংক্রামক—ওর দুই সহকর্মীও হাসল তা দেখে।

কোথা দিয়ে সারাটা রাত কেটে গেছে! ওরা তিনজনে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পালা করে রাতটা জেগে কাটালো। পেরুগিয়ার ধূমপানের নেশা আছে। কিন্তু সিনরের বারণ। একা থাকলে সে মানত না; কিন্তু এই দুজন যদি বলে দেয়, তাহলে সিনর হয়তো রাগ করবেন। আর রাগ করে যদি তিনি ওর প্রাপ্য থেকে কিছু বাদ দিয়ে দেন...নাঃ! নেশাটা চেষ্টে রাখল পেরুগিয়া। সারা রাতে ওরা নিম্নস্বরে কথাবার্তাও বিশেষ বলেনি।

পেরুগিয়া ঘুমিয়ে ছিল শেষ রাতে। তাকে ঠেলে তুলল মিকেল।

ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আলোর ছোঁয়া। এবার বিপরীত দেওয়ালটিতে একটা গোলাকার আলোক চিহ্ন। পশ্চিমের দেওয়ালে। ঘড়িটা দেখল পেরুগিয়া। সকাল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

তিনজনে উঠে দাঁড়ায়। ওভারকোটের ভিতরে চেষ্টে ধরা টিউনিক বার করে। সাদা অ্যাপ্রন-জাতীয় একটা পোশাক—বুকে লুভার সংগ্রহশালার ‘লোগো’। এটাই ওদের পাসপোর্ট। সোমবারে লুভারের ভিতরে নিরাপদ বিচরণের। ঝাড়াই-পোঁছাই কর্মীর ছদ্মবেশে। জর্জেস্ পিকো হচ্ছে ঝাড়াইদলের কুলি-সদার। প্রতি সোমবারে তার অধীনে না-হোক শতখানেক কর্মী সাফাই কাজে নিয়োজিত হয়। তার মধ্যে দশ-পনের জন ডেলি-লেবার। সকলের সনাক্তিকরণ চিহ্ন ঐ বিশেষ অ্যাপ্রন। যা দর্জি দিয়ে বানিয়ে ওদের হাতে আগেই ধরিয়ে দিয়েছেন সিনর।

অ্যাপ্রন চড়িয়ে পেরুগিয়া সাবধানে গা-তালটা ভিতর থেকে খুলে দরজাটা এক আঙুল-মতো ফাঁক করে দেখে। নাঃ! ‘সালে দুশাতেল হল’ নিস্তব্ধ, নির্জন।

তিনজনে বেরিয়ে আসে প্রদর্শনী কক্ষ। এখনো ঘণ্টাখানেক সময় হাতে আছে। জর্জেস্ পিকোর কর্মীদল প্রধান ফটকের সামনে হাজিরা দেয় সকাল সাড়ে ছ’টায়। হাজিরা খাতায় সই দিয়ে তারা প্রস্তুত হয়। প্রধান ফটকও খোলে ঐ সাড়ে ছ’টাতেই। সাফাই-ওলারা সার দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

সাবধানের মার নেই। প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকেই একজন টেনে নিল একটা লম্বা ঝাড়ু, অপরজন

একটা ঝাড়ন। দুজনে দু-প্রান্তে পাহারায় দাঁড়ালো। শেরুগিয়া পকেট থেকে স্কু-ডাইভার, প্লাস, রেঞ্চ ইত্যাদি বার করতে করতে এগিয়ে গেল ‘সালোঁ কেয়ারে হল’-এর দিকে।

মিনিট কুড়ি লাগল ছবিটা খুলে বার করতে। শেরুগিয়া মনে মনে হাসল। সিনর সেদিন বিশ্বাস করতে চাননি আখব্বটার ভিতর সে দেওয়াল থেকে মোনালিসাকে উপড়ে নিতে পারবে—ঠিক যেভাবে একদিন নেশোলিয়ঁ বোনাপার্তি ইতালীয় কোন সংগ্রহশালা থেকে উপড়ে নিয়েছিল এ ইতালিয়ান সুন্দরীর ছবিখানা—মোনালিজা, লা জ্যাকোন্ডা।

মনে মনে শেরুগিয়া বললে, হে ইতালীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী! —না:। হে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী—লেঅনার্দো! তোমার প্রতি যে অসম্মান করেছিল সেই ফরাসী বোম্বেটে—তোমার মানসীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল ভিক্ষা থেকে পারীতে—আজ আমি তার প্রতিশোধ নিলাম! তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক!

মিকেল পিছন থেকে ধমক দেয়, কী বিড়বিড় করছ হে তুমি? ফ্রেমটা তো খোলা হয়ে গেছে! নেমে এস টুল থেকে।

শেরুগিয়া নেমে পড়ে। মিকেল টুলটাকে ঘরের ওপ্রান্তে সরিয়ে দেয়।

ওলা তিনজনে গ্রান্ড-গ্যালারি অতিক্রম করে এসে পৌঁছায় একটা সিঁড়ির মুখে। এটি দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয়, সাফাই-ওয়ালাদের জন্য। সেখানে পৌঁছে এক অঙ্ককার কোণায় শেরুগিয়া সাবধানে ছবির কাচটা ভেঙে ফেলল। ফ্রেম থেকে বার করে নিল মোনালিসার ছবিখানা। মিকেল আর ভিক্স্ এ ফ্রেম আর কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল সিঁড়ির অঙ্ককার গহ্বরে। বেসমেণ্টে কোথায় গিয়ে সেটা ভূম্পর্শ করল তা দেখা গেল না।

তিনজনে চলতে শুরু করতেই মিকেল ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো।

মনুষ্য কণ্ঠস্বর! কারা যেন এদিকেই আসছে।

শেরুগিয়া দ্রুতগতিতে পশ্লার কাঠের টুকরোটা—যার একদিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ছবিখানি আঁকা—চুকিয়ে দিল ওভারকোটের নিচে।

সিঁড়ির নিচে একটি সার্ভিস-ডোর; অর্থাৎ কর্মীদের ব্যবহারের জন্য। এটা সচরাচর ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। এই দরজাটা খুলে ফেলতে পারলেই ওর বাগানে বেরিয়ে পড়বে।

শেরুগিয়া সবিস্ময়ে দেখল—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা নয়। তার অজ্ঞাতে কখন এ দরজায় একটি গা-তালা লাগানো হয়েছে! ডোর-নবটা ঘুরিয়ে দেখল সেটা তালা বন্ধ!

এটা শেরুগিয়ার ভ্রান্তি! তারই দোষ। সে নিজেই সিনরকে বলেছিল—এ দরজাটা সব সময় ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। ঠিকই বলেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে যে এই গা-তালাটা লাগানো হয়েছে তা ও জানত না। দোষ ওরই—কারণ গতকাল এসে এটা দেখে যাওয়া উচিত ছিল।

মিকেল বলল, কী হল? সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দরজা খোল?

—খুলছে না! ওটা তালা বন্ধ!

—মানে? ওর চাবি নেই তোমার কাছে?

—না! নেই!

—সে কী! তাহলে...মানে...

এ কী হুঁদর-কলে বন্দী হয়ে পড়ল ওরা! শেরুগিয়ার ওভারকোটের ভিতর লা জ্যাকোন্ডা—কর্মীদের পদশব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে—অথচ সামনে রুদ্ধদ্বার।

— কী করতে চাও এখন ? —মিকেলের আর্ত প্রশ্ন।

— তোমরা দু-দিকে পাহারা দাও। আমি লক্টা খুলে ফেলছি।

ওর পকেট থেকে জু-ডাইভার বার করে ইস্ক্রপগুলো খুলতে থাকে। কিন্তু বাঁ-বগলে যে ধরা আছে লিজা জ্যাকোভার সেই ছবিখানা। বাঁ-হাতটা তাই পুরো কার্যকরী নয়। এ অবস্থায় ছবিখানা বার করতেও সাহস হচ্ছে না। তিনটে জু খুলে গেল, চতুর্থটা কিছুতেই ঘুরল না। বাধ্য হয়ে মোনালিসাকে ওর ঘামের গন্ধ থেকে মুক্তি দিয়ে সে ডোর নব্টা ধরে প্রচণ্ড জোরে পাক মারল। যা: ! উপড়ে ভেঙে বেরিয়ে এল পেতলের ডোর-নব্টা।

দরজা কিছু খুলল না।

সিঁড়ির ও-প্রান্ত থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই মিকেল সাবধানবাণী শোনালো : Attenti!

অর্থাৎ কেউ এদিকেই আসছে। পেরুগিয়া দ্রুতহস্তে তার যন্ত্রপাতি মায় ডোর নব্টা ভরে ফেলল ওভারকোটের পকেটে। তুলে নিল ছবি-আঁকা পপ্লারের টুকরোটা। ঢুকিয়ে দিল ওভারকোটের ফোकरে। ঠিক তখনই শিস দিতে দিতে এগিয়ে এল একজন!

লোকটা মুখচেনা। নাম জানা নেই যদিও। ল্যুভারের একজন রেগুলার স্টাফ। প্রাস্থার।

চোখাচোখি হতেই সে বললে, হ্যালো!

দারুণ বুদ্ধি জোগালো পেরুগিয়ার মাথায়। সে একটা খিস্তি ঝাড়ল, এই সেদিন গা-তালটা লাগালুম আর কোন্ সুস্থুন্ধির-পো ডোর নব্টা চুরি করেছে! এখন বাইরে যাব কেমন করে? চাবির ফুটো দিয়ে গলে?

লোকটা বললে, সাত-সকালেই খিস্তি-খেউড় কেন করছ ভায়া? এস, আমি খুলে দিচ্ছি।

আমার কাছে ওর চাবি আছে।

এতক্ষণে পেরুগিয়ার মনে পড়েছে প্রাস্থার মিস্ত্রিটার নাম : সতে!

একগাল হেসে বললে, থ্যাঙ্ক সতে!

— উল্লেখ নিম্নয়োজন ! শিস দিতে দিতে লোকটা অন্যদিকে চলে গেল।

ওরা তিনজনে বার হয়ে এল বাগানে।

এই ছোট্ট ভিতরের উঠানটির পোশাকি নাম : Cour du Sphinx.

পরিকল্পনা মতো উঠানটা পার হয়ে ওরা চল এল পরবর্তী প্রাঙ্গণে: কোর ভিকস্তি। এর দক্ষিণে একটা প্রকাশ আর্চ। আর তার ওপাশে মুক্ত পৃথিবী।

কিন্তু এখানেও এক বিপদ। দরজায় একজন দ্বারপাল। তার চোখের সামনে দিয়ে পার হওয়া যাবে না। সে ভাববে হাজিরির খাতায় নাম সই করে অ্যাপ্রন-পরা কোন কর্মী কেটে পড়ছে। মোনালিসা চুরির অপরাধে নয়, কাছে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে ওদের চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে।

কিন্তু রাখে কেঁট মারে কে ! ভিতর দিক থেকে কে যেন দ্বাররক্ষককে নাম ধরে ডাকল। ‘যাই স্যার’ বলে সাড়া দিয়ে লোকটা সেদিকে এগিয়ে গেল। মাত্র পাঁচ-সেকেন্ড! সেটুকুই যথেষ্ট। ওরা তিনজনেই বার হয়ে এল কোয়ে দু ল্যুভার সড়কে।

তখন সকাল আটটা। বাইরে ঝলমলে রৌদ্র। মানুষজনের আনাগোনা। ওরা সরে এল একটা গাছের আড়ালে। ঝটপট একে একে খুলে ফেলল অ্যাপ্রনগুলো। পুঁটলি পাকিয়ে ভরে নিল ওভারকোটের পকেটেই।

পেরুগিয়া সেটা পকেটে ঢোকাতে গিয়ে অনুভব করল শেতলের ডোর-নবের মুন্ডিটা। এখন সে খুশিয়াল। মুক্ত পৃথিবীর খোলা হাওয়ায়।

এখন ওরা পারী-শহরের অগণিত মানুষের যে কোনো তিনজন। পেরুগিয়া রাস্তার পাশের বেড়া টপকিয়ে শেতলের ডোর-নবটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা পুকুরে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার ও-প্রান্ত দিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী যাচ্ছিল। ব্যাপারটা তার নজরে পড়ল। পড়ত না, কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সূর্যালোকে শেতলের নবটা চক্‌চক করে উঠেছিল যখন সেটা অধিবৃন্তের পথে শূন্যমার্গে চলেছিল পুকুরের জলের দিকে। খণ্ড-মুহূর্তের জন্য সাইকেল-আরোহীর মনে হয়েছিল : জিনিসটা কী? অমন চক্‌চকে?

পরমুহূর্তেই পুকুরের জলে একটা শব্দ হল: টপ!

ছোট-ছোট বৃত্তাকার ঢেউ তুলে জলরাশি শান্ত হল।

সাইকেল-আরোহীও ভুলে গেল তার কথা। ত্রিশ-মিটার হাঁটতেই রু-দে-তুলিয়াস-এর মোড়। এখন অবশ্য সড়কটার নাম আভিন্যু-দে-জেনেরাল লেমনিয়। সেখানেই অপেক্ষা করছিল কালো রঙের ফোর্ড গাড়িটা। সিনরের প্রতিশ্রুতিমতো। ড্রাইভার জানতে চাইল, কোথায় যাবেন আপনারা?

ভিলেল্লো লালিলোত্তি একটা বস্তির নাম বলল। ঐ বস্তির নামটাই ‘কোড-মেসেজ’।

লোকটা নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল। ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি মুহূর্তমধ্যে স্টার্ট দিল। ওরা তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। পেরুগিয়া আবার তার ঘড়িটা দেখে। তার বসতে অসুবিধা হচ্ছিল ওভারকোটের ভিতর সাতান্তর বাই তিপাল সে.মি. মাপের একখানা পপ্লারের টুকরোর জন্যে। কিন্তু ছবিখানা বার করতে পারল না। সিনরের নির্দেশ তা নয়। কে জানে হয়তো ঐ মটোরগাড়ির চালক আদৌ জানে না যে, ওরা তিনজনে কয়েক শ’ কোটি ডলারের সম্পদ নিয়ে চলেছে।

অনেক বাঁক ঘুরে গাড়িটা এসে দাঁড়ালো পারীপ্রান্তের একটি বস্তির দ্বিতলবাড়ির সম্মুখে। ওরা নেমে যেতেই গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেল। পেরুগিয়া বললে, ও ভাড়া নিল না তো?

লালিলোত্তি বললে, ও আমাদের দলের। ভাড়া মেটানো আছে। এস, ওপরে এসো।

দ্বিতলে—না দ্বিতলে নয়, গ্যারেট-অংশের একটি ছোট্ট খুপরিতে এসে উঠল ওরা। এ ঘরখানা মাদাম সিগুয়েনোর। ফ্রাঁসোয়া সিগুয়েনো হচ্ছে ভিলেল্লো লালিলোত্তির রক্ষিতা! দিনে সে ধোপানি, রাত্রে লালিলোত্তির শয্যাসজ্জিনী। মহিলাটির বয়স বছর ত্রিশ। ব্যাপারটা মেয়েটি জানে বোঝা গেল। একখানা খবরের কাগজে কাঠের প্যানেলটা জড়িয়ে নিয়ে সে আলমারির ভিতরে তুলে রাখল। বললে, এখন তোমরা যে যার কাজে যেতে পার। পুলিশের বাবারও সাধ্য হবে না এই গ্যারেট ঘরটা খুঁজে বার করার!

পেরুগিয়া ছুটে বেরিয়ে এল নিচে। একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠল।

গোবিয়ার কোম্পানির দিন-মজুর সে। রু দ্যে ম’বেগ-এ সকাল সাতটায় তার হজিরা দেওয়ার কথা। সেখানে সে গিয়ে পৌঁছালো বেলা ন’টায়।

হজিরার খাতায় সেই দেবার সময় ওর বস বললে, আজ আবার কী হল? এত লেট?

পেরুগিয়া সলজ্জে স্বীকার করল, গতকাল রাত্রে অত্যধিক মদ্যপান করায় সে সকালে ঠিক সময়ে উঠতে পারেনি।

সদ্যের কোনো সন্দেহ হল না—কারণ আজ সোমবার। প্রতি সোমবারেই দু-চারজন হাজরি দিতে দেবী করে ফেলে। রোববারের খোঁয়াড়ি ভাঙতে তাদের দেবী হয়ে যায় প্রতি সপ্তাহেই। কাজে ছুটি হতেই পেরুগিয়া ছুটল সেই গ্যারেট-ঘরের উদ্দেশ্যে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল মাদামের সেই ঘিষ্টি ঘরে ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন ওঁরা তিনজন—লামিলোভি ভ্রাতৃদ্বয় আর স্বয়ং সিনর।

সিনরকে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল পেরুগিয়া। বিশ্বয়ের হেতুটা ওঁর সাজ-পোশাকের জন্য। তাঁর পরিধানে গ্রীজ আর কালিঝুলি মাখা একটা ওভার-অল, পিঠে একটা রুক্স্যাক, সঙ্গে একটা সুটকেস। কে বলবে উনি ডক্টর রিচার্ডসন—রাজস্থানের এক সংগ্রহশালার কিউরেটর। এই বস্তুতে যে জ্বাতির মেহনতি-মানুষদের হামেহাল দেখা যায় যেন তাদেরই একজন।

সিনরের নির্দেশে মেয়েটা আলমারি থেকে কাগজে-মোড়া কাঠের প্যানেলটা বার করে দিল। ভাঁজ খুলতেই মোনালিসা ফিক্ করে হেসে ফেলল! না, ঠিক ফিক্ করে নয়, তার ঠোঁট দুটি হাসছে না, হাসছে চোখের তারা। কী কারণে ওর চোখের তারায় মোহাবিষ্ট হাসির আলিম্পন তা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝে উঠতে পারেনি; তবে আজ মনে হচ্ছিল সেটা যেন চুরি করে আচার খাবার দুষ্টমিতে। যেন বলছে—বন্দিশালা থেকে কী করে পালিয়ে এসেছি দেখছ?

সিনরের চোখ দুটোও চক্‌চক্ করে উঠল। মোনালিসার হাসি প্রতিবিশ্ব ফেলল ওঁর নীলচোখের মণিতে। কাগজে জড়িয়ে ছবিখানি তিনি ফেরত দিলেন মাদামকে। সে সযত্নে ছবিখানা তুলে রাখল আলমারিতে—তার ব্লাউস-কর্সেট-গাউনের ফাঁক-ফোকরে।

এবার সিনর সুটকেসটা খুলে ফেললেন। তাতে কিছু শার্ট-প্যান্ট-টাই। সেগুলি অপসারণের পরে দেখা গেল বাকি আয়তনটা পূর্ণ হয়েছে তাড়া-বাঁধা নোটের বাড়িলে। গুণে গুণে তিনটি থাক নিলেন উনি। দুই ভাই ও মাদামকে নোটের বাড়িলগুলি হস্তান্তরিত করলেন। পেরুগিয়া সতৃষ্ণনয়নে শুধু তাকিয়েই রইল। তার দিকে এগিয়ে এল না কোনো নোটের তাড়া। ওদের তিনজনকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বললেন, সবই লোয়ার ডিনোমিনেশনের কারেন্সি নোট। তবু সাবধানে খরচ কর। রাতারাতি রাজা-উজির বনতে চাইলে পাঁচজনের সন্দেহ জাগবে।

উঠে পড়লেন এবার। পেরুগিয়াকে বললেন, এস আমার সঙ্গে।

একখানি হ্যাকনি-ক্যারেজ ভাড়া করে শহরের উত্তরদিকে চললেন। পেরুগিয়ার আস্তানার আধ কিলোমিটার দূরে গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। যদিও পেরুগিয়ার ডেরা পর্যন্ত সে আমলে ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারত, তবু উনি সে সুযোগ নিলেন না। কী দরকার একটা সূত্র রেখে যাওয়ার? সওয়ারি কোথা থেকে এল কোথায় গেল তা গাড়োয়ানটাকে জানানোর কী প্রয়োজন?

পেরুগিয়া বস্তির একখানা গোটা-কামরা নিয়ে থাকে। কাঠের বাড়ি, টালির ছাদ, পাশাপাশি এক-কামরার খুশুরি। মেহনতি মজদুরদের। দ্বার অর্গলবদ্ধ করে সিনর প্রথমেই তক্তনীটা নিজের ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করলেন—অর্থাৎ কথাবার্তা নিষ্প্রস্বরে বলতে হবে। পাশের কামরার লোকটা আড়ি পাতলেও যেন কিছু শুনতে না পায়। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, তোমার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে। মন দিয়ে শোন :

সিনর ওকে বুঝিয়ে বললেন—অচিরেই পুলিশ পেরুগিয়ার খোঁজ করবে। এটা অবধারিত। কারণ সে দীর্ঘদিন লুণ্ঠারে কাজ করেছে। তবে সেটা হবে ‘রুটিন-চেক’। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

পেরুগিয়া যেন পুলিশের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে। হয়ত পুলিশে ওর ঘর তল্লাসী করবে—কিছুই পাবে না। যতদিন না সেটা হচ্ছে ততদিন সে যেন লাঙ্গিলোত্তি ভ্রাতৃত্ব অথবা মাদামের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করে। তার জীবনযাত্রায় যেন কোনও পরিবর্তন না হয়। গোবিয়ার কোম্পানির রঙ-মিক্সির কাজটা চালিয়ে যায়। পুলিশের তল্লাসী হয়ে যাবার পর সে যেন মাদামের কাছে যায়; ছবিখানা নিয়ে আসে। মাদামকে নির্দেশ দেওয়াই আছে। সে চাইলেই ছবিখানা তাকে দিয়ে দেবে। তারপর পেরুগিয়া তার এই বস্তির ঘরে ছবিটা খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখবে। খুব সাবধান, ইঁদুরে না কাটে।

পেরুগিয়া ঝুঁকে নিশ্চিন্ত করে, না এখানে ইঁদুরের উপদ্রব নেই। উইশোকাও নেই। আমি ফ্লু-ডাইভার দিয়ে দেওয়ালের একটা কাঠের প্যানেল খুলে লুকিয়ে রাখব।

— আর শোন। আমি কাল-পশুর মধ্যেই লন্ডনে চলে যাব। মাসখানেক থাকব। তারপর ফিরে এসে ছবিখানা তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব। নাও ধর—
একটা নোটের ছোট্ট বাউন্ড উনি বাড়িয়ে ধরেন পেরুগিয়ার দিকে।

পেরুগিয়া বললে, কত আছে ওতে ?

— পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

— মাত্র পাঁচ ?

সিনর হাসলেন। মোনালিসা-হাসি ! বললেন, বোকার মত কথা বল না ভিল্ ! পুলিশে তোমার বাড়ি তল্লাসী করবে। তখন কী কৈফিয়ৎ দেবে তুমি ? এ ক’বছরে ওর চেয়ে বেশি তোমার সঞ্চয় হতে পারে ?

কথাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু...

—অবিশ্বাস করছ আমাকে ? কিন্তু ছবিখানা তো পারীতেই রইল। আমি ফিরে না এসে যাব কোথায় ? তাছাড়া আমার লন্ডনের ঠিকানাও তুমি জান...

— না, সিনর। সে-কথা নয়, কিন্তু আপাতত মাত্র পাঁচ হাজার ?

— হ্যাঁ ! ব্যাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার আমি ফিরে এলে। সেকেন্ড-হ্যান্ড ফোর্ড নয়, তুমি ইচ্ছে করলে নতুন ‘ডিম্‌লারে’ চেষ্টাও লম্বার্ডিতে ফিরে যেতে পার।

— আর সেই ‘লাফিং বুডা’ ছবিখানা ? আমরা ভারতবর্ষে যাব না ?

মার্কুইস্-এর ইচ্ছে করছিল ‘লাফিং বুডা’র মতো অট্টহাস্য করে উঠতে। তার পরিবর্তে বললেন, সেটা তো স্থির হয়েই আছে। তার আগে এখানকার গতি করি।

এবার সুটকেস খুলে তিনি ধোপ-দুরন্ত শোশাক-পরিচ্ছদ বার করলেন। তাল্লিমারা তেলটিতে ওভার-অলটা পাল্টে রঙনা হয়ে গেলেন তাঁর খানদানি পাঁচ-তারা হোটেলের দিকে।

পথে পোস্ট-অফিস। সেখানে দাঁড়িয়ে খানতিনেক টেলিগ্রাফ করলেন— নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, লস্ অ্যাঞ্জেলেস্।

পরের সাতটা দিন পারীর মানুষ বোধকরি আর কিছুই আলোচনা করেনি।

শুধু মোনালিসা, আর মোনালিসা ! সংবাদপত্রের বৃকোদরভাগ দখল করল চারশ বছর আগেকার সেই জ্যাকোভা কুলবধ্। এ যে অবিশ্বাস্য ! প্রকাশ্য দিবালোকে ল্যাভারের কঠোর প্রহরা নস্যাত্ন করে কীভাবে ‘বুলেট-প্রুফ’ কাচের আবরণ ভেঙে অন্তঃপুরচারিণীকে অপসারিত করল ওরা ?

আর কেনই বা তা করল ? মোনালিসা তো কেনা-বেচা করা যাবে না। কেউ তার বৈঠকখানায় মূল ছবিটা টাঙিয়ে রাখতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আইনে তখনই তার হাতে হাতকড়া পড়বে। আর বাস্তবে বন্ধ করে রাখার জন্য কেউ নিশ্চয়ই কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঐ ছবিখানা কিনবে না। তাহলে ? চোরের উদ্দেশ্য কী ? পাকা-পাকা মাথার সাংবাদিকেরা নানান থিওরি শোনালেন। কেউ বললেন, এ শুধু প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বেইজ্ঞত করার একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। কারও মতে, কোনও ‘মেগালোম্যানিয়াক্’ অপরাধ-জগতের সম্রাট এভাবে বিশ্বকুখ্যাত হতে চাইছে। পারীর সবচেয়ে বিখ্যাত সংবাদপত্র ‘ফিগারো’ সম্পাদকীয়তে বললেন, “সরকারী গোয়েন্দা-বিভাগের তৎপরতায় আমাদের আশঙ্কা হয়, অচিরেই হয়তো আমাদের ছাপতে হবে—প্রকাশ্য দিবালোকে কে-বা-কাহারা নত্নদাম-গীজার চূড়াটা অপহরণ করে নিয়ে গেছে, এবং পুলিশ অপরাধী বা চোরাই মালটা খুঁজে পাচ্ছে না”।

তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়তো জনৈক সরকারী মুখপাত্র বিবৃতি দিলেন, “এমন আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে, কোন বহল-প্রচারিত সংবাদপত্রের তরফে এই কুকাঙ্গটা করা হয়েছে একটা শ্রীহৃদয়স্পর্শক সংবাদ পরিবেশন করে কাগজের কাঁচিতি বৃদ্ধি করতে। সে-ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকার মুনাফা-শিকার শেষ হলেই কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মারফৎ ছবিখানা সরকার ফেরৎ পাবেন!” সে আমলে—বলা যায় আজকেও যেমন—ভাগ্য গণনাকারীদের ছিল ফলাও ব্যবসা! সম্মোহনের মাধ্যমে সত্য-উদঘাটন, ক্রিস্টাল-বলে সত্য-নিরূপণ, ফলিত-জ্যোতিষের সাহায্যে তত্ত্ব-অন্বেষণ! একটি পত্রিকা ঘোষণা করলেন—অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যদি কোনও যোগী মোনালিসা-অপহরণকারীর পাত্তা বাংলাতে পারেন তাহলে তাঁকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হবে। তার ফলে অনেক-অনেক ভেল্কি পণ্ডিত মাথার ঘাম পায়ে ফেললেন। কাজের কাজ কিছু হল না।

গোয়েন্দা বিভাগ কিছু বসে নেই।

পরদিনই ল্যুভার তল্লাসী করতে গিয়ে তারা উদ্ধার করল সিঁড়ির তলা থেকে একটা ভাঙা ফ্রেম আর কাচের টুকরো। কিউবেরটার নিঃসন্দেহ—সেগুলি ঐ অপহৃত চিত্রটির আবরণ ছিল। ল্যুভারের প্রতিটি কর্মীর জবানবন্দী নেওয়া হল। ঐ সময় একজন দোকানদার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে পুলিশের কাছে একটা জবানবন্দী দিয়ে গেল। সে নাকি ঐ সোমবার সকাল আটটা নাগাদ সাইকেলে করে ‘কোয়ে দু ল্যুভার’ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখতে পায় একজন পথচারী কী-একটা চক্চকে জিনিষ পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেল দিল। নিমজ্জমান মানুষ যেভাবে খড়-কুটো আঁকড়ে ধরতে যায় সেভাবেই পুলিশ জাল ফেলল ঐ পুকুরে, ডুবুরি নামালো জলে। অচিরেই উদ্ধার করা গেল একটি ডোর-নব্। আশ্চর্য !

সিঁড়ির নিচে একটি ডোর-নব্ ভাঙা !

পুলিস একটা সূত্র শেল !

সাইকেল-আরোহীর জবানবন্দী অনুসারে পুলিশ বিজ্ঞপ্তি দিল : “সোমবার বাইশে আগস্ট ল্যুভারের কাছাকাছি নিম্ন বর্ণনা অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে কেউ যদি দেখে থাকেন তবে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—উচ্চতা মাঝারি, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, চোখে চশমা নেই, একহারা চেহারা, দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় কালো টুপি, পরনে কালচে কোট-প্যান্ট, হাতে একটা চৌকো কিছু—যা মোনালিসা ছবির আকারে।”

ঐ বর্ণনার সঙ্গে শেরগিয়ার সাদৃশ্য অল্পই। তার বয়স অনেক কম। তার হাতে চৌকো কোন কিছু ছিল না। আর ঐ বর্ণনা অনুসারে পারীতে তখন অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ বাস করে। তাই ঐ বিজ্ঞপ্তির ফলে বিশেষ কিছুই হল না। হল সামান্য ফল—শেরগিয়া গোঁফ কামানো ছেড়ে দিল আর বিনা পাওয়ারের একটা চশমা কিনে নাকে চড়ালো!

গোয়েন্দা বিভাগের সবচেয়ে যেটা অসুবিধে, তা হচ্ছে বিভাগীয় রেশারেশি। পারী-শহরের দুনীতিদমনের দায়িত্ব বর্তেছে ‘পারী-প্রিফেক্টুর’-এর ওপর অথচ সমগ্র ফ্রান্সের অপরাধ দমনের অধিকার ‘সুরেতে নাশিওনেল’-এর!

অনেকটা আমাদের ক্যালকাটা পুলিশ আর ওয়েস্ট-বেঙ্গল পুলিশের মতো। এক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না। এঁরা যে তথ্যটা আবিষ্কার করেন তা ওঁদের জানান না, ওঁরা যে সূত্রটা খুঁজে পান তা এঁদের বিজ্ঞাপিত করেন না। অথচ ধরা-পড়ার পর চোর ধরার ষোল-আনা কৃতিত্বটা যেন নিজ নিজ বিভাগে বর্তায়।

এই দুই বিভাগের একটা সমঝোতা আনবার উদ্দেশ্যে সরকার একজন বিচার বিভাগের অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে বসিয়ে দিলেন তদন্তকার্যের সবাধিনায়ক করে। তিনি অঁরি দ্রিয়ো। কিন্তু তিনিও হালে পানি পেলেন না।

ঘটনার সমকালে ফ্রান্সে উপস্থিত ছিলেন একজন আশ্চর্য অপরাধ বিজ্ঞানী। কারও কারও মতে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ-বিজ্ঞানী। তাঁর নাম: আলফোর্সে বার্তিলোঁ। তাঁর পশ্চাদপটের কাহিনী একটু শোনাই আগে : জন্ম 1853 সালে। পারীতেই। মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে, 1914তে, মাত্র একষট্টি বছর বয়সে। পিতার দ্বিতীয় পুত্র। বাবা ছিলেন পারীর একজন চিকিৎসক। ছাত্রজীবনে মোটেই ভাল রেজাল্ট করতে পারেননি। কিন্তু কৈশোরেই দেখা গেল তাঁর অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়ের জোর। সেনাবাহিনীতে আবশ্যিকভাবে তাঁকে যোগদান করতে হয়েছিল। কাজ পড়েছিল মিলিটারী হাসপাতালে। ঐ মেডিকেল স্কুলেই তাঁর বোঁক পড়ল ‘নরকঙ্কাল’ বস্তুটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করার। খেয়ালী মানুষ—ওঁর মনে প্রবল জেগেছে প্রতিটি মানুষের সব কয়টি অস্থিই কি দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে একরকম? একের পর এক মাপ নিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন—না, তা নয়। মানব-দেহের প্রায় সওয়া দুই শতটি অস্থির মাপ তার দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে গঠিত নয়। তার একটা আলাদা ছন্দ আছে!

উনি হিসেব করে দেখলেন—বিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে মানুষের দেহে কতকগুলি অস্থির মাপে অদল-বদল হয় না। সুতরাং ঐ যে লোকটা—পাঁচ বছর আগে জেল থেকে ছাড়া-পাওয়া পঁচিশ বছরের টম আর আজকের ধরা-পড়া ত্রিশ বছরের ডিক—এরা অভিন্ন কিনা বুঝে নিতে ঐ হিসেবটা কার্যকরী হতে পারে। ওদের ওজন এক নয়, চুলের রঙ বিভিন্ন, ডিক-এর মুখে প্রকাণ্ড এক ক্ষতচিহ্ন, যা টেমের মুখে ছিল না—কিন্তু ওদের দুজনেরই বাঁ-দিকের ফিমার বোন-এর মাপ ৩৫৬ মিলিমিটার।

বার্তিলোঁ এই নয়-বিজ্ঞানটির নাম দিলেন এ্যানথ্রোপোমেট্রি!

ইতিমধ্যে তিনি মিলিটারী সার্ভিস শেষ করে যোগ দিয়েছেন পারীর পুলিশ-বিভাগে। নিতান্ত নিম্নস্তরের মসীজীবী—আমাদের ভাষায় ‘লোয়ার ডিভিশন ক্লাক’। কিন্তু ঐ বাতিকটা লেগে আছে। থানায় যত অভিযুক্ত ব্যক্তি আসে, বার্তিলোঁ যেটা ছাড়াও ফাইল গেঁথে রাখে তার অপরিবর্তনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ! প্রসঙ্গত বলি, প্রায় শতবর্ষপূর্বে সঙ্কলিত সেই প্রাথমিক

তালিকাটি আজও ফরাসী জাতীয় সরকারের অপরাধ-বিজ্ঞান সংগ্রহ-শালায় সযত্নে রক্ষিত। ‘মুজিয়ামের এক্সিবিট’ হিসেবে নয়—অপরাধীদের সনাক্তিকরণে আজও তা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় আশী লক্ষ অপরাধীর স্বত্বিয়ান আছে সেই ক্যাটালগে।

তঁর ঐ পদ্ধতিতে গত শতাব্দীর শেষপাদে অনেক অপরাধীর মেয়াদ হয়ে হয়ে যায়। ওঁর সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বড় জাতের রহস্য সমাধান করতে নানান বিদেশী সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাতে থাকেন—বার্তিলোর সাহায্য চেয়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অসম্ভব রহস্যের সমাধান করে ফেললেন—ঠিক যেভাবে কল্পনা রাজ্যে শার্লক হোমস্; ইয়ারকুল প্যারো বা এদেশে ব্যোমকেশ বস্বীরা করেছেন। প্রতিদানে রাশিয়ার ‘জার’ নিকোলাস ওঁকে একটি মুক্তাখচিত সোনার টেবিলঘড়ি উপহার দিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়া দিলেন সোনার মেডেল।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বার্তিলোঁই বুঝি ‘ফিঙ্গার-প্রিন্ট’-বিজ্ঞানের জনক। এ কথাটা ঠিক নয়। প্রতিটি মানুষের ‘টিপছাপ’ যে বিভিন্ন এ-কথা চীন দেশের পণ্ডিতেরা জানতেন প্রায় দেড়-হাজার বছর আগে থেকেই। ওরা নিরক্ষর মজদুরদের টিপছাপ নিত তাদের মজুরি মিটিয়ে দেবার সময়। ইউরোপ-খণ্ডে ব্যবহৃতা চালু করেন একজন ইংরেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের পেনশন দেবার সময় সই ছাড়াও টিপছাপ নেবার ব্যবহৃতা চালু করেন, যাতে টমের বদলে প্রায় সমবয়সী ডিক্ বা হ্যারী পেনশন না নিয়ে যায়। ব্যাপারটা খ্যাপাতে অফিসারের পাগলামী বলেই সকলে ধরে নেয়। ‘ফিঙ্গার-প্রিন্ট’ সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করে খিসিস লেখেন একজন ইংরেজ অপরাধ বিজ্ঞানী, যার জন্য তাঁকে নাইটহুড দেওয়া হয় : সার ফ্রান্সিস গ্যালটন। 1892 সালে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অপরাধ-বিজ্ঞানীরা তত্বটা আদৌ মেনে নিতে রাজী হননি। অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনীহায় পড়েছিল এই বিজ্ঞান।

আলফোর্সে বার্তিলোঁই প্রথম সেই পদ্ধতির সাহায্যে কয়েকটি হাল-ছেড়ে-দেওয়া রহস্যের অপূর্ব সমাধান করে পদ্ধতিটার ব্যবহারিক স্বীকৃতি দেন। এ জন্যই বার্তিলোঁ বিশ্বের নমস্য।

কিন্তু আমরা যে সময়ে আছি, অর্থাৎ মোনালিসা চিত্র অপহরণের অব্যবহিত পরে তখনো এই ফিঙ্গার-প্রিন্ট বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহশীল। ওটাকে প্রায় বুজুঝির পর্যায়ে ফেলা হচ্ছিল তখনো। পারীর পুলিশ-বিভাগ এবং কর্তা-ব্যক্তির ওটা মেনে নিলেও মনে নেননি। তা হোক—হস্তরেখাবিদ, ঐন্দ্রজালিকদের পর্যন্ত যখন ডাকা হচ্ছে তখন ঐ পাগলাটাকেও সরকার আহ্বান করলেন। বার্তিলোঁ সিঁড়ির নিচে উদ্ধার পাওয়া কাচখণ্ডে একটি আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করলেন। বললেন, এটি অপরাধীর হাতের টিপছাপ! পুলিশ সন্দেহভাজন কাউকে গ্রেপ্তার করলেই যেন তার আঙুলের টিপছাপ সংগ্রহ করে তঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশ যে সন্দেহভাজন কাউকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি এ পর্যন্ত। ল্যুভারের প্রতিটি কর্মীর টিপছাপ নেওয়া হল—কিন্তু ঐ কাচখণ্ডের ফিঙ্গার-প্রিন্টের সঙ্গে কারও টিপছাপের মিল হল না।

সে সময়ে বার্তিলোঁর সংগ্রহশালায় সাড়ে সাত লক্ষ টিপছাপের সংগ্রহ! ফ্রান্সের প্রতিটি জেলখানার প্রতিটি অপরাধীর অ্যালবাম। এমনকি প্রমাণভাবে যেসব সন্দিষ্ট অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরও। বার্তিলোঁর সহকর্মীরা ক্রমাগত সেই তালিকা ধরে মিলিয়ে যায়, কিন্তু কোনও হদিস করতে পারে না। কেতাদুরস্ত গোয়েন্দারা পাগলের পাগলামি দেখে মনে মনে বোধ করি হাসলেন!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—ঘটনার তিন বছর আগে পেরুগিয়াকে একবার ডাকাতির অভিযোগে পুলিশে থেপ্তার করেছিল। পেরুগিয়া সত্যিই সে ডাকাত দলে ছিল না, সে নিরপরাধ হিসেবে বেকসুর ছাড়া পায়। কিন্তু তার টিপছাপ রাখা ছিল বার্তিলোর সেই ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়। নিতান্ত ভাগ্যের দয়ায় সাড়ে সাত লক্ষ টিপছাপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে বার্তিলোর কোন সহকর্মী কাচের ওপরের টিপছাপটি সনাক্ত করতে পারেনি। পারলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেরুগিয়া ধরা পড়ে যেত!

বিশ্বাস করা কঠিন—গোয়েন্দা বিভাগ আদৌ সন্দেহ করতে পারেনি যে, গোবিয়ার কোম্পানির তরফে যেসব কর্মী ল্যুভারে বুলেট-গ্রুফ কাচ লাগিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ এ কাজের অংশীদার হতে পারে! এই সম্ভাবনাটা কারও মাথায় উদয় হলে গোবিয়ার কোম্পানির দশ-বিশজন কর্মীর আঙুলের টিপছাপ নিয়ে মিলিয়ে দেখা যেতে পারত। আমার তো মনে হয়েছে তার হেতু এই যে, আলফোর্সে বার্তিলোর এই আবিষ্কার—‘ফিঙ্গার-প্রিন্ট-সায়েল’ তখনও পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। আজকের দিনে আমরা সেই মানসিকতাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। কারণ-অপরাধ বিজ্ঞানে আজ ‘ফিঙ্গার-প্রিন্ট’ স্বীকৃত!

তাই দেখছি, কর্তৃপক্ষ ল্যুভারের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সেই প্রাঙ্গার সূত্রে-কে শুধু হাজার হাজার অপরাধীর ফটোগ্রাফ দেখিয়ে চলেছেন—যদি সে ঘটনাক্ষেত্রে সেই লোকটাকে চিনতে পারে, যে লোকটা ঘটনার দিন সকালবেলাতেই শিশি-খেঁড়ি করে বলেছিল ডোর-নব্বা কেউ চুরি করেছে!

সিনরের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল একদিন। ভোররাতে কে যেন করাঘাত করল দুয়ারে। ঘুম-চোখে উঠে এসে দোর খুলে দিল পেরুগিয়া। চমকে উঠল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কঠিন সংযমে গলকঠটাকে ওঠা-নামা করতে দিল না। চিনছে, তবু বোকার মত বললে, কে আপনারা? কী চাই?

পুলিস ইন্সপেক্টর সার্চ ওয়ারেন্ট বার করে দেখালো।

—ও! আসুন, ভিতরে এসে বসুন। এ পাড়ায় চুরি-চামারি হয়েছে নাকি? শুনি নি তো?

পুলিস অফিসার ভাঙা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। পকেট থেকে নোটবই বার করে বললে, মসিয়োঁ পেরুগিয়া, আপনার বয়স কত? আদি নিবাস?

পেরুগিয়া যথার্থ সত্য জবাব দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, কী খুঁজছেন বলুন তো?

এবারও ইন্সপেক্টর জবাব দিল না সে প্রশ্নের। বরং জানতে চাইল, আপনার কোনও পুলিশ-রেকর্ড আছে?

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝেছে, তবু ন্যাকা সেজে বললে, আছে না, পুলিশে কোনদিন চাকরি করিনি। আমি বরাবরই চাকরি করছি ঐ গোবিয়ার কোম্পানিতে।

—আহ! সে-কথা বলছি না। বলছি, আপনাকে কি কোনদিন পুলিশে অ্যারেস্ট করেছিল? মেয়াদ খেটেছেন?

—ও! সেই কথা? আছে হ্যাঁ। পুলিশে একবার হাজতে ধরে নিয়ে যায়। কী একটা ডাকাতির ক্ষেত্রে। আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। জজ-সাহেব বেকসুর খালাস দেন।

—আপনি একুশে আগস্ট, সোমবার দু-ঘণ্টা পরে হাজরির ষাটায় সেই করেছেন দেখা যাচ্ছে। সকাল সাতটার পরিবর্তে বেলা ন’টায়। ঐ দু’ঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন?

শেরুগিয়া বোকা-সোকা । কিন্তু এই মুহূর্তে সে তার ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ রেখেছে। ফাঁদে সে পা দিল না। এখনো পুলিশে তাকে জানায়নি যে, ওরা মোনালিসা ছবির তল্লাসিতে এসেছে। তাই প্রত্যাশিত জবাবই দিল সে, ও বাবা! একুশে আগস্ট তো অনেকদিন আগেকার কথা। লেট হয়েছিলাম কিনা তা কি আমার মুখস্ত আছে?

— হ্যাঁ হয়েছিলেন? আমরা খাতায় দেখেছি!

— কী বার বললেন যেন?

— সোমবার ।

— তাহলে বোধ হয় তার আগের রবিবার রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলাম । আমার ঠিক মনে নেই। দু-তিন মাস অন্তর সোমবার-সোমবার আমার এমনটা হয়। তাই বলছি।

পুলিসে তন্ন তন্ন করে ওর ঘরটা সার্চ করল। কিছুই পেল না।

তারপরও দিনসাতেক অপেক্ষা করল শেরুগিয়া। পুলিশ দ্বিতীয়বার ফিরে এল না দেখে সে একটা কাঠের ট্রাক্ক কিনে আনল। যন্ত্রপাতি নিজের কাছেই আছে। ঐ বাজের একটা ‘ফলস্-বটম’ বানাণো। খাটের নিচে সেটাকে রেখে চলে গেল মাদামের ডেরায়। প্রার্থনা মাত্র ছবিখানা মাদাম ওকে হস্তান্তরিত করল। একটা বড় আশঙ্কা দূরীভূত হল ওর। বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। ওর ভয় ছিল মাদাম ছবিখানা হস্তান্তরিত করতে চাইবে না। যা হোক, এখন আর তার আশঙ্কার কিছু নেই। সিনর ফিরে আসতে বাধ্য। যেহেতু রঙের টেকাটা ওরই হেপাজতে। বস্তিতে ফিরে এসে ছবিখানা একটা পাতলা কাগজে মুড়ে শুইয়ে দিল ট্রাক্কের তলায়। তারপর দ্বিতীয় কাঠখানা পেতে দিল। ছোট-ছোট পেরেক স্টেটে সেটাকে সুরক্ষিত করল। জাতে রঙ-মিস্ত্রি! এমন নিপুণভাবে কাঠের বাজটা রঙ করে পেরেকের মাথা ঢাকা দিল যে, কোন শালা গোয়েন্দার বাপেরও সাধ্য নেই বুঝে ফেলে—ওটা দোতলা বাজ!

তার দু-সপ্তাহ পরে একদিন শেরুগিয়ার ডাক পড়ল বড় সাহেবের ঘরে।

ঘরে ঢুকেই ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মসিয়োঁ পন্ডিফ্-এর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে আছেন সিনর—মানে ডক্টর রিচার্ডসন!

এবারও অসীম সংযমে গলকঠটা ওঠা-নামা করতে দিল না। মনে মনে শুধু বললে, পথে এস বাছাখন! রঙের টেকাটি নিয়ে বসে আছি আমি। পালাবে কোথায়?

পন্ডিফ্ বললেন, ভিল, একটা দুঃসংবাদ আছে!

রীতিমতো আঁৎকে উঠেছে শেরুগিয়া! দুঃসংবাদ! কী জাতীয়?

—ডক্টর রিচার্ডসন ভারতবর্ষের সেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে, তোমাকে ওঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে হচ্ছে না!

ঘাম দিয়ে স্বর ছাড়ল শেরুগিয়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে। তাই কায়দা করে বললে, কিন্তু স্যার, ওঁর সেই অগ্রিম-দেওয়া তিন’শ ফ্রাঁ যে আমি খরচ করে বসে আছি!

ড: রিচার্ডসন বললেন, সেজন্য চিন্তা কর না। তোমাকে অসুবিধায় ফেলার জন্য সেটা আমার শেয়ারত। ওটা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

— থ্যাঙ্ক স্যার !

অভিবাদন করে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে! কিন্তু তকে-তকে থাকে কাছে-পিঠেই। একটু পরে সিনর বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। শেরুগিয়াও পিছু নিল তাঁর। বেশ কিছুটা অনুসরণ করে গোবিন্দার কোম্পানির দোকান থেকে অনেকটা দূরে এসে পাকড়াও করল তাঁকে। সিনর একটুও অবাধ হেলেন না। রাস্তাটা পার হয়ে ওপারের পার্কের ভিতর দিয়ে শার্টকাটের পথ ধরলেন। শেরুগিয়াও আঠার মতো স্টেটে রইল তাঁর সাথে। বেশ ফাঁকা মত জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিনর। বললেন এই চাবিটা ধর। এটা পারী সেন্ট্রাল-স্টেশনের একটা লকারের। ঐ লকারে একশ ফ্রাঁর নোট পঁয়তাল্লিশ হাজার আছে। লকারটার তিন মাসের ভাড়া মেটানো আছে। ধীরে ধীরে ওটা অপসারণ করে ফেল! বুঝলে?

— আশ্চর্য হ্যাঁ! আর ছবিখানা ?

— ওটা তোমার কাছেই আপাতত থাক। এখনো খদ্দের ঠিক করতে পারিনি। সেটা স্থির হলেই আমি এসে নিয়ে যাব। মাস-তিনচার দেরী হবে হয়তো। ব্যস্ত হয়ে না! যদি আরও দেরী হয় তাহলেও নয়। বুঝতেই তো পারছ—ও ছবির খদ্দের জোগাড় করা কী কঠিন?

শেরুগিয়া হাত কচলে বললে, সে আর বুঝিনি? কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে মনে হল কালো-বাজারে ওর দাম বিশ-ত্রিশ লক্ষ ফ্রাঁও হতে পারে!

— তাই নাকি? তা হবে!

— সে-ক্ষেত্রে খদ্দের জোগাড় হলে আমি আর কিছু পাব না?

সিনর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। না, শ্রুতিসীমার কাছাকাছি কেউ নেই। বললেন, তুমি কতটা আশা করছ?

— ফিফটি পারসেন্ট, স্যার! ধরুন, সবকিছুই তো আমি একা হাতে করেছি!

সিনর বিচিট্র হাসলেন। হাসিটা শেরুগিয়ান্ন দ্বিতল বাজের নিচের ছবিটার মত। বললেন, তুমি দশ-পনের লক্ষ হজম করতে পারবে?

শেরুগিয়া একগাল হেসে বললে, কী যে বলেন স্যার! ল্যুভার থেকে মোনালিসাখানা হাতিয়ে আনতে পারলাম আর...

— চুপ কর! পথে-ঘাটে এসব কথা বলতে নেই! ইডিয়ট কোথাকার!

শেরুগিয়া চুপ করে গেল। বলল না যে, কাছে-পিঠে কেউ নেই! মনে মনে স্থির করল, সিনরকে সে লেজে খেলাবে। রঙের টেকাখানা যখন ওর কাছে তখন আর ভয় কি! ওকে ‘ইডিয়ট’ বলার শোধ একদিন না একদিন সে তুলবে!

সিনর একটা গাড়ি ডেকে উঠে বসলেন।

শেরুগিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটল পারী সেন্ট্রাল স্টেশনে। আশেপাশে কেউ নেই দেখে লকারটা খুলে দেখল। হ্যাঁ, থাক-দেওয়া কারেন্সি-নোট! কত আছে শুনে দেখবার সাহস হল না। একমুঠো তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল। তারপর লকার বন্ধ করে শিশু দিতে দিতে বাড়ি ফিরল।

না, বাড়ি পর্যন্ত ফিরতে পারল না। পকেটটা ওকে খোঁচা দিতে থাকে। একটা ঘোড়ার-গাড়িকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। হ্যাকনি-কারেজ নয়, ল্যান্ডো।

গাড়িতে উঠে বসতেই কোচম্যান বললে, কোনদিকে যাব মসিয়োঁ ?

— ফলি বজোয়াঁ !

পারীর এই সর্ববিখ্যাত নাইট-ক্লাবের নামটা সে বহুবার শুনেছে বহুলোকের মুখে, সামনে দিয়ে গেছে কত-কতবার। ভিতরে প্রবেশ করার না ছিল হিম্মত, না পকেটের জোর !

উনিশ'শ বারো সালের বসন্তকাল। অর্থাৎ দেড়-বছর পরের কথা।

অনেক-অনেক জল বয়ে গেছে ইতিমধ্যে সীন নদীর একাধিক সাঁকোর তলা দিয়ে।

সংবাদপত্রে মোনালিসা অপহরণের কোনো সংবাদ ছাপা হয়নি বহুদিন। প্রসঙ্গটা সবাই ভুলে গেছে। আশ্রাণ চেষ্টা করেও ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধী বা অপহৃতের সন্ধান পায়নি। নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ব-ললিতকলার দরবারে তাদের এই লজ্জাকর অসামর্থ্য। সালোঁ ক্যেরের সেই শূন্যস্থানটার—সেই যার একদিকে করেজ্জোর 'সেন্ট ক্যাথারিনের অলৌকিক পরিণয়' আর অপরদিকে তিজিয়ানোর 'অ্যালিগরি'—সেই মর্ম-বিদারক শূন্যস্থানটায় কর্তৃপক্ষ টাঙিয়ে দিয়েছেন রায়ফেল-এর আঁকা একটি পোস্টার : রেনেসাঁ যুগের এক রাজশূরষের তৈলচিত্র—বলদাসারে কান্ডিগলিয়ঁ। তা নিয়ে কোনো পত্রিকা কিন্তু কোনোও ব্যঙ্গাত্মক সংবাদ পরিবেশন করেনি ! কারণ সবাই মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত একটি জাতীয় অবমাননাকর দুর্ঘটনা। শুধু কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্তের ঘোষণা যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সেদিন ঘটল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পারীর জনসাধারণের সেন্টিমেন্টালিটির এক বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। সেদিন পারীর আপামর দর্শনার্থী ফুলের ব্যুকে হাতে লুডারে গেল। সালোঁ ক্যেরের একটা শূন্যস্থানের পদতলে নিঃশব্দে রেখে এল থোকা থোকা ফুলের স্তবক। সেই হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে !

পেকগিয়া কিছু দেশে ফেরেনি।

গাড়ি কিনবার সাহসই হয়নি তার। কী কৈফিয়ৎ দেবে সে ? কোথায় শেল এত টাকা ? তিনমাসের মাখাম লকারটা খালি করে বাড়িল-বাঁধা নোট নিয়ে এল নিজের বাসায়। ইতিমধ্যে সে অপেক্ষাকৃত একটি অভিজাত পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে ! দামী দামী পোশাক কিনেছে। জীবনযাত্রার ভোলটাই পাল্টে গেছে তার। গোবিয়ার কোম্পানির চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন। লকারে কত টাকা ছিল কোনদিনই শুনে দেখেনি। কী হবে হিসেব করে ? রঙের টেকাখানা যতদিন তার আঙিনে লুকনো আছে ততদিনে পাঁচ-দশ হাজার কম বেশীতে কী যায় আসে ?

একটি সুন্দরী বাঙালী জুটে গেল তার। সেটাই স্বাভাবিক। বাঙালীটি পাকা খেলোয়াড়। কোনদিন জানতে চায়নি ওর উপার্জনের উৎসটার বিষয়ে। সে শুধু দু'হাতে ঐ হঠাৎ-নবাবকে দোহন করতে থাকে। পেকগিয়া বোঝে সব—ভ্রুক্ষণ করে না। সে নিশ্চিত—তার কুঁজোর জল শেষ হবার আগেই ফিরে আসতে বাধ্য হবে সিনর। না এসে যাবে কোথায় ? কুইন-অব্-হাটস্ যে ওর হেপাজতে !

তারপর একদিন সে গুনতে বসল তার বুকেরের সঞ্চয়। কোথায় কবে কিভাবে খরচ হয়েছে জানে না—কিন্তু অবশিষ্ট আছে মাত্র হাজার পাঁচক। বাঙালীটিকে বিদায় করল অতঃপর। কোনো

বেগ পেতে হল না এ বিষয়ে । মেয়েটিও বুঝে ফেলেছিল তার কাপ্তান ফোতো হয়ে এসেছে । শেরুগিয়া চ্যানেল পার হয়ে এল লন্ডনে । চিহ্নিত ঠিকানায় স্যামুয়েল রিচার্ডসন নামে কেউ থাকেন না । কোনকালে কেউ ছিলেন না । দিন দুই গোটা এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে ও বুঝতে পারল—‘সিনর’ নামে যে লোকটাকে সে চেনে তার নাম ডক্টর স্যামুয়েল রিচার্ডসন নয় । হয়তো লোকটা ব্রিটিশরাই নয় । না হোক ! কিন্তু সে কেন এভাবে আত্মগোপন করে আছে ? রঙের টেকাটার সন্ধানে তাকে যে আসতেই হবে ওর দ্বারে ডিম্কার খুলি হাতে ! লোকটা ওকে ‘ইডিয়ট’ বলেছিল না ? শোধ নেওয়া যে বাকি !

ফিরে এল পারীতে । এবার আবার বাড়িটা বদলালো । কেঁচে যাওয়া ঘুঁটির মত তার সাবেক ডেরায় । সেই কাঠের বাড়ি, টালির ছাদ । রোজ রাত্রে গুনতে বসে ব্যালেকটা । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অনেকদিন আগে উঠিয়ে নিয়েছে । সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে এই—কমদামী মদে আর মন ওঠে না । বিস্ত্রী অভ্যাসটা । সৌখিন যা কিছু কিনেছিল—পকেট-ঘড়ি, আসবাব মায় পোশাক-পরিচ্ছদ একে একে বেচে দিল অথবা ‘পনশপে’ বন্ধক দিয়ে ফ্রাঁ নিয়ে এল ।

লোকটা বেমজ্বা মারা যায়নি তো ? এ ‘সিনর’ নামের বিচিত্র মানুষটা ? তাই হবে । এ-ছাড়া তাব ফিরে না আসার আর কোন যুক্তিপূর্ণ হেতু থাকতে পারে না । সে তো নিজে চোখে দেখেছে না-হোক লক্ষ ফ্রাঁ সে খরচ করেছে ওদের চার জনকে সহকারীরূপে পাওয়ার জন্য । তাহলে ছবিখানা নিতে আসছে না কেন ?

কেন ? কেন ? কেন ?

কাটল আরও কটা মাস ।

পুঁজি এসে ঠেকেছে তলানিতে । গোবিয়ার কোম্পানিতে এ অবস্থায় চাকরির উদ্দেশ্যে করতে যাওয়া অসম্ভব । ইতিমধ্যে তার নামে নানান মুখরোচক কেজ্জা রটনা করা হয়েছে । ওকে নাকি অনেকেই দেখেছে—পাব-এ, নাইট-ক্লাবে, অপেরা-হাউসে । আর তার কনুই ধরে সর্বদাই ঝুলেছে এক ফ্যাশন-দুরন্ত পারী-সুন্দরী ।

আর্থিক অসচ্ছলতা, মদ, দূশ্চিন্তা আর জগদ্বল পাহাড়ের মত ভারী ঐ পপ্লার কাঠের টুকরোটা ওর মনের ভারসাম্য নষ্ট করল ! ও মনে মনে একটা নতুন নাটক লিখে ফেলল । ‘মোনালিসা-অপহরণ অপেরা’ । সে নাটকে ‘সিনর’ বলে কেউ নেই ! সে নাটকে লালিলোভি প্রাতঃদয় নিতান্ত পার্শ্ব চরিত্র । মাদাম নামে একটি মহিলা-চরিত্র আছে-কি-নেই । সে নাটকের হিরো : ভিন্সেন্সো শেরুগিয়া । ভরতাজা তরুণ ইতালিয়ান ! যেমন তার ক্ষুরধার বুদ্ধি তেমনি মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস ! ফ্রান্সের গোটা গোয়েন্দা-বিভাগ তার সম্মুখে নতশির । নায়িকা : চারশ বছরের অনন্তযৌবনা এক রহস্যময়ী নারী—যার ওষ্ঠাধরে—না, চোখের কোণায়, হলনাময়ীর চোরা-চাহনী ! আর খল-নায়ক : নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তি—যে ঐ নায়িকাকে অপহরণ করে এনেছিল একদিন । একশ বছর পরে নাইট ইরাণ্ট শেরুগিয়া উদ্ধার করেছে সেই লেডি-ইন-ডিস্ট্রেস্কে !

অনবদ্য এ নাটকটি । সবচেয়ে মজার কথা ও নিজেও বিশ্বাস করল : এটাই সত্য !

মাঝে একদিন সে গিয়েছিল গোবিয়ার কোম্পানির দোকানের সামনে । লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল শো-ক্রমটা । এই দেড় বছর কারবারটা আরও বড় হয়েছে । অনেক-অনেক নতুন কর্মী যোগ দিয়েছে । ও থামের আড়াল থেকে দেখল ওর সেকালের সহকর্মীরা একে-একে খাতায় সই

দিয়ে খোলা কাঁধে কাজে রওনা হয়ে গেল—পীতর, লেও, রবার্তো, ম্যাক্স-খুড়ো ! কী সুখে আছে ওরা ! সুখ !

কী পাগলের মতো ভাবছে ভিল্—! একে ‘সুখ’ বলে ? দিনভর ঐ ভারার মাখায় চড়ে দেওয়ালে পৌঁছা মারা !

হ্যাঃ !

কাচ কাটতে গিয়ে হাত কাটা !—থুঃ !

তার চেয়ে অনেক-অনেক আরামের কাজ হচ্ছে...কী ?

সেটা কী ? ভিল্ ঠিক মনে করতে পারল না !

আবার বাড়িতে ফিরে এল। অভুক্ত মানুষটা ফেরার পথে এক বোতল কনিয়োগ কিনে নিয়ে এল।

খালি পেটে তিন পেগেই নেশা হল ওর। আজ আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। কতদিন হয়ে গেল সে তার অপেরার নায়িকাকে দেখেনি ! দরজাটা বন্ধ করে ও বসল ফ্লু-ডাইভার নিয়ে। বোতলটা আখানা হবার আগেই ও খুলে ফেলল ফল্‌স্-বটমটা। বার করে আনল ছবিখানা।

আশ্চর্য ! হারামজাদী এখনও হাসছে !

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল মদ্যপটর। একটা খিস্তি ঝেড়ে বললে, তোর লজ্জা করে না, বেশ্যা মাগী ! তোর উদ্ধারকারী না খেয়ে মরছে, খালি পেটে মদ গিলছে, আর তুই হাসছিস ?

নাটকের নায়িকা নির্বিকার। এখনও মিটিমিটি হাসছে সে !

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো ভিল্। আবার একটা অল্লীল খিস্তি ঝেড়ে বললে, দ্যাখ্ ! তোকে কী শাস্তি দিই আজ !

খাটিয়ার তলা থেকে টেনে বার করল তার রঙ-তুলির বাস্‌টা।

সিদ্ধান্তে এসেছে ভিনসেন্‌জো। ঐ হারামজাদীর গৌফ-দাড়ি এঁকে দেবে সে। চোখ দুটো কানা করে দেবে ! আর কোনদিন ও যেন হাসতে না-পারে !

প্যালেটে রঙ মেশালো। ছবিখানা কাৎ করে ধরল। তারপর তুলে নিল ওর সব চেয়ে প্রিয় সরু তুলিটা। সেটা হাতে নিয়েই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। এটা ওকে ষোড়শ জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল ওর ড্যাড—বার্থ ইতালিয়ান শিল্পী একজন। বলেছিল, ভিল্, এটা আমার বাবার তুলি ! আমি এর মর্যাদা রাখতে পারিনি—দেখিস্, তুই যেন এর অমর্যাদা করিস্ না !

ঐ সঙ্গে মনে পড়ে গেল হঠাৎ ওর মায়ের কথা। বাপির ছবি বাজারে কাটেনি—কিন্তু এই তুলি দিয়ে বাপি মায়ের একখানা অনবদ্য শোর্ট্রেট এঁকেছিল। মাকে ও হারিয়েছে নিতান্ত শৈশবে। তাঁর চেহারাটা ভাল মনে পড়ে না। মায়ের কথা ভাবলেই ওর মনে পড়ে মায়ের সেই প্রতিকৃতিখানা— বাপি যেখানা এঁকেছিল। তবে মায়ের একটা স্মৃতি ওর আজও মনে আছে। তখন ওর বয়স কত হবে ? চার কি পাঁচ ! মা প্যান-কেক বানিয়েছিল—ও তা থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। মা কিন্তু মারধোর করেনি—মিষ্টি হেসে বলেছিল, তুই একটা পাক্কা চোর হবি !

তাইতো হয়েছে ভিল্ ! পাক্কা চোর ! গ্র্যান্ড-পার মতো সার্থক শিল্পী নয়, বাপির মত ব্যর্থ শিল্পীও নয়—শ্রেফ পাক্কা চোর !

হঠাৎ নজর পড়ল আবার মোনালিসার দিকে। এবার সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মোনালিসার মুখখানাকে সেই মুহূর্তে ঐ মদ্যপের মনে হল ওর মায়ের মুখ! ঠিক তেমনি মুখ টিপে যেন বলছে, তুই একটা পাক্কা চোর হবি!

ছবিটার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে মদ্যপটা বললে, বিশ্বাস কর মাম্মি! আমি ... আমি চোর নই! ঘটনাচক্রে এই অবস্থায় পড়েছি। আমি যে তোমাকে উদ্ধার করব বলে তোমার বন্ধনদশা মুক্ত করতে গিয়েছিলাম, মা!

বিশ্বললিতকলার সৌভাগ্য সে রাত্রে মদ্যপটার উচ্ছ্বাসে ছবিখানার কোন ক্ষতি হয়নি!

উনত্রিশে নভেম্বর, 1913।

নভেম্বরের শেষাংশে প্যারীতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু কী করবে বেচারী? ওর যে একটাও কোট অবশিষ্ট নেই। তাল্লিয়ারা ফ্লানেলের শাটটা গায়ে চড়িয়ে ভিন্স হাঁটতে হাঁটতে চলে এল পোস্ট-অফিসে। ওর পুঁজি এখন শ-চারেক ফ্রাঁ। ওর ট্রাকে আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ!

এখন সে কপর্দকহীন কোটিপতি!

ডাক-টিকিট কিনে সাঁটল। ফেলে দিল ডাকবাক্সে। তারপর পোস্ট-অফিসের সিঁড়ির ধাপটার ওপর বসে পড়ল। যেখানটায় এক ঝলক রোদের উত্তাপ। বেচারি অর্থাহারে আছে হস্তাখানেক। পকেটে যেটুকু রেস্তো আছে সেটা দেশে ফেরার রাহা-খরচ। সিদ্ধান্তে এসেছে ভিন্সেনজো। দেশেই তাকে ফিরতে হবে। ইতালীতে। ‘সিনর’ আর ফিরবে না। লোকটা নির্ঘাৎ অশ্রুঘাত মৃত্যুতে ফৌত হয়েছে। না হলে কোটি-টাকার সম্পদ ওর হাতে তুলে দিয়ে এভাবে কপূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে যেত না। ফলে, ভিন্সেনজো শেরগিয়াই এখন ঐ চোরাই মালের একচ্ছত্র মালিক। চোরা-বাজারে এটা বেচবার মতো হিম্মৎ তার নেই। তা সে চায়ও না। ইতালীর সম্পদ সে সাচ্চা ইতালীয়ানের মতো ইতালীতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই মর্মেই চিঠিখানা এইমাত্র পাঠালো। নিজের ঠিকানা জানায়নি। একটা পোস্ট-বক্সের রিটার্ন-অ্যাড্রেস-এ। চিঠির প্রাপক : আলফ্রেদো গেরি ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নাম করা আর্ট ডীলার। ফ্লোরেন্স চেন তো? সেই যেখানে জন্মেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মিকেলান্জেলো বুওনার্ভি। সেই যেখানে বসে লেঅনার্দো ঐকেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি : লা জ্যকোভা! গেলি হচ্ছেন সেই ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে বড় দোকানের স্বত্বাধিকারী—‘গ্যালারিয়া দ্য আং আন্তিকা এ মদান’।

লিখেছে দারুণ কায়দা করে। চিঠিখানা সহজ সরল ইতালীয়ান ভাষায় লিখে ধরেছে আয়নার সামনে। তারপর দর্পণ প্রতিবিশ্ব দেখে দেখে কপি করেছে।

কেন জান? হুঁ-হ বাবা! তোমরা তা জানবে কেমন করে?

তোমারা তো ভিন্সেনজোর মতো ইতালীতে মানুষ হওনি। শোন; বুঝিয়ে বলি—ঠিক ঐ ভাবে লিখতেন লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি! লিখেছিলেন আড়াই হাজার পৃষ্ঠার নোটবই! তিনি অবশ্য দর্পণে দেখে কপি করতেন না। টানা হাতেই ঐ ভাবে লিখতেন। কিন্তু ভিন্সেনজো তো লেঅনার্দের প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি। দর্পণ-প্রতিবিশ্ব না দেখলে চিঠিটা পড়া যাবে না।

দোশরা ডিসেম্বর চিঠিখানা গেলেন প্রাপক। প্রথমে মিনিটখানেক কিছুই বুঝতে পারলেন না। তার পরেই বুঝে ফেললেন। আর্ট-কনৌশার তিনি। লেঅনার্দের বিশ্ববিশ্রুত নোটবই বহুবার

ঘেঁটেছেন। দর্পণের সামনে ধরতেই পড়তে পারলেন চিঠিটা। আপন মনেই হেসে উঠলেন তিনি। দারুণ রসিক তো ছোকরা! দলা-পাকিয়ে চিঠিখানা ফেলে দিলেন ওয়েস্ট-পেশার বাস্কেটে। তারপর খামখানা তুলে নিলেন। পারীর ডাক-টিকিটে। এই মর্যাদিক রসিকতা করতে লোকটা কিছু অনেক খরচ করেছে—এয়ারমেলের ডাক-টিকিটে। আবার তুলে নিলেন দলা-পাকানো কাগজটা। আবার পড়লেন। ভু-দুটি কুঞ্চিত হল। মিনিটখানেক কী যেন চিন্তা করে তুলে নিলেন এবার টেলিফোনটা। ডায়াল করলেন বন্ধুবর পোশ্বিকে। জোভান্নি পোশ্বি হচ্ছেন ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিখ্যাত উফিজি সংগ্রহশালার ডিরেক্টর। তাঁকে বললেন, আজকের ডাকে আমি একটা মিস্টিরিয়াস্ চিঠি পেয়েছি। শুনুন—

পড়ে শোনালেন চিঠিখানা।

পোশ্বি জানতে চাইলেন, টাইপ করা চিঠি?

—আজ্ঞে না। হাতে লেখা। শুধু তাই নয়, মাস্টার আর্নিস্টাম লেঅনাদোর্স মতো উশ্টো করে লেখা—যা আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়।

কৌতূহলী পোশ্বি এসে চিঠিখানা পরীক্ষা করলেন। বললেন, নাইশ্টি-নাইন পয়েন্ট নাইন-পার্সেন্ট চাপ হচ্ছে এটা কোনও মদ্যপের উৎকট রসিকতা অথবা উন্মাদের অহৈতুকী উচ্ছ্বাস। কিন্তু কথায় বলে...

উনি একটি ল্যাটিন প্রবাদবাক্য শোনালেন, যার বঙ্গানুবাদ—‘যেখানে দেখিবে ছাই...’

গেরি চিঠি দিলেন না। টেলিগ্রাম করলেন : পত্রে উল্লিখিত চিত্রসহ স্বয়ং চলে আসুন। আমরা প্রতীক্ষারত।

ডিসেম্বরের নয় তারিখে তারবার্তার প্রত্যাশার এল : লেঅনাদোর্স আজ রওনা হচ্ছেন!

এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা তান্নি মারা ফ্ল্যানেলের জামা, জুতোর ভিতর থেকে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বেরিয়ে আছে—একজন ইতালিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্স থেকে ইতালীতে ফিরল। সোজা ফ্লোরেন্স। কার্সম্স্ তাকে ভাল করে পরীক্ষাও করেনি। করলেও তারা ধরতে পারত না যে, ওর কাঠের বাস্কেট দোতলা। ফ্লোরেন্সে এসে একটা একটা মাঝারি হোটেল উঠল : আলবার্গো ত্রিপোলি-ইতালিয়া। ওর পকেটে এখনো দেড়শ ফ্রাঁ। এক দিনের হোটেল খরচা চলে যাবে। আর তাছাড়া তো...

হোটেলের কামরায় জুতো-জামা খুলে সে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। আর তার ভয় নেই। এখন সে স্বদেশে! বেশ কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে বসল। মুখে-চোখে জল দিয়ে নেমে এল রিসেপশান কাউন্টারে। একটা টেলিফোন করতে।

ফোন পেয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন গেরি। বললেন, আমি এখনি আসছি। কোন্ হোটেলটা বললেন? ত্রিপোলি-ইতালিয়া?

আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছালেন তিনি। একা নয়, সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু জোভান্নি পোশ্বি—উফিজির সবাধিনায়ক। শেরুগিয়া সবিস্তারে বর্ণনা দিতে শুরু করল—কীভাবে সে ছবিখানা দুবছর আগে অপহরণ করেছে। কিন্তু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জোভান্নি পোশ্বি বলেন, ওসব কথা পরে শুনব। প্রথমে ছবিখানা দেখান।

শেরুগিয়া হাসল। বিচিত্র হাসি। যে হাসি আজ চারশ বছর ধরে হাসছে তার নায়িকা—না, মাম্মি!

বলেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়? না হবারই কথা। ঠিক আছে স্যার, চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা আগে ভঞ্জন করে নিন, তারপর শোনাবো কী ভাবে এই ইতালিয়ান মেয়েটিকে বন্দী দশা থেকে উদ্ধার করেছি।

উবু হয়ে বসল সে জু-ড্রাইভার নিয়ে। কাঠের বাজটার তলদেশে অপসারণ করতে। মিনিট দশেক বাদেই সে বের করে আনল ছবিটা।

ওঁরা দুজন সেখানে নিয়ে জানলার দিকে সরে গেলেন। আলোর কাছে, জোভান্নি পকেট থেকে বার করলেন একটা মস্ত ম্যাগনিফাইং গ্লাস!

দীর্ঘ পনের মিনিট ঘর নিস্তন্ধ! তারপর পোন্নি ছবি থেকে মুখ তুলে ঐ দীনবেশী ইতালিয়ানটার দিকে তাকালেন। হোক দীনহীন বেশাবাস—ওর ভঙ্গিটায় সেই আর্ট কনৌশারের স্মৃতিতে ভেসে উঠল আর একটি বিশ্ববন্দি শিল্পকর্ম : ফ্রান্স হাল্‌স্‌ এর ‘লাফিং ক্যাভেলিয়ার!’

যেন মনে হচ্ছে ঐ মোনালিসা ছবিখানা সে নিজেই ঐঁকেছে।

গেরি বললেন, যদুর্ মনে হচ্ছে এটা আসল ছবিখানাই। কিন্তু আমার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা না করে নিশ্চিত বলতে পারছি না।

ভিল্‌ বললে, বেশ তো করুন। পরীক্ষা করুন। কিন্তু পরীক্ষার যদি প্রমাণ হয় এটা খাঁটি, তাহলে আপনারা আমাকে কী দেবেন?

পোন্নি বললেন, কী দাবী আপনার?

— অন্তত পাঁচ লক্ষ লীরা।

— এগ্রীড!—এককথায় রাজি হয়ে গেলেন গেরি।

ভিল্‌ একটু ধতমত খেয়ে গেল। দরটা কম করে বলেছে নাকি? যাগ্‌গে মরুগ্‌গে। ইতালীর সম্পদ ইতালীতে ঘিরে এল এটাই তো আসল কথা। তার বর্তমান অবস্থা কপর্দকহীন—তাই কিছু চাইতে হল।

অধ্যাপক পোন্নি বললেন, অবশ্য দু-একদিন দেরী হতে পারে। কারণ এতবড় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের রোম থেকে অনুমতি নিতে হবে।

—ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি করবেন শুধু। আমার জেব-এ এখন এক বোতল বীয়ার কেনার মত পুঁজিও নেই।

গেরি একটা পাঁচ হাজার লিরার নোট বাড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এটা আপনাকে ধার দিচ্ছি। যেহেতু ঐ ইতালিয়ান মহিলাটিকে উদ্ধার করতে আপনি সর্বস্ব ব্যয় করেছেন।

— ধন্যবাদ।

শেরুগিয়া তৎক্ষণাৎ এক প্লেট বোনলেস্‌ ফ্রায়েড চিকেন আর এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিল।

গেরি আর পোন্নি বেরিয়ে এসেই টেলিগ্রাফ করলেন রোমের ফাইন-আর্টস্‌ বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল কোরাদো রিচ্‌চিকে।

তারবার্তা পেয়ে স্তম্ভিত রিচ্‌চি স্বয়ং চলে এলেন ফ্লোরেন্স।

পরদিন বায়োই ডিসেম্বর ওঁরা তিনজনে যখন শেরুগিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তার আগেই সাদা পোশাকের পুলিশে ঘিরে ফেলেছে ঐ অখ্যাত হোটেলটি। শেরুগিয়া ওঁদের তিনজনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়, স্বাগতম্‌ স্যার! দেখুন, ইতালীর জন্য কী সম্পদ আমি নিয়ে এসেছি!

বাক্স থেকে ছবিখানা বার করে সে রিচিটির হাতে তুলে দেয়। তিনি কয়েক পা শিছিয়ে গিয়ে ঘারের দিকে কাকে যেন ইঙ্গিত করলেন। তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র পুলিশ বেয়নেট উঁচিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুক পড়ল ঘরে।

ওর হাতে যখন হাতকড়া পরানো হচ্ছিল তখন স্তম্ভিত লোকটা শুধু বললে, এর মানে ?

সিটি-পুলিসের প্রধান বললেন, মোনালিসা অপহরণের দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে মসিয়োঁ !

বজ্রাহত হয়ে গেল সরল মানুষটা। ওর গলকণ্ঠটা বহুদিন পরে আজ ওঠানামা করল। কোনক্রমে আমতা-আমতা করে বলে, বাঃ ! অপহরণ ? আমি ? অপহরণ তো করেছিল সেই শালান পলিয়ঁ ! আমি তো উদ্ধারকারী।

পরদিন সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে বিভিন্ন ভাষায় ওটাই ছিল হেড-লাইন নিউজ : ‘মোনালিসাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে।’

সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি লোক চমকে উঠেছিল খবরটা পড়ে।

তাদের মধ্যে ছয়জনের চমক বিশেষ ‘অর্থবহ’। যে ছয়জন শার্দ্রের আঁকা ছবিখানি অরিজিনাল মোনালিসা’ খরিদ করে এতদিন আত্মতৃপ্ত ছিলেন ! আর চমকায়নি একজন—মরক্কোর একটি স্পা-তে প্রমোদ ভ্রমণরত জনৈক অর্জেন্টাইন বৃদ্ধ—এখন যিনি স্বনামে জীবনযাপন করেন : মার্কুইস্ এদুয়ার্দো দে ওয়ালফিয়ের্নো। তাঁর আশঙ্কা ছিলই—এমন ঘটনা যে কোন দিন ঘটতে পারে।

পরের ইতিহাস সারা পৃথিবীর পক্ষে আনন্দের। শুধু একটি ব্যতিক্রম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফ্লোরেন্সের নগরপাল ও পুলিশ-চীফ অভিনন্দন বার্তা পেতে থাকেন। ইতালী সরকার ফরাসী সরকারকে জানালেন—লেঅনার্দোর আঁকা ছবিখানা তাঁরা প্রত্যর্পণ স্বীকৃত, শুধু কয়েকটি ছোটখাটো শর্ত আছে। এক নম্বর : এই ছবিখানা ইতালীর তিনটি শহরে প্রথমে প্রদর্শিত হবে—ফ্লোরেন্স, রোম ও মিলান। দ্বিতীয়ত, অপহরণকারী ইতালিয়ানটির বিচার ইতালীতেই হবে।

দুটি শর্তই ফরাসী সরকার সানন্দে মেনে নিলেন।

প্রায় মাসখানেক ইতালীর তিনটি শহরে প্রদর্শিত হয়ে বিশেষ প্রহরায় ‘লা জ্যকোন্ডা’ রওনা হল পারীর দিকে। সেটি তের সালের শেষ দিন। চৌঠা জানুয়ারী 1914 সালে অর্থাৎ ইতালী ও ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কয়েক মাস আগে সাড়স্বরে প্রদর্শিত হল সেই ছবিখানা ল্যুভারের সালোঁ ক্যেয়ারে।

গোনা-গুনতি দু-বছর চার-মাস চৌদ্দ দিন পরে।

ইতালীতে এবার শুরু হল শেরুগিয়ার বিচার !

জনমত দ্বিধাবিভক্ত। একদল মনে করেন—এ সরল অশিক্ষিত লোকটা জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যে—ইতালীর অপহৃত সম্পদ ইতালীকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে এই বিশ্বাসে—এ কাজটা করেছে। তাকে ক্ষমা করা উচিত। অপর দল বলেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলে সে পাঁচ লক্ষ লীরা দাম চাইবে কেন ?

শেরুগিয়া তার জবানবন্দীতে সিনর-এর উল্লেখ আদৌ করল না—তা করলে সে নিজে লোকের চোখে ষাটো হয়ে যায়, তার নারী উদ্ধারের খিয়োরিটা দাঁড়ায় না। এমনকি লাম্বিলোন্ডি ভ্রাতৃত্বের

উল্লেখও সে করল না। সমস্ত কৃতিত্বটা সে একাই দাবী করল—সমস্ত দায়িত্বটাও সে একাই বহন করতে চাইল। হয়তো সে মনে করেছিল, এভাবেই সে জনসমর্থন পাবে অথবা যে নাটকটা সে মনে মনে লিখেছে সেটাই সে আন্তরিকভাবে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। কোনটা সত্য বলা কঠিন।

বিচারকালে পাব্লিক প্রসিকিউটার সবিস্তারে জানালেন যে, ‘মোনালিসা’ আদৌ নেনপোলিয়ান বোনাপার্ট কর্তৃক অপহৃত হয়নি। সেটা চিত্রকর লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি স্বয়ং বিক্রয় করেছিলেন ফরাসী সম্রাটকে। ফলে প্রতিবাদীর দাবী আদৌ খোপে টেকে না! তাকে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত।

এবার সওয়াল করতে উঠলেন আসামীপক্ষের আইনজীবী। পেরুগিয়া উকিল দিতে পারেনি। তার বৃদ্ধ বাবা এসে বসেছিল দর্শকদের একান্তে ; কিন্তু উকিল দেবার ক্ষমতা তারও ছিল না। উকিলের খরচ জুগিয়েছিল ইতালীর সাধারণ মানুষ—চাঁদা তুলে। তারা ঐ প্রায়-নিরক্ষর রঙ-মিশ্রিটাকে ভালবেসে ফেলেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল—ও সাদা ইতালিয়ানদের মতো জাতীয় সম্পদ স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছে। হ্যাঁ, ঠিক কথা—‘মোনালিসা’খানা নেনপোলিয়ঁ অপহরণ করে নিয়ে যায়নি ; কিন্তু অসংখ্য অমূল্য শিল্পসম্পদ যে সেই বোম্বেটেটা ইতালী থেকে লুট করে নিয়ে গেছিল, এ-কথাটা তো মিথ্যে নয়। গত একশ বছর তার প্রতিবাদে ইতালী কিছুই করতে পারেনি। ঐ অশিক্ষিত রঙ-মিশ্রিটা তার জাতীয়তাবোধের উন্মাদনায় পারী-পুলিসের গালে একটা থাম্বড় কষিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে জাতীয় বীর!

আসামীপক্ষের আইনজীবীও সেই মর্মে সওয়াল করলেন। বললেন, ‘সহযোগী যে কথা বলেছেন তা অবাস্তব। ‘মোনালিসা’ ছবিখানা ইতালীর শিল্পীই আঁকেছেন—সেটা কীভাবে লুণ্ঠারে গিয়েছে এ তথ্য অবাস্তব। এ মামলায় বিচার্য : আসামী নিজ বিশ্বাস-অনুযায়ী কী জানত ? কোন প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সে এ-কাজ করেছে! আসামীর মানসিকতাই এক্ষেত্রে বিচার্য—মোনালিসা ছবির ইতিহাস নয়। ধর্মবিতার ! আমার সহযোগী বলেছেন—আসামী রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছিল ; কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণে সপটা মিথ্যা কিনা তা আমাদের বিচার্য নয়, আমাদের বিচার্য ভ্রমাত্মক ব্যক্তির সর্পভীতিটা সাদা কিনা।

বিচারক আইনের শৃঙ্খলে বন্দী। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবী সকৌতূহলে জানতে চায়—বিচারে তিনি কী রায় দেন। বিশেষ করে ফ্রান্স ! ফ্রান্সের পুলিশ বিভাগ ! তাঁর বিচারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও জড়িত ! ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শিল্পাহরণে এই বিচার ‘রেফারেন্স’ হিসেবে উদ্ধৃত হবে।

তাই তিনি ঘোষণা করলেন : আসামী দোষী !

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর গলকটটা ওঠা-নামা করল না কিন্তু। সে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত ! যেন কারারা-মার্বেলে গড়া মিকেলান্জেলোর এক বন্দী !

দর্শকের আসনে-বসা একটি বৃদ্ধ পকেটে থেকে ক্রমাল বার করলেন নিঃশব্দে।

—দোষী ; কিন্তু সব দিক বিচার করে, বিশেষত আসামীর নিজস্ব ধারণার কথা বিবেচনা করে আইনের ধারা-মোতাবেক আমি তার নিম্নতম শাস্তি বিধান করছি : সাত মাস বিনাশ্রম কারাবাস। তবে যেহেতু আসামী গ্রেপ্তারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বসম্মত সাতমাস নয়দিন হাজতবাস করেছে—জামিন পায়নি—তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে তার পূর্ণ মেয়াদ খেটেছে।

তাই অভিযুক্ত আসামীকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করলেও আমি আজ তাকে এই মুহূর্তে মেয়াদ-অন্তে-মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে ওঠে।

উনত্রিশে জুলাই উনিশ'শ চৌদ্দ সালে 'মোনালিসা অপহরণ অপেরা'র নায়ক বেরিয়ে এল জেলখানা থেকে।

আজ সে অ-কোটপাতি অকপট কপর্দকহীন!

ওর উকিল জানতে চাইল, কোথায় যেতে চান এখন? দেশের বাড়িতে? ক্লাস্ত বিষন্ন মানুষটা বলল, সেখানে যাবার মুখ নেই। আমাকে সেই হোটেলটায় শৌঁছে দিন—যেখানে আমাকে থেপ্তার করা হয়েছিল—সেই ত্রিশোলাইতালিয়ায়।

উকিলবাবু হেসে ফেলেন, সরি! ফ্লোরেন্সে আজ ঐ নামে কোনও হোটেল নেই!

— মানে? ক'মাস আগেও আমি যে ঐ হোটেলে—

— জানি! কিন্তু আপনার কৃতিত্বে হোটেলের মালিক নামটা পাল্টে দিয়েছে।

ওর নাম এখন : লা জ্যাকোভা!

আজ যদি ল্যুভারে যান তবে 'মোনালিসা'কে সালোঁ কেয়ারে দেখতে পাবেন না। এখন তা রাখা আছে 'সালে দে এতাৎ' কামরায়। আমি কিছুদিন আগে, 1984 সালে, মোনালিসার পাশাপাশি দেখেছিলাম লেঅনার্ডের 'মাদোনো অফ দ্য রকস', 'বাকাস', রাফায়েলের 'মাদোনো' ইত্যাদি। পাশের প্রাচীরে ছিল 'ভেরোনিক্স'-এর আঁকা কয়েকটি চিত্র এবং বিপরীত প্রাচীরে টিশিয়ানের। অর্থাৎ ছবি সাজানোর কায়দাটা এই অর্থ-শতাব্দীতে বদলানো হয়েছে। যা বদলায়নি তা হচ্ছে 'মোনালিসা'-চিত্রের সম্মুখে দর্শকের ভীড়।

তা হোক, 'সালে দুশতেল হল-কামরায়' সেই ছোট্ট গুদামঘরটি আজও আছে। যেখানে ঐ হতভাগ্য শেরুগিয়া একটি রাত কাটিয়েছিল। মোনালিসা যে কুলুঙ্গিটায় বুলেট-প্রুফ আবরণীর ভিতর এখন বাস করে সেটি আর্দ্রতা ও উত্তাপ-নিয়ন্ত্রিত। কার্ল ডেকারের গবেষণা-গ্রন্থ থেকে জানতে পারা গেল শার্ট্র ঐ মোনালিসার পরে আর কোনও নকল ছবি বিক্রির কারবারে কখনো ছিলেন না। পারীর কাছেই অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটিয়ে ছিলেন। শেরুগিয়াকে দুমেঞ্জার মানুষ বীরের সম্মান জানাতে কুষ্ঠিত হয়নি। তাঁকে ওরা কাঁধে তুলে নেচেছিল! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে যোগদান করে বন্দী হয়, এবং যুদ্ধান্তে উনিশ সালে মুক্তি পায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীতে বোচারি কোনও কর্মসংস্থান করতে পারে না। নিজের নামের মাঝের অংশটাই পদবী বলে চালিয়ে সে সীমান্ত অতিক্রম করে ফিরে আসে পারীতে। একুশ সালে সে একটি ইতালীয়ান পুস্তকব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করে; আর পারী উপকণ্ঠে 'সেঙ্-মর-দে ফোসে' অঞ্চলে একটা বস্তিতে বসবাস করত। উনিশশ' পঁচিশ সালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বোচারীর সব যন্ত্রণার অবসান ঘটে। শেষ জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতায় সে যথেষ্ট কষ্ট পায়। বস্তৃত —অনাহার আর অপুষ্টিই তার অকালমৃত্যুর কারণ!

অপর পক্ষে পরমকারাগিকের দয়ায় এই পৃথিবীতে—যে বিকৃত দুনিয়া সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আই কুড হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ বেটার ওয়ার্ল্ড'—মার্কুইস্ এদুয়ার্দো দে ওয়ালফিয়ের্নো দীর্ঘ আশি বৎসর বহাল তবয়তে বাঁচেন। বিয়ে-থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়েননি। বিশ্বের

বিভিন্ন-প্রান্তে ভ্রমণ-বিলাসীর জীবনযাপন করে যান। প্রতিটি প্রমোদভ্রমণে অর্থমূল্যে শয্যাসজ্জিনী। অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গই ওঠেনি। শাস্ত্রের আঁকা ছয়খানি ছবির প্রতিটিই তিনি বিক্রয় করে ফেলেছিলেন—মোনালিসা পুনরুদ্ধারের আগেই—গড়ে তিন লক্ষ মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ সর্বমোট তাঁর আয় হয় এক-কোটি আশি লক্ষ ডলার। সে-আমলের হিসাবে তা প্রায় বিশ কোটি টাকা! বর্তমান বাজারদরে কত শ কোটি টাকা হবে বলতে পারি না।

শেরুগিয়ার জ্বানবন্দীতে ‘সিনর’-এর উল্লেখ ছিল না। ফলে পুলিশে কোন দিনই তাঁর খোঁজ করেনি। আন্তর্জাতিক চোরা কারবারীদের কল্যাণে তাঁর অর্থ গচ্ছিত ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে—সিংহভাগ সুইজারল্যান্ড! নিরুপদ্রব কামিনীকাঞ্চন-কলঙ্কিত জীবন। তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, মার্কিন সাংবাদিক কার্ল ডেকারকে ডেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মোনালিসা অপহরণ কাহিনীটি সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন। একটি মাত্র ছোট্ট শর্ত ছিল তাঁর—ডেকার যেন মার্কুইসের দেহাবসানের পূর্বে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থটি প্রকাশ না করেন। সে শর্ত অনুযায়ী কার্ল ডেকার তাঁর পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন বাস্তবন্দী করে রেখে দেন। এই গবেষণা-গ্রন্থটি সমাপ্ত করার তাগিদেই ঐ যুবক সাংবাদিকটি পারীতে এসেছিলেন শেরুগিয়ার জ্বানবন্দী নিতে—বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাহিনীটি শুনতে। তিনি জানতেন, শেরুগিয়া সেই উনিশ শ চব্বিশ সালে ‘শেত্রো’ ছদ্মনামে সত্বীক পারীতে ফিরে এসে সাবেক রঙ-মিশ্রিত জীবিকায় দিনাতিপাত করছেন।

উনিশ শ’ চব্বিশের সেই তেরই এপ্রিলের দিনটি। পারী-প্রান্তের সেই পাব-হাউস।

সারাদি সকাল ধরে শেরুগিয়া বকবক করে গেছে। শুনিয়েছে তার মনে মনে—লেখা ‘মোনালিসা অপহরণ অপেরা’। ইতিমধ্যে চারটি বীয়ারের বোতল শেষ হয়েছিল তার। কার্ল ডেকার মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে হারিয়ে যাওয়া খেঁইতে কথাকোবিদকে ফিরিয়ে এনেছেন। মাঝে মাঝে নোটবইতে সাল-তারিখ-নাম-ধাম লিখে গেছেন। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে কোটরগত ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে মদ্যপটা বললে, আপনি পুরো একশ ফ্রাঁ মজুরি দিয়েছেন আমাকে। তদুপরি এই বীয়ারের বন্যা! বলুন মসিয়োঁ সাংবাদিক! আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার? আমি আজ বলব...সব কথা বলতে রাজি! আমি আজ দিলখুশ! পুরো একশ ফ্রাঁ একদিনের মজুরি কোন শালা দেয়? ডেকার বললেন, মোটামুটি সব কথাই বলেছেন আপনি। শুধু একটি প্রশ্ন। সকালেই আপনি বলেছিলেন, মার্কুইস্-এর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল বছর-দুই আগে। সেই গল্পটা এবার শোনান।

— শোনাব! আলবৎ শোনাব! একবেলায় একশ ফ্রাঁ কোন শালা দেয়? কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে একটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন তো মসিয়োঁ সাংবাদিক? ঐ শালার প্রশ্নটা আজ তের বছর ধরে আমার মগজটা গুব্বরে পোকাকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে!

— কী প্রশ্ন? বলুন?

— রঙের টেকাটা এই শালা শেরুগিয়ার আশ্তিনের তলায় লুকনো রইল—অথচ হারামজাদা সিনরটা কেন ফিরে এল না আমার ডেরায়? ভিক্ষা চাইতে?

কার্ল ডেকারের করুণা হল। আশ্চর্য! এই সহজ সরল মানুষটা সে কথা আজও জানে না! সব কথা খুলে বললেন তিনি। কী কারণে মার্কুইস্ অরিজিনালখানা কোনদিনই নিতে আসেনি। মদ্যপটা এবার বললে, অব সমবলম্! অ্যান্ডিনে স্বীকার করছি: হারামজাদাটা ন্যায্য কথাই বলেছিল সেদিন।

— কী কথা ?

— আমি শালা একটি এক-নম্বরের ইউয়ট !

— এবার আপনি শোনান, কবে কি-করে দু-বছর আগে ওকে দেখেছেন।

— শোনাব। তাহলে কিছু গলাটা আর একটু ভেজাতে হবে; আর সব সিগ্রেট খতম হয়ে গেছে।

— শ্যিওর !

এল আর একটা বীয়ারের বোতল। সিগ্রেটের কার্টুন। শেরুগিয়া শুরু করে শেষটা।

বছর দুই আগে ‘শেদ্রে’ ছদ্মনামে সে যখন সীমান্ত অতিক্রম করে সত্বীক পারীতে চলে আসে তখন তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পারীতে সে কর্ম-সংস্থান করে উঠতে পারে না। অনেক-অনেক ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘিরে এসেছে। তারা বেকার। ফরাসী সরকার চাকরির ক্ষেত্রে তাদেরই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। শুধু সরকার নয় সাধারণ মানুষও পেন্ড্রো-কে একটি বেকার-যুবক হিসাবে দেখত না।—দেখত ইতালিয়ান হিসাবে।

হনিমুনে পারীতে এসে ভিল তার নবপরিণীতাকে লুভারটাও দেখাতে নিয়ে যেতে পারেনি। শুধু অর্থের অভাবে নয়; ওর ভয় ছিল—যদি সেই পরিচিত কর্মীরা ওকে চিনে ফেলেন! সেই পশাদুঁ, পিকোয়ে, সতে! অঁরি দ্রিয়োর বিচার-বিভাগীয় তদন্ত-রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর তাদের অনেকেরই ‘ডিম্যাশান’ হয়েছে, ‘ইনক্রিমেন্ট’ বন্ধ হয়েছে। চিন্তে পারলে তারা শেরুগিয়াকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই এবার পারীতে এসে সে সাহস করে লুভারে পদার্পণই করেনি।

তবে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বেকার মানুষটা একদিন দেখা করেছিল মসিয়োঁ পন্ডিফ-এর সঙ্গে। ওর প্রাক্তন মনিব—গোব্বিয়ার প্লেজিয়ার প্রতিষ্ঠানের মালিক। দপ্তরে নয়, তাঁর বাড়লোতে। অফিসে দেখা করতে তার সঙ্কোচ হয়েছিল—লজ্জা! পন্ডিফ ওকে চিনতে পারলেন। বললেন, শেরুগিয়া, আমি তোমার ব্যাপারটা জানি। হয়তো সবটা নয়; কিন্তু পারীর খবরের কাগজেও ইতালীর আদালতে তোমার যে বিচার হয়েছিল সে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তোমাকে চাকরি দিতে পারি; কিন্তু তুমিই বিবেচনা করে দেখ—আমার কোম্পানিতে আবার জয়েন করা কি তোমার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে?

কোটরগত একজোড়া চোখ ওঁর দিকে মেলে শেরুগিয়া জানতে চায়, কেন স্যার? ওরা কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? ঐ—পীতির, লেও, রবার্তো, ম্যাক্স বুড়ো? ওদের তো কোন ক্ষতি আমি করিনি? হ্যাঁ, আচম্কা কিছু ফাঁ হাতে এসেছিল—ফুর্তি করে উড়িয়েছি, তাতে ওদের চোখ টাটিয়েছে! ব্যস! তাতে কী? ওরা কেউ ওভাবে হঠাৎ লটারিতে ফাঁ পেলেন ওড়াবে, তখন আমার চোখ টাটাবে! শোধবোধ! সেজন্য ওরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না কেন?

পন্ডিফ বলেন সে কথা নয়, ভিল! কিন্তু ওখানে তোমাকে যে সবাই চিনে ফেলবে। ‘পেন্ড্রো’ ছদ্মনামটা যে ওখানে চালানো যাবে না। পারী পুলিশ তোমাকে চিনে ফেলবেই!

— কিন্তু আমার বিচার তো ইতালীতেই হয়ে গেছে স্যার! ফ্রান্স তো প্রতিশ্রুত—আমাকে হেনস্তা করবে না!

— তুমি বুঝতে পারছ না ভিল! পুলিশের আক্রোশটাতো যায়নি। তুমি যে গোটা বিভাগটার গালে থাম্বড় কষিয়েছিল এটা কি ওরা ভুলতে পারে? ওরা তো তোমাকে ফটকে দেবে ছদ্ম-পরিচয়ে

ফ্রান্সে আসার জন্য।

তা বটে ! মাথাটা নিচু হয়ে গেল ভিল-এর।

পন্ডিফ বললেন, তার চেয়ে এক কাজ কর। আমি একটা ইন্টোডাকশন লেটার দিচ্ছি। তুমি মার্কুইস ওয়ালফিম্যানের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। একজন দক্ষিণ আমেরিকান ধনকুবের। পারীর উপকণ্ঠে ওঁর একটা বাগানবাড়ি আছে—‘শাতু দ্য লিজা’—আসলে ‘শাতু’ বা দুর্গ নয়, প্রমোদভবন। সেটা ফাঁকাই পড়ে থাকে, একজন কেয়ার-টেকারের হেপাজতে। আমাদের কোম্পানি বাৎসরাস্তিক রঙ-ফেরায়। আমার সঙ্গে অবশ্য তাঁর মৌখিক আলাপ নেই। তবে আমাকে তিনি চেনেন। উনি বছরে একবার পারী বেড়াতে আসেন। এ সপ্তাহে এসেছেন। আমি অনুরোধ করলে তিনি তোমাকে ঐ প্রমোদভবনের ‘মালি’ করে দিতে পারেন। প্রকাশ বাগান আছে, ফুলের আর ফলের—আপেল, আঙুরের।

‘মালি’-র চাকরি করবে ?

ভিল হাতে স্বর্গ পেল ! ওর নবপরিশীতা বধু ফুল খুব ভালবাসে। তার বাপের ছিল ফুল-সরবরাহের কারবার। কিশোরী বয়সে ফুলের মধ্যেই কেটেছে ঐ ফুলের মত মেয়েটির জীবন। এক কথায় রাজি হয়ে গেল ভিল ! মার্কুইস ওয়ালফিয়েনের নাম সে জীবনে শোনেনি। তাঁর নামে লেখা পন্ডিফ-এর পরিচয়-পত্রটা নিয়ে দেখা করতে গেল ধনকুবেরের সঙ্গে।

বিরাট প্রাসাদ। বিশাল বাগিচা। কম্পাউন্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘের মতো এক জোড়া থ্রেট ডেন। পন্ডিফ-এর পত্রখানা না থাকলে ঐ ধনকুবেরের বৈঠকখানা পর্যন্ত বেচারি যেতেই পারত না। ম্যানেজার চিঠিখানা দেখে ভ্যালেকে দিলেন। সে কিছুক্ষণ পরে ওকে ডেকে নিয়ে গেল ধনকুবেরের ড্রইংরুমে। সাহেব তখন সেখানে সঙ্গীক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। —সঙ্গীক ? না ! সবাঙ্কবী ! মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিল ভিল। পারীর এক বিখ্যাত ব্যালে-ডান্সার !

তার ছবি বন্দ্যার দেখেছে পোস্টারে।

মার্কুইসকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেল সে !

শোঁফ-দাড়ি কামানো, প্যাঁশনে নেই, রিমলেস্ চশমা, তবু চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না ওর।

চিনলেন সিনরও। কিন্তু কেউই সে-কথা স্পষ্টাপষ্ট স্বীকার করলেন না। পন্ডিফ-এর চিঠিখানা পড়ে মার্কুইস ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইতালিয়ান ?

— কী নাম তোমার ?

— ভিন্সেনজো পেত্রো। —মুখ নিচু করে বললে ভিল।

— তোমার কোন যমজ ভাই আছে ?

এবারে নেতিবাচক গ্রীবাঙ্কালন করল।

পারী সুন্দরী গবুলেটে শ্যাম্পেন ঢালছিলেন। হঠাৎ থমকে পড়েন। বীণা-বিনিমিত কণ্ঠে মার্কুইসকে প্রশ্ন করেন—হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ? মার্কুইস হেসে তাকে বললেন, তুমি বুঝবে না, হানি ! ভিল বুঝেছে। ঠিক ওর মতো দেখতে আর একজন ইতালিয়ানকে আমি এককালে চিনতাম। সে ছোকরা ছিল পাক্কা ইডিয়েট ! তার নাম ছিল : ভিন্সেনজো পেত্রোগিয়া ! অবশ্য তার মানে এ নয় যে, পেত্রোও একজন ইডিয়েট !

ব্যাগে ডালার কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভিল্-এর দিকে তাঁর ভূবন-মোহিনী চোখ জোড়া তুলে তাকালেন।

আর সহ্য হল না ভিল-এর। সেই খণ্ড-মুহূর্তে সে ভুলে গেল দ্বারপ্রান্তে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে মার্কুইস এর এক কান্না দেহরক্ষী—বাগানে ঘুরছে একজোড়া ভীষণদর্শন থ্রেট ডেন। পারী-সুন্দরীর চোখে-চোখ রেখে ভিল্ বলে ওঠে, এমন ভুল মানুষের হয়, মাদাম। এতে অবাধ হবার কিছু নেই। আমিও একজন ব্রিটিশারকে এককালে চিনতুম। সে হারামজাদা ছিল পাক্কা জুয়াচোর। তার নাম : ডক্টর স্যামুয়েল রিচার্ডসন! অবশ্য তার মানে এ নয় যে...

— এনাফ! তুমি যাও এখন! ম্যালকম!

বোঝা গেল ওঁর দেহরক্ষীর নাম ‘ম্যালকম’। কারণ সে লোকটা এক-পা এগিয়ে এল।

— ওকে গোটটা পার করে দাও! দেখ, ‘ডেভিল’ যেন না কামড়ায়!

ম্যালকম এসে ভিল-এর হাতটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরল। এক্ষট করে প্রমোদ-ভবনের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল!

— এই আমার সেই শয়তানটার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কাহিনী! —কোনক্রমে বললে মাতালটা। প্রহর করল, আর কিছু জানতে চান মসিয়োঁ সাংবাদিক? প্রশ্ন থাকে তো বলুন। আমি আজ দ্যাংটো হতে প্রস্তুত। সব কথাই খুলে বলব! একবেলার জন্য একশ ফ্রাঁ কোন শালা দেয়? কার্ল ডেকার বললেন, না মসিয়োঁ পেত্রো। আর কিছু প্রশ্ন নেই আমার। চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই—

— কেন? কিসের জন্য? তুমি ভেবেছ পেত্রো-শালা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে? পাঁচ বোতল বীয়ারে? ফুঃ! এককালে বোতল-বোতল শ্যাম্পেন উড়িয়েছে এই শর্মা, তা জান? পারীর খানদানি বার-এ!

— জানি! আসুন আপনি। উঠুন!—ভিল-এর বগলের তলায় হাত দেয়।

ঝট্কা মেরে তাকে সরিয়ে দেয় মাতালটা। বলে, কিস্‌ সাহায্য চাই না, কুয়েছ? আমি এখন খুঁমোব।

হুঁড়ি মেরে সে উঠে পড়ে টেবিলটায়। চিং হয়ে শুয়ে পড়ে।

কার্ল ডেকার অসহায়ভাবে বার-ম্যানের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

লোকটা এগিয়ে এসে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, মসিয়োঁ। ভিল্‌খুড়ো আমাদের প্যাডার রঙ-মিস্ত্রি। খোঁয়াড় ভাঙলে ও নিজেই উঠে চলে যাবে। প্রয়োজন হল, আমি তাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

ডেকার বিল মিটিয়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান।

ঠিক তখনই কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল মাতালটা। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, মসিয়োঁ সাংবাদিক! তুমি তো আমার মতো আনশড় নও! তুমি পণ্ডিত। সারাটা সকাল ধরে নানান প্রশ্ন করেছ আমাকে। এবার আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দাও দেখি? জবাব ঠিক হলেই তোমার ছুটি; আর ভুল হলে আবার আমি তোমার ঘাড়ে চেষ্টা বসব! আমাকে বীয়ার খাওয়াতে হবে।

কার্ল ডেকারের মনে পড়ে গেল একটা ভারতীয় উপকথার কাহিনী।—একটা প্রেতাশ্বা গাছের ডাল থেকে ঝুপটা হয়ে ঝুলছে আর একজন ভারতীয় রাজাকে বলছে, —বল, রাজা বিক্রম, গল্পটা শুনেছ, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও...

— এক নম্বর প্রশ্ন : আনপড় ভিনসেন্জো পেরুগিয়ার জীবনে চরমতম বেদনার মুহূর্ত কোনটি ?
ধুরন্ধর মার্কিন সাংবাদিক বললেন, সেই যখন ত্রিাশালী-ইতালীয়ার হোটেলে পুলিশ-চীফ আপনার
হাতে হাত-কড়া পরাতে এগিয়ে এলেন।

অট্রহাস্যে ফেটে পড়ল মাতালটা। বললে, হয়নি, হয়নি, ফেল! না! জীবনের চরমতম আঘাত
শেলুম যখন বিচারালয়ে উকিলবাবু বুঝিয়ে বললেন— ইতালীয়ান শিল্পী নিজেই বেচে দিতে
বাধ্য হয়েছিলেন... মাঝপথেই থেমে পড়ে। আচমকা একটা হেঁচকি সামলাতে গিয়ে।

পাদপূরণ করেন ডেকার, জানি! লা জ্যকোভার সেই ছবিখানা!

— না! আমার মান্নিকে!

লোকটা এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য বন্ধু মাতাল!

নিঃশব্দে কার্ল ডেকার কেটে পড়তে চাইলেন। পিছন ফিরতেই গর্জন করে উঠল লোকটা, এ্যা—ও!
পালাচ্ছ কোথায়?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন আবার। বলেন, কেন? কী হল?

— দু-দুটো প্রশ্ন করব বলেছি না? দ্বিতীয়টা যে এখনো বাকি! এবার বল তো বাহ্যখন,
এই আনপড় ইতালীয়ানটার জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত কোনটি?

— যখন দুমেঞ্জার মানুষ আপনাকে কাঁধে তুলে নাচছিল?

— ধু-স্! তুমি দেখছি আমার চেয়েও বড় জাতের ইডিয়ট, মসিয়োঁ লা সাংবাদিক! সেটা
তো আমার চরম লজ্জার মুহূর্ত! আমার ...আমার...জীবনের সার্থকতম মুহূর্ত কোনটি, তাই
আমি এখন জানতে চাইছি। ঠাকুরদার নাতি হিসাবে—শিল্পী হিসাবে দুনিয়াকে কী আমি দিয়ে
গেলুম?

কার্ল ডেকার বুঝে উঠতে পারেন না—কোন জবাবটা শুনলে ঐ মদ্যপটা ঠাণ্ডা হবে।
সে নিজেই দাখিল করল সমাধান : সেই যখন বাপির কাছ থেকে উপহার পাওয়া গ্রান্ড-পার
তুলিটা তুলে নিয়ে বুঝতে পেরেছিলুম—মোনালিসা আমার প্রেয়সী নয় : মা! আজ আমি
মাতাল হইনি, কিন্তু সেদিন বেহেড মাতাল হয়েছিলুম! গ্রান্ড-পা ছিল সাঁচ্চা শিল্পী! তার তুলির
আশীবাঁদেই আমার মা কানা হয়ে যায়নি, বুঝলে?

— হ্যাঁ, বুঝেছি!

— হ্যাঁ! কথাটা লিখে দাও তোমার গবেষণা-গ্রন্থে! মোনালিসার চোখ দুটো ঁকেছিলেন ভিক্ষি
গাঁয়ের এক বাস্টার্ড শিল্পী, আর সেই চোখ জোড়াকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল লেট ল্যামেটেড্ জোভান্নি
পেরুগিয়া দ্য দুমেঞ্জার নাতি, এই দীনাতিদীন রঙ-মিস্ত্রিটা! বেহেড মাতালটা!

ধ্রাশ করে শুয়ে পড়ল আবার।

পানশালা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আবার একবার পিছনে ফিরে তাকালেন কার্ল ডেকার।
মাতালটার মাথা আর দুটো হাত টেবিল থেকে উল্টোদিকে ঝুলছে! কঙ্কালসার মানুষটার।
যেন শিংশপা বৃক্ষ থেকে প্রলম্বিত এক অশান্ত প্রেতাত্মা : বেতাল!

হান : কাইজারগ্ৰাচ—অর্থাৎ আমস্টারডাম শহরের একটি অভিজাত রাজপথ।

কাল : 25.5.1945 —অর্থাৎ বার্লিন বান্ধারে বিশ্বত্রাস হিটলারের আত্মহত্যা করার পঁচিশ দিন পরের কথা।

পাত্র : হান ভাঁ মীগেরে—অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর সর্বকথ্যাত প্রবন্ধক।

কাটজারগ্ৰাচ রাস্তাটা—যদি Keizergracht এর সেটাই বাঙলার রূপান্তর হয়—শহরের কেন্দ্রস্থলে। প্রশস্ততম ক্যানালের কিনার বরাবর দুই সারি পশুপাল; দু পাশে দু-তিনতলা বাড়ি। একই স্থাপত্য শৈলীর। আমস্টারডাম শহরের এই এক মজা! তৈলখনির মালিক আরব শেষই হও আর মার্কিন মাল্টিমিলিয়নেয়ারই হও, ও-শহরে বাড়ি বানাতে হলে তোমার ইচ্ছামত পায়রা খোপ তৈরী করা চলবে না। নেদারল্যান্ডস্ স্থাপত্য-শৈলীর ডিজাইন না হলে সিটি-আর্কিটেক্ট বাড়িটি অনুমোদনই করবেন না। তাই শহরের রূপটা রয়ে গেছে অবিকৃত। ও সড়কে একটি বাড়িকেই বলা চলে প্রাসাদ—চারতলা প্রকাণ্ড সৌধ। তারই সিং-দরোজার সামনে এসে পুলিশ-ভ্যানটা ব্রেক কষল। এগিয়ে এল যুনিফর্মধারী সশস্ত্র দ্বাররক্ষক—সসজ্জম স্যালুট করে দেখতে চাইল পুলিশের সনাত্তিকরণ চিহ্নটা। পুলিশের গাড়িও ছাড়পত্র পায় না সহজে। সিনিয়ার পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন দুজঁ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দ্বাররক্ষকের নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরে দেখায় তার আইডেনটিটি-কার্ড। বলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই আছে। টেলিফোনে।

— জানি, স্যার। যান ভিতরে। —খুলে গেল প্রকাণ্ড লোহার গেটটা। সকাল তখন সাড়ে সাত। অর্থাৎ মে মাসেও আমস্টারডামে সেটা ভোর বেলা। পথ-ঘাট ফাঁকা। গাড়িটা ড্রাইভ-ইনে একটা চক্রর মেরে এসে থামল পোর্টিকার তলায়। এখানেও কল-বেল বাজাতে হল না। এগিয়ে এল ভ্যালো। সুপ্রভাত জানালো। এবং সবিনয়ে দেখতে চাইল সেই সনাত্তিকরণ-চিহ্নটা। তারপর বললে, মালিক আপনারদের জন্য ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করছেন।

পুলিস অফিসার দুজন অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই পুনরায় বলে, দয়া করে এই স্বাতন্ত্র্যনায় দুজনে সই করে যাবেন।

ভুকুঞ্চন হল দুজঁর। বললে, পুলিশ-অফিসারদেরও ডিজিটার্স-বুকে সই দিতে হবে?

ও-পাশ থেকে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে গৃহস্বামীর একান্ত সচিব।

সুপ্রভাত জানিয়ে সহাস্য বলে, গতকাল শেষ দর্শনার্থী ছিলেন ফাইন আর্টস মন্ত্রকের সেক্রেটারি।

তাঁর সইটা নিশ্চয় চিনবেন। —স্বাতন্ত্র্যনা মেনে ধরে দেখায়।

দুজঁ হাসল। সই দিয়ে বলে, এতটা সাবধানতার সতিই কি কোন প্রয়োজন আছে? এটা টাঁকশাল অথবা মিলিটারি আর্সেনেল তো নয়!

— তা ঠিক। তবে কি জানেন, এখানে এমন কিছু আছে যা টাঁকশাল পয়দা করতে পারে না। শুধু ধ্বংসই করতে পারে মিলিটারি আর্সেনেল।

—বস্তুটা কী? —দুজঁ কৌতুহল দেখায়।

— অরিজিনাল রাফায়েল, রুবেন্স, রেমব্রান্ট, রেনোয়ঁ!

— অর্থাৎ 'R'-এর অ্যালিটারেশন?

— শুধু ‘R’ নয় স্যার। যে কোন অক্ষরের। ‘R’ এর বদলে ‘M’ বেছে নিলে পাবেন : মিকেলাঞ্জেলো, মানে, মনে, মাতিস্!

বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ে দুর্জ।

অগ্রসর হতে যাবে—পাশ থেকে একান্ত সচিব পুনরায় প্রশ্ন করে, মাশ করবেন ক্যাপ্টেন দুর্জ, কতটা সময় লাগবে আপনাদের? অর্থাৎ মস্যুয়ে মীগেরেঁ ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সারেন, আর সকাল নয়টায় ওঁর একটা ইম্পোর্টেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—কাউন্ট অ্যান্ড কটাসিনা...

দুর্জ হাত-ঘড়িটা এক-নজর দেখে নিয়ে সহকারীকে প্রশ্ন করে, কতটা সময় লাগতে পারে দুমা? দুমা চিবুকটা চুলকে বলল, তিন থেকে চার মিনিট! কী বল?

দুর্জ গভীরভাবে সায় দেয়। সচিবের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, সঠিক হিসাব করা মুশকিল। তবে আমাদের প্রশ্ন একটাই, সেটা শেপ করতে আমাদের লাগবে মিনিট তিনেক, ওঁর জবাব দিতে দশ সেকেন্ড। এখন কতটা ইচ্ছায় কর্ম্য। দেখা যাক।

একান্তসচিব স্মিতহাস্যে বললে, না, না, অত সংক্ষিপ্ত না হলেও বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। আপনারা মিনিট-পনের সময় অনায়াসে নিতে পারেন।

দুর্জ বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, থ্যাঙ্কু স্যার! এতটা সময় দেবেন ভাবতেই পারিনি।

শিতদন্ত নাম : অঁরিকুস্ আন্তোনিয়ুস্ ভাঁ মীগেরেঁ। সংক্ষেপে হান মীগেরেঁ। বয়স বছর-ছাওয়ানো। ছোটখাটো মানুষ। দেখলে বোঝা যায় জীবনে সাফল্যলাভ করেছেন আশাতিরিক্ত। মাথার চুলগুলি দুধ-সাদা। আমস্টার্ডাম শহরের সববিখ্যাত আর্টস্টার তথা আর্ট-কনৌশার তথা আর্টিস্ট। সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্র-ব্যবসায়ী আরও অনেক আছেন, চিত্র সমঝদারও যথেষ্ট—যাঁরা ওঁর চেয়ে নামকরা। ওঁর চেয়ে বিখ্যাত আর্টিস্ট তো কয়েক ডজন। তবু ঐ! তিন-তিনটি গুণের সমন্বয়ে—আরও না-জানি কী কারণে— মীগেরেঁ সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান। তার অর্থ : অর্থ! জীবনে দু-দু-বার ন্যাশনাল লটারির সর্বোচ্চ প্রাইজ পাওয়ার সৌভাগ্য কজনের হয়। মীগেরেঁ এক হল্লর-ফোর্ড ললার্ট-লিখন নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি এখন আমস্টার্ডামের এক ধনকুবের। মীগেরেঁ তাঁর টেবিলে জেড পাথরের ঢাকনি দেওয়া একটা দুর্লভ চুরুট-বাক্স থেকে তুলে নিলেন একটি হাভানা চুরুট। আগন্তুকদের দিকে ঠেলে দিলেন বাক্সটা। চুরুটা ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করেন, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মতো অকিঞ্চনের কাছে কেন? মহান-শিল্পী ভের্মিয়ারের বিষয়ে একাধিক অথরিটি তো আছেন এ শহুরে?

— মানছি, স্যার। তাঁদের দোরেও ধরণা দিয়েছি। প্রয়োজনে আবার যাব। ব্যাপারটা কী জানেন স্যার—‘ভের্মিয়ার’ হচ্ছেন একটি পার্টস্-খোয়া-যাওয়া জিগস্-পাজল। কিছুতেই খাঁজে-খাঁজে মেলে না। একেক-জন এক-এক কথা বলছেন। কোনটা সত্য, কোনটা ভ্রান্ত...

— তা ঠিক, ‘ভের্মিয়ার’ এক মূর্তিমান সমস্যা! সবকিছুই রহস্যময়। কথা সেটা নয়। আমার প্রশ্ন : আপনারা তো পুলিশ? শিল্পী ভের্মিয়ারের পিছনে লেগেছেন কেন? আর তিনি তো প্রায় সাড়ে তিন শ বছর আগেই ফৌৎ হয়েছেন।

ক্যাপ্টেন দুর্জ এতক্ষণে চুরুটের বাক্সটার দিকে নজর দেয়। একটি মহার্ঘ চুরুট তুলে নিয়ে নিশুণ-হাতে ধরাতে ধরাতে বলে, আমরা ঠিক পুলিশ নই, মস্যুয়ে মীগেরেঁ। আমরা নেদারল্যান্ডস্-এর এক প্যারা-মিলিটারী ফোর্স এর অফিসার। যুদ্ধান্তে সংগঠিত ‘অ্যালায়েড আর্ট কমিশন’ এর নির্দেশে

পরিচালিত। আমাদের যুনিটের সেবা বিশ্ব-ললিতকলার স্বার্থে। আপনি তো জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে। নতুন করে সব আবার গড়তে হবে। ঘর-বাড়ি, চার্চ, গ্যাজিয়ার, আর্ট-গ্যালারি। আমাদের যুনিটের কাজ হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখা—নাৎসী সমরনায়কেরা অধিকৃত ইউরোপের কোন্ কোন্ শিল্পসম্পদ অপহরণ করে নিয়ে গেছিল। সেগুলিকে উদ্ধার করা এবং আইনসম্মত মালিককে তা প্রত্যর্পণ করা। ঐ সঙ্গে আমরা খোঁজ করে দেখি, নিজ দেশের জাতীয় সম্পদ কে বা কারা অর্থলোভে ঐ নাৎসী সমরনায়কদের হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। সন্ধান শেলে, প্রমাণ শেলে, আমরা অপরাধীকে দায়রায় সোপর্দ করার চেষ্টা করি। বিচারক বিচারান্তে তার শাস্তিবিধান করেন।

পুনরায় বাধা দিয়ে গৃহস্বামী বলেন, আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন অফিসার! আমি জানতে চাইছি : সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ বেঁড়ে ব্যাটাকে কেন ? হোয়াই ভেরমিয়ার ?

— যেহেতু অতি সম্প্রতি আমরা শিল্পী ভেরমিয়ারের একটি অমূল্য তৈলচিত্র উদ্ধার করেছি। অস্ট্রিয়ায়, অশ্ট-ওসী অঞ্চল থেকে। বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিশের দশকে ছবিটা ছিল হল্যান্ডে। কোনও একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আমরা জানতে চাই—কে ঐ ছবিটার ন্যায্য মালিক ? তাঁকে আমরা তৈলচিত্রটি ফেরত দিতে চাই।

— বলেন কি, মশাই ? কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার করলেন, অথচ তার দাবীদার নেই ?

— কারণ আছে। মালীকানা দাবী করলেই যে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে — কী ভাবে ছবিটা হল্যান্ড থেকে অস্ট্রিয়ায় চলে গেল ! আসল ব্যাপার কী জানেন ? আমরা নিঃসন্দেহ : শেষ-মালিক ছবিখানা একজন কুখ্যাত নাৎসী সমরনায়ককে বিক্রি করেছিল।

— আই সী ! — ছাইদানীতে চুরটের ছাইটা ঝেড়ে বলেন, ভেরমিয়ারের কোন ছবিটা বলুন তো ?

— Adulteress ! পতিতা !

মীগেরেঁ জবাব দিলেন না। দু-চোখ ঝুঁজ হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে পড়েন। দুজঁর সহকারী দুয়ার প্রবেশ ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর : ঐ ছবিখানা আপনি দেখেছেন স্যার ?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মীগেরেঁর। শাস্ত্রস্বরে বললেন, দেখেছি ! চিত্রপটে — যতদূর মনে পড়ছে — চারটি চরিত্র। সামনে নতুনত্র ব্যভিচারিণী। তার মাথায় ঘোমটা, মুখে সলজ্জ কিছু মোহময়ী হাসির আভাস। যীজাস্ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলে ঐ চরিত্রহীনােকে কিছু একটা কথা বলছেন। তাঁর বাঁ-হাত ঐ পতিতার স্বন্ধে। তাঁর নিষ্পাপ মূর্তি করুণাঘন। যীজাস্ এর দু-পাশে দুজন পুলিশ অফিসার। তাদের ডু-ডঙ্গে মনে হয় তারা বিরক্ত। হয়তো যীজাস্-এর ঐ সামন্তনাদানকারী বাম-হস্তের মুদ্রায়। অথবা দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে। ওরা বুঝতে পারছেন না—ঐ তর্জনীটি পতিতার দিকে নির্দেশ করছে না, করছে দর্শকের দিকে। তর্জনী বলতে চায়—পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয় !

দুজঁ জানতে চায়, ঐ তৈলচিত্রটির বর্তমান বাজার-দর কত হতে পারে ?

— বর্তমান বাজারদর আন্দাজ করা মুশকিল। যুদ্ধোত্তরকালে এখনও বাজার স্থিরতা লাভ করেনি। এখনো কোন উল্লেখযোগ্য অক্শানও হয়নি। যতদূর মনে পড়ছে—ছবিটা ষোল-সতের লক্ষ গিল্ডারে (সে আমলে সাত লক্ষ ডলার, বর্তমান হিসাবে প্রায় এগারো লক্ষ ডলার অর্থাৎ দু কোটি টাকায়) প্রথম বিক্রি হয়।

— ঠিকই বলেছেন আপনি। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো আপনার!

মীগরোঁ তৃপ্তির হাসি হাসলেন শুধু।

— শুধু প্রথম বিক্রি কালেই নয় স্যার, যুদ্ধের সময় ঐ দামেই নাংসী সমরনায়কটি ছবিটা কিনেছিল। ঐ সতের লক্ষ গিল্ডারেই! সেই সমরনায়কটি কে জানেন? বর্তমানে যুদ্ধবন্দী এবং সে-আমলে বিশ্বত্রাস অ্যাডল্ফ হিটলারের ডান হাত! স্বয়ং ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিঙ!

মীগরোঁ বিড় বিড় করে কী যেন সাপের মন্ত্র আওড়ালেন। বুকে ক্রুশচিহ্নও আঁকলেন—যেন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের কাছে নাম করা হয়েছে : শয়তানের! দুঁজ বলে, কে কিনেছিল জানা গেছে, কত দামে কিনেছিল তাও জানা গেছে। শুধু জানি না : কে বেচেছিল! অর্থাৎ নানান হাত-বদলের পর কে ছিল ঐ মহান শিল্পসম্পদের শেষ মালিক। সেটার হদিস পেতেই আপনার কাছে আসা। প্রথমে বলুন, ছবিটা আপনি কোথায় দেখেছিলেন—

— কোথায় প্রথম দেখি, সে কথা অ্যাডিন পরে...

— কোথায় প্রথম দেখেন! তার মানে ছবিটা আপনি অনেকবার দেখেছেন?

মীগরোঁ নড়েচড়ে বসেন। বলেন, অফিসার্স! কবে, কোথায়, কতবার দেখেছি তা আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে পুলিশের কাছে জবাববন্দী দিতে হবে সে-কথা তো জানা ছিল না। শিল্পী হিসাবে আমার শুধু মনে আছে—সেটি একটি অনবদ্য ভেরমিয়ার; পার্থক্য শিল্পসৃষ্টি! শিল্প-ব্যবসায়ী হিসাবে মনে আছে—ওটার দাম প্রায় ষোল লক্ষ গিল্ডার। এর বেশি আমার আর কিছু মনে নেই। আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আশা করি আপনাদের ইন্টারভ্যু শেষ হয়েছে?

ক্যাপ্টেন দুঁজ তার সহকারীর দিকে ফিরে বললে, তুমি কী বল? ইন্টারভ্যু শেষ হয়েছে?

লফটানেন্ট দুমা যথারীতি তার চিবুকটা চুলকে নিয়ে বললে, ছবিটার সম্বন্ধে ওঁর যখন আর কিছু মনেই পড়ছে না তখন আর ওঁকে বিরক্ত করে কী লাভ? তবে-ঐ-কী-নাম-যেন? হ্যাঁ, ভেরমিয়ার সম্বন্ধে তোমার যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকে...

ক্যাপ্টেন দুঁজ লুফে নিল কথাটা : ঠিক কথা। ভুলেই গেছিলাম! শিল্পী ভেরমিয়ার সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষেপে কিছু বলুন। বিশ্বলিতকলায় তাঁর কতগুলি চিত্র স্বীকৃত? শিল্পীর জীবিতকালে সেগুলির কী রকম দাম ছিল, ইত্যাদি—

মীগরোঁ আবার স্বাভাবিক হলেন মনে হল। বোধ করি ঐ ‘পতিতা’র আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে। বলেন, সে-বিষয়ে আপনাদের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি বটে। শুনুন :

ভেরমিয়ার ওলন্দাজ শিল্পী (1632-75)। জন্ম দেল্ফৎ-এ। মারা যান তেতাল্লিশ বছর বয়সে।

এর সম্বন্ধে সঠিকভাবে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। এটুকু শুধু জানা যায়—জীবিতকালে তিনি আদৌ স্বীকৃতি পাননি। মৃত্যুর পরে তাঁর হেপাজতে খান-বিশেক ছবি পাওয়া যায়। সবই ‘জেনরি পিকচার’—মানে, মধ্যবিস্ত ডাচ্ গৃহস্থালির ঘরোয়া ছবি। মুদির কাছে, কসাইখানায়, বাড়িওয়ালার কাছে, যে ঋণের বোঝা তিনি রেখে গেছিলেন তাই মেটাতে সরকারের তরফ থেকে ছবিগুলি নিলামে বিক্রয় করা হয়। জলের দামে রাম-শ্যাম-যদু তা কিনে নেয়। কে বা কারা কিনেছিল তার না আছে হদিস, না হিসাব। জনশ্রুতি—শুঁড়িখানার মালিকের পাওনা মেটাতে যখন সরকারী নিলামদার একখানি ভেরমিয়ার তুলে দিলেন তখন লোকটা সর্বসমক্ষে ক্যানভাসটা ফাঁসিয়ে দেয়। বলে, যা গেছে তা তো গেছেই—তার উপর এই নোংরা ছবিখানা

ছয়ে টাঙিয়ে রাখার যত্নশা আমার সইবে না। বলা বাহুল্য, ছবিখানা নষ্ট না করলে সে সারাজীবন ঘন বেচে যা উপার্জন করেছে, তার দশ-বিশ হাজার গুণ অর্থ শেত লোকটার ওয়ারিশবর্গ! তা সে যাই হোক, ভেরমিয়ারের মৃত্যুর পর দশ বছর ধরে তাঁর নানান ছবি বারে বারে বেনামে বিক্রি হয়েছে, অতি অল্প মূল্যে—

— ‘বেনামে’! কেন, বেনামে কেন?

— ছবির মালিক ভেরমিয়ারের স্বাক্ষরটা ঘষে তুলে ফেলেছে। বলতে চেয়েছে এ ছবি তাবোর্গ, দি হু অথবা মেইরির আঁকা!

— ওরঁা কারা?

— ভেরমিয়ারের সমকালীন ডাচ চিত্রশিল্পী। আর্ট স্কুলের ছাত্র ছাড়া যাঁদের নাম আজকের দিনে কেউ জানে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আর্টডীলারের দিনপঞ্জিকার একটি বেদনাবহ অংশ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। হতভাগ্য চিত্রব্যবসায়ী তার ডায়েরিতে লিখে—“আজ জানতে পারলাম, ও-মাসে দি-হুর যে জেনরি-শিক্চারখানা খরিদ করেছি সেটা নকল! আসল চিত্রকর কে-এক হতভাগ্য ভেরমিয়ার! মৃত্যুর পর তার স্বাবর-অস্বাবর যখন নিলাম হয় তখন এই ছবিটা কেউ কিনে নেয়, আর কায়দা করে সেই অখ্যাত ভেরমিয়ারের স্বাক্ষরটা চাপা দিয়ে দি হুর সইটা জাল করেছে! একমুঠো গিল্ডার জলে গেল, তার মানে।” এভাবেই দীর্ঘদিন অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিলেন ভেরমিয়ার। তারপর চাকা ঘুরে গেল! ভেরমিয়ারের ‘রেজারেক্শান’ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে! একজন ফরাসী গবেষক ‘বুর্গে’ ছদ্মনামে প্রমাণ করতে চাইলেন—ভেরমিয়ার একজন অসামান্য চিত্রকর। অধিকাংশই অবশ্য সেকথায় কান দেয়নি। এ ঘটনা গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। ‘বুর্গের’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার ষোল বছর পরেও দেখছি, 1882 সালে পাবলিক অ্যাক্সানে ভেরমিয়ারের একটি অন্যতম স্রোষ্ট চিত্র মাত্র পাঁচশিলিং-এ বিক্রি হয়েছে! ছবিটার নাম : Girl with Pearl Eardrops (যুগ্মকর্ণাভরণশোভিতা)। আজকে তার বাজার-দর কয়েক কোটি গিল্ডার্স। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মতে ভেরমিয়ারের খান-বিশেক ছবি অরিজিনাল।* বাদ বাকি নকল—ওঁর নামে চলে। ভেরমিয়ার সন্দেহে আর কি জানতে চান বলুন?

দুর্জ একই কায়দায় সহকর্মীকে প্রশ্নটা চালান করে দেয় : আর কিছু জানতে চাও?

দুমাও যথারীতি চিবুকে হাত বুলিয়ে জবাব দেয়. নাঃ। তবে এ যে তোমার কী একটা সমস্যাটা আছে. এ যে আর্ট-হিস্ট্রির কেতাবে তুমি সেদিন কী যেন দেখলে...

—ও, হ্যাঁ। —যেন কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে দুর্জের। বললে, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। সেদিন আর্ট-হিস্ট্রির একটা কেতাবে দেখলাম লেখা আছে, ভেরমিয়ারের এ ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানা আপনার সংগ্রহশালায় এককালে ছিল। আপনি সেটা কাকে যেন খেঁচেছেন। তাই নয়?

*ফাইডন-প্রকাশনায় 1967 সালে বলা হয়েছে, সাঁইত্রিশখানি ছবি ভেরমিয়ারের নামে চলে, তার ভিতর ত্রিশটি নিঃসন্দেহে অরিজিনাল। অপরপক্ষে ‘টাইম-বুক’ প্রকাশিত গ্রন্থে এ বছরই বিশেষজ্ঞ বলেছেন ষোলখানি ছবি সন্দেহাতীত ভাবে ভেরমিয়ারের। বাকীটা জাল। বলা বাহুল্য—প্রতিটি চিত্রের মূল্য কয়েক কোটি টাকা।

মীগরোঁ নিমীলিত নয়নে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, হতে পারে। অসম্ভব নয়। খাতাপত্র ঘাঁটলে বলতে পারব। কেন বলুন তো ?

— ব্যাপারটা কী জানেন ? আমরা দু-দুজন চিত্র-ব্যবসায়ীর সম্মান শেয়েছি, যাঁদের হেফাজতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ঐ ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানা ছিল। কার কাছে আগে, কার কাছে পরে তা সঠিক জানা যায়নি। দুজনেই বলেছেন, বোমাবর্ষণে তাঁদের খাতাপত্র সব পুড়ে ছাই হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ঐ দুজনের মধ্যে একজন—যাঁর কাছে ছবিখানা ‘গরে’ ছিল, সেই সেটা গোয়েরিঙকে বিক্রি করে দেয়। আমরা দুজনেরই জবানবন্দি নিয়েছি। দুজনে একই কথা বলছেন। ক-বাবু বলছেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে ছবিখানা কেনেন এবং খ-বাবুকে বিক্রি করে দেন। আর খ-বাবু বলছেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে ছবিখানা কেনেন আর ক-বাবুকে বেচে দেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন : আপনিই আমাদের একমাত্র সমাধান ! তাই আমরা আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। না কি বল দুয়া ?

— হক কথা ! ন্যায় কথা ! তাই আমরা এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। এবার আপনি বলুন স্যার। আপনি ছবিটা কাকে বিক্রি করেছিলেন —ক-বাবু, না খ-বাবু ?

মীগরোঁ নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। বললেন, আর্টহিস্ট্রিতে যদি লেখা থাকে তবে আমার হেফাজতে নিশ্চয়ই ছিল ছবিটা কোন না কোন মময়ে—

— এবং অত দামী ছবির কেনা-বেচার কথা নিশ্চয় লেখা আছে আপনার হিসাবের খাতায় ?

— তা তো থাকারই কথা, যদি না...

— যদি না যুদ্ধকালে আপনার বাড়িতে বোমা পড়ে থাকে। তা কিছু পড়েনি !

লাকটার এই আগবাড়ানো মন্তব্যে মীগরোঁ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। গভীর হয়ে বললেন, আপনারা কাল সকালে এই সময়ে আসবেন। আমি খাতাপত্র দেখে রাখব। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় লেখা আছে—

— মাপ করবেন মস্যুয়ে মীগরোঁ। খবরটা আমাদের আজকেই জানতে হবে। চলুন—কোথায় আপনার খাতাপত্র রাখা আছে, খুঁজবেন চলুন। খোঁজাখুঁজিটা আমাদের উপস্থিতিতে হওয়াই ভাল।

— তার মানে ? কী বলতে চাইছেন আপনি ?

— সহজ সরল ভাষায়—দেবী না করে উঠুন ! এখুনি !

গর্জে ওঠেন মীগরোঁ : কার সঙ্গে কথা বলছেন সেটা খেয়াল রাখবেন মস্যুয়ে অফিসার ! আপনাদের পুলিশ কমিশনার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ! আমার ক্লায়েন্ট ! তা জানেন ?

— জানি, সব জানি। শুধু জানি না—ছবিটা কাকে বেচেছিলেন ! উঁ ? ক-বাবু না খ-বাবু ?

— সে কথা আমি আগেই বলেছি। আপনি কি কালা ? আমার মনে নেই। খাতাপত্র না দেখে—

— রাইট ! খাতাপত্র দেখবেন চলুন। উঠুন ! এখনই ! রাতারাতি কোন হাতসাফাই যেন না হয় !

— শাটাপ্ ! আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনতে পারি, তা জানেন ? কী ভেবেছেন আপনি ? ডি-ভেলডিকে বলে আপনাকে...

দুজঁ যেন পূজা-প্যাণ্ডেলের কেটে যাওয়া গ্রামোফোনের ডিস্ক। একই সুরে, একই মেজাজে বেজে চলে : কাকে বেচেছিলেন বলুন তো ? উঁ ? ক-বাবু না খ-বাবু ?

মীগেরঁ অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। ক্লান্ত বোধ করছেন বৃদ্ধ। পূজা-প্যাণ্ডেলে কি কেউ নেই যে ঐ যন্ত্রটাকে খামিয়ে দেয় ? তারপর সবটা আক্কেশ গিয়ে পড়ল ইলেকট্রিক কলিং-বেলটার উপর। আর্তনাদ করে উঠল সেটা। হুড়মুড় করে ছুটে এল খিদমংগার। মীগেরঁ বলেন, সেক্রেটারি সাব কো বোলাও।

‘বোলাতে’ হল না। একান্তসচিবও ছুটে এসেছে কলিং-বেলের আর্তনাদ শুনে। — আমার দশ বছরের খাতাপত্র এই ঐদের সামনে এনে দাও। ওঁরা একটা সেল-ডীড খুঁজে দেখবেন। তুমি সর্বক্ষণ পাহারা দিও—দেখ, এঁরা যেন রাতারাতি কোন হাতসাফাই না করতে পারেন।

একান্ত-সচিব স্তম্ভিত ! পুলিশ-অফিসার হাত সাফাই করবে !

দুজঁর কোনও ভাবান্তর নেই। বললে, মাপ করবেন মস্যুয়ে মীগেরঁ। আপনি যে স্ট্যান্ডটা নিচ্ছেন সেটা অবিশ্বাস্য ! আপনার নিজেরই স্বীকৃতিমতে গোটা দুনিয়ার ভেরমিয়ারের আঁকা ছবি আছে মাত্র খান বিশ-পঁচিশ। তার ভিতর একখানা—যার বাজার দর আপনার স্বীকৃতিমতে ষোল লক্ষ গিল্ডার— তা যদি দৈবক্রমে আপনার এস্তিয়ারে এসে থাকে এবং আপনি যদি সেটা দশ-বিশ লক্ষ গিল্ডার্সে কাউকে বেচে থাকেন তাহলে ঘটনাটা আপনি ভুলে যেতে পারেন না।

অস্তুত ক্রেতার নামটা আপনার মনে থাকবেই। সুতরাং বলে দিন—ক-বাবু, না খ-বাবু ?

মীগেরঁ আবার গর্জে ওঠেন, আক্ষেপ না মশাই ! আমি টম-ডিক-হ্যারি নই ! বুঝেছেন ? আমি একাধিক ভেরমিয়ার বেঁচেছি ! আমি ..

— জানি স্যার ! ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্সায়ুস’ বেচে দিয়েছিলেন ডক্টর বুনকে, পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার গিল্ডার্সে; ইন্টিরিয়ার উইথ্ ড্রিঙ্কার্স বেচেছেন ঐ ডক্টর বুনকেই। দু লক্ষ বাইশ হাজারে। ‘ইন্টিরিয়ার উইথ্ কার্ড প্লেয়ার্স’ ঐ একই দামে। ‘লাস্ট সাপার’খানা বিক্রি করেছিলেন সর্বোচ্চ মূল্যে : ষোল লক্ষ গিল্ডার্সে ! কেমন ? হয়তো আরও ভেরমিয়ার কেনা-বেচা করেছেন আপনি। আমার ঠিক জানা নেই। সে সব হিসাবে আমার কোন কৌতূহলও নেই। আমার শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন : ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানা আপনি কোন ভাগ্যবানকে বিক্রয় করেছিলেন ? কবে, কত দামে, সে-সব কথাও জানতে চাইছি না আমি — ফলে আপনাকে ইনকাম ট্যাক্স ফাইলও ঘাঁটিতে হবে না। আমার প্রশ্ন শুধু একটি মাত্র ! এবার বলুন মস্যুয়ে মীগেরঁ—কাকে ? উঁ ? ক-বাবু, না খ-বাবু ?

মীগেরঁ তাঁর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলেন গদি-আঁটা চেয়ারে।

বেলা দশটা।

কাউন্ট আর কন্টাসিনা আর্ট-গ্যালারি দেখে ফিরে গেছেন। অ্যাপেয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও আর্ট-ডীলারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি ! তিনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। মীগেরঁর গ্রাসটপ্ টেবিলে তিন কাপ কফি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। কেউ একটি সিপ্ও দেয়নি।

— এবার বলুন মস্যুয়ে মীগেরঁ। কাকে ? উঁ ? ক-বাবু না খ-বাবু ?

— জানি না, জানি না ! আমার মনে নেই ! আমাকে নিষ্কৃতি দিন আপনারা। ইচ্ছে হয় আমার

খাতাপত্র সাচি করে দেখুন।

— আপনি জানেন, জানেন এবং জানেন ! খাতাপত্র ঘেঁটে লাভ নেই। শুধু মুখে বলুন—কাকে ?
এ ‘অ্যাডালটারেস’ খানা ? উ ? ক-বাবু, না খ-বাবু ?

— ওরা দুজনেই মিথ্যাবাদী !

— কারা ?

— এ হোফার আর স্ক্রিভেসান্দে !

— তারা কারা ?

— ড্যাম ইট ! ন্যাকা সাজছেন ! এ আপনার ক-বাবু আর খ-বাবু !

— তবেই দেখুন ! সব কিছুই আপনার মনে আছে। আপনার স্বীকৃতি-মতে ‘ক-বাবু’ হয়ে গেলেন ডক্টর ওয়াশ্টার হোফার, আর ‘খ-বাবু’ স্ক্রিভেসান্দে ! দুজনেই হল্যান্ডের নামকরা আর্ট-ডীলার। এবার বলে দিন—ছবিটা কার কাছে কিনেছিলেন আর কাকে বেচে দিয়েছিলেন ?
উ ? হোফার না স্ক্রিভেসান্দে ?

— জানি না ! আমার মনে নেই। বিশ্বাস করুন।

— লুক হিয়ার মস্যুয়ে মীগেরেঁ। আমরা নিঃসন্দেহ যে, ছবিটা আপনি নিজে গোয়েরিঙকে বিক্রি করেননি। করতে পারেন না। কারণ গোয়েরিঙ যখন অকুশায়েড হল্যান্ডে আসে, এই ছবিগুলো খরিদ করে, তখন আপনি দক্ষিণ ফ্রান্সে। বঙ্ক-বাঁধুনি অ্যালোবান্ট ! সুতরাং শত্রুপক্ষকে ছবিখানা বেচে দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন চার্জ নেই। কিন্তু আপনি যে স্ট্যান্ড নিচ্ছেন তাতে অপরাধীর সহায়ক হিসাবে — অপরাধীকে বাঁচবার চেষ্টার অপরাধে— হয়তো আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব—

— করুন ! তাই করুন ! যান, থানায় ফিরে যান। আমার বডি-ওয়ারেন্ট বার করে আনুন !

দুজ্জ জবাব দিল না। সহকারীর দিকে ফিরে কী যেন ইঙ্গিত করে।

লেফটানেন্ট দুমা নিঃশব্দে বুকপকেট থেকে একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ বের করল। ভাঁজ খুলে গ্রাসটপ্ টেবিলে বিছিয়ে শেপার-ওয়েটে দিয়ে চাপা দিল।

অঁরিকুস্ আন্ডেনিউস্ ভাঁ মীগেরেঁর নামে বিধিবদ্ধ বডি-ওয়ারেন্ট !

মীগেরেঁ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, পরান ! হাতকড়া পরান !

দুজ্জ ধীরেসুস্থে গ্রেপ্তারি পরওয়ানাখানা তুলে বুকপকেটে রেখে দেয়, অনুভূজিতকণ্ঠে বলে, এটা আমার শেষ অন্ত্র। আপনি যদি হোফার অথবা স্ক্রিভেসান্দেকে বাঁচাতে বন্ধপরিকর হন ! কিন্তু এটা প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজনই আমার হবে না— তাই নয় ? আপনি কেন অপরাধীকে বাঁচাতে চাইবেন ? আপনার স্বার্থ কী ? আপনি তো দুষ্টচক্রুর ভিতরে ছিলেন না কোনদিন ? তাহলে ? এবার বলে দিন—প্লীজ ! হোফার না স্ক্রিভেসান্দে ? উ ?

— আমার মনে নেই।

পরদিন। সকাল দশটা।

চব্বিশ ঘণ্টা নাগাড়ে ইটারোগেশান চলেছে। এ সন্ধ্যারে বসেই স্যান্ডুইচ চিবিয়েছে এ দুজন পুলিশ অফিসার আর মীগেরেঁ। সারারাত কেউ দু-চোখের পাতা এক করেনি। মীগেরেঁর পায়ের কাছে পার্শিয়ান কার্পেটে গোটা তিনেক ফুটো হয়েছে। জলন্ত সিগারের স্টাম্প অ্যাশট্রের বদলে

কাপেটে ফেলে পা দিয়ে শিষ্যেছেন বলে। টেবিলের উপর তিনটে খালি বোতল। মীগেরেঁ এই চকিবশ ঘটায় যতবার ইউরিন্যালে গেছেন দুম্বা গেছে পিছন পিছন। একান্তসচিব প্রথম দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন করার পূর্বে অনুমতি নিতে আসছিল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করার পর সে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতোই আগজুকদের ঠেকাচ্ছে। ও-ঘর থেকে টেলিফোন করেও কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। কারণ এ-ঘরে টেলিফোন রিসিভারে নেই। গ্লাসটপ টেবিলে নামানো। একান্ত-সচিব নিজেও সারারাত ঘুমোয়নি। ঘুমায়নি ভালেটও। ও ঘরে দুজন জেগে বসে আছে। এ কী কাণ্ড হচ্ছে পাশের ঘরে? ওরা জানে না। মালিককে শেষবার দেখেছে গতকাল রাত আটটায়। যখন মালিকের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এসে ওঁকে পরীক্ষা করেন। ঔষধ দেন। পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতেই। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, প্লীজ অফিসার্স! এবার আমার পেশেন্টকে ঘুমতে দিন।

— দেব! উনি একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব দিলেই। শব্দটা উচ্চারণ করতে ওঁর...

হঠাৎ সহকর্মীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করে : কতটা সময় লাগতে পারে দুম্বা?

লেফটানেন্ট দুম্বা চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, সাড়ে তিন থেকে চার সেকেন্ড!

ডাক্তারবাবু আগ বাড়িয়ে বলেছিলেন, বুঝেছি! কিছু সেই স্বীকারোক্তি...

— আজে না, ডক্টর! বোঝেননি! আপনি যা ভাবছেন তা নয়! ঐ একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণে ওঁর নিজের কোন বিপদ নেই। পুলিশ কমিশনার লিখিত গ্যারেন্টি দিতে স্বীকৃত—ঐ স্বীকারোক্তি বলে মস্যুয় মীগেরেঁকে কোনদিন কোন আদালতে অভিযুক্ত করা হবে না। আমরা লিখিত স্বীকারোক্তি চাইছিও না। চাইছি একটা খবর—যা উনি জানেন, অথচ বলছেন না। আপনার পেশেন্ট স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণাভোগ করছেন! আত্মনির্ঘাতন! এবার বলুন মস্যুয়ে মীগেরেঁ! আমাদেরও ঘুম পাচ্ছে! বলুন : টুইডলডাম্ না টুইডলডী? উঁ?

ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টা!

— বলুন মস্যুয়ে মীগেরেঁ। অরিজিনাল ভেরমিয়ারখানা ...

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ! মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। সহ্যের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হয়েছে এতক্ষণে। চীৎকার করে উঠলেন : য়ু ফ্লস্! য়ু ঈডিয়টস্! শোন্ গণ্ডমূর্খের দল! আমি জীবনে কোন অরিজিনাল ভেরমিয়ার কিনিনি, বেচিনি! বুঝলি? ...ঐ ‘পতিতা’খানা, ঐ ‘অ্যাডেলটারেস্’খানা ফেক্! নকল! ওটা...ওটা আমি ঐঁকেছি! ভেরমিয়ার অব ডেলফ্ নয়! অঁরিকুস্ অ্যাভেনিউস্ তাঁ মীগেরেঁ! কিছু ঢুকল তোদের মোটা-মাথায়? ভেরমিয়ার তিনশ বছর আগে মরেনি! এতদিনে তার রেজারেকশান হয়েছে! এ প্রজন্মে তার নাম হান মীগেরেঁ! কিছু বুঝলি?

আরও ঘটানেক পরে।

পুলিস-ডাক্তার মীগেরেঁকে পরীক্ষা করে বললেন, ইস্টারোগেশনের প্রচণ্ড মানসিক চাপে ওঁর নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়েছে। উনি এখন ডিলিরিয়াম বন্ধছেন! ওঁর ঘুম হওয়া দরকার!

— ও.কে.! ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়ান—দুজ্ঁ উঠে দাঁড়ায়।

ফেঁচার-বিয়ারার দল ঘরে ঢুকল।

অর্থোদাদ হান তাঁ মীগেরেঁকে ওরা পুলিশের অ্যান্ডুলেন্স ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। আইনানুগ

একান্ত সচিবকে ত্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা সার্ভ করে।

না, মীগেরের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। পুলিশ নিঃসন্দেহ— মীগেরেঁ ঐ ছবিখানা গোয়েরিঙকে বিক্রয় করেননি। গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে মীগেরের কোন যোগাযোগ হয়নি, হওয়া সম্ভবপর নয়! কে বা কারা ছবিখানা গোয়েরিঙকে বেচে দিয়েছিল তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পুলিশ নিঃসন্দেহ, সেই লেনদেনে মীগেরের কোন ভূমিকা নেই। এখন সে ডিলিরিয়ামে আবোল-তাবোল বকছে বটে—কিন্তু এটা সন্দেহাতীত যে, মীগেরেঁ অপরাধীকে বাঁচাতে চায়। কাকে? হোফার না ড্রিডেসান্দে?

তার চেয়েও বড় কথা : কেন?

ওঁকে ত্রেপ্তার করা ছাড়া পুলিশের গত্যন্তর ছিল না!

॥ দুই ॥

স্থান: নাৎসী-বাহিনীর হাত থেকে সদ্য-মুক্ত পারী নগরীর কেন্দ্রস্থলে ‘ফিগারো’ দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর—অর্থাৎ ফরাসী-ভাষায় সব-বিখ্যাত সংবাদপত্র দপ্তরের কেন্দ্রবিন্দু।

কাল: 1.7.1945—অর্থাৎ মীগেরের ত্রেপ্তারের মাসখানেক পরের কথা।

পাত্র : পাত্র নয়, পাত্রী: মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন—অর্থাৎ ফিগারো-পত্রিকার সহকারী আর্ট ডিরেক্টর।

সম্পাদক ডক্টর নিকোলাস লে লোরেনের বয়স যে সত্তর পেরিয়েছে সেটা তাঁকে দেখলে সহজে বোঝা যায় না। চুলগুলি অবশ্য ধ্বংসে সাদা—সেটাও সাম্প্রতিককালের, হয়েছে সদ্যসমাপ্ত বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। চামড়াতেও দেখা দিয়েছে কুঞ্জনরেখা—প্রাচীন তৈলচিত্রের উপর যেন মহাকালের উর্গনভ-আলিম্পন রেখা। কিন্তু এখনো তাঁর মেরুদণ্ড সোজা। কালযুদ্ধ পাড়ি দিয়ে ফিগারো যে সসম্মানে কী করে ঢিকে আছে তা ওঁকে দেখলে বোঝা যায়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় পুরুষ।

আর্ট-ডিরেক্টর ডক্টর সালভাতোর বার্নিনি দু-পুরুষ পূর্বে ছিলেন ইতালিয়ান। এখন উনি ফরাসী নাগরিক+বিশ্ব-ললিতকলার যাবতীয় তথ্য তাঁর নখদর্পণে। মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন বিগতভর্তা। বয়স ত্রিশ। স্বামী ডক্টর শ্যাম্পেন প্রাণ দিয়েছেন পারীর রাস্তার-লড়াইয়ে, নাৎসী বুলেটে। মাদাম এখন একাই থাকেন পারীর শহরতলীতে, একটি এক-কামরার অ্যাপার্টমেন্টে। আধুনিক ডাচ-পেইন্টার্সদের বিষয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন। থিসিস্ শেষ হবার আগেই বেধে গেল বিশ্বযুদ্ধ। বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল সাংবাদিকতার চাকরি। ফিগারো পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে একটি স্তম্ভ লিখে নাম করেছেন। ললিতকলার সমালোচনা।

রাত সাতটা। যুদ্ধবিধ্বস্ত পারী তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেতে চাইছে। প্রতিদিনই রাস্তার এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে সংযোজিত হচ্ছে নতুন সাইন-বোর্ড, নতুন নিয়ন আলোর ঝলকানি। সম্পাদকের ঘরে কিন্তু স্তিমিত আলোক। বোধকরি খাতাকলমে ব্ল্যাক-আউটের অবসান ঘটলেও এঁরা এখনো জোরালো আলোয় অভ্যস্ত হতে পরেননি।

লোরেন বললেন, যে-কথা বলছিলাম—হান ভাঁ মীগেরের উপর একটি সমীক্ষা করতে চাই আমি। তোমরা কাকে দায়িত্ব দিতে চাও বল?

বার্নিনী বললেন, আপনি কিছু স্যার এখনো আমার প্রশ্নটির জবাব দেননি। ভাঁ মীগেরেকৈ কেন এতটা গুরুত্ব দিতে চাইছেন ?

— শোন ! একথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, যুদ্ধকালে নাৎসী সমরনায়কেরা—এ গোয়েরিঙ আর তার সান্সোপাত্তের দল—অধিকৃত যুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বহু শিল্পসম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করেছে। আমরা যদি অবিলম্বে তৎপর না হই তা হলে সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হতে পারে। আমার ধারণা—হোফার-জিভেসান্দে-মীগেরেকৈ চক্র ছিল নেদারল্যান্ডস্ এ এই কালো-বাজারের মূলকেন্দ্র। রাইখ্‌ মুজিয়ামের ইনভেস্টিও যুদ্ধোত্তরকালে করা হয়নি ! অর্থাৎ আমস্টারডামের সেই বিশ্ববন্দিত আর্ট-মুজিয়ামে প্রাকযুদ্ধকালে যেসব ছবি ছিল তার কতগুলি খোয়া গেছে তা পর্যন্ত আমরা জানি না। কে জানে—রেমব্রাণ্ট কিংবা বন্টিচেল্লির কোনও মাস্টারপীস্‌ও ওরা ঐভাবে বেচে দিয়েছে কিনা—

— কিছু ‘অ্যালায়েড-আর্ট’ কমিশানের নির্দেশে নেদারল্যান্ড-পুলিস তো সেটাই তদন্ত করে দেখছে ! ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানার ব্যাপারে মাসখানেক আগে ভাঁ মীগেরেকৈ গ্রেপ্তারও করেছে—

— তুমি বুঝতে পারছনা, বার্নিনী। প্রথম কথা অ্যালায়েড-আর্টকমিশন-এর আর্মি-অফিসারগুলো মাথা-মোটা ! আমি ওদের ‘সাজেস্ট’ করলাম—ওরা ঘোষণা করুক যে, চোরাই মাল যার হেপাজতে আবিষ্কৃত হবে তাকে অভিযুক্ত করা হবে না, বরং পুরস্কৃত করা হবে। ওরা রাজী হল না ! ওদের মতে যে ছবিটা কিনেছে এবং যে বেচেছে তারা দুজনেই সমান অপরাধী। সুতরাং যার হেপাজত থেকে অমন ছবি খুঁজে বার করা হবে তাকেও অভিযুক্ত করা যাবে, যদি না সে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে।

অ্যাগেনেস্‌ আগবাড়িয়ে বলে, কিছু সেটাই তো হওয়া উচিত, স্যার ? দেশের আইন এবং এথিক্স-এর নির্দেশে। তাই নয় ?

বৃদ্ধ অসহায়ের ভঙ্গিতে শ্রাণ্‌ করলেন। বলেন, তোমরা সবাই সমান ! সোজা কথাটা সহজভাবে বুঝবে না ! ফৌজদারী আইন আর মনগড়া ‘এথিক্স’-এর গোলকর্থাধায় পাক খাবে ! শোন বলি ! ধরা যাক পারী যখন নাৎসী অধিকারে ছিল তোমার সঙ্গে একটি জার্মান সোলজারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিংবা সে তোমার প্রতিবেশী ছিল। অ্যালায়েড-আর্মি শহরে প্রবেশ করেছে শুনে সে রাতারাতি জামানিতে পালিয়ে গেল। আর যাবার সময় তোমার কাছে একটি ক্রেটবন্দী ছবি গচ্ছিত রেখে গেল। ধরা যাক, যুদ্ধ শেষে এখন তুমি ক্রেট খুলে দেখছ সেটা দ্য ডিঞ্চির মোনালিসা অথবা রেমব্রাণ্টের ‘নাইট ওয়াচ’ ! যে গচ্ছিত রেখেছিল সে তো মরে ভূত হয়েছে। তুমি তাহলে এখন কী করবে ?

এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্নের কী জবাব দেবে অ্যাগেনেস্‌ বুঝে উঠতে পারে না।

লোরেন নিজে থেকেই বলেন, তুমি অনেক কিছু করতে পার। পুলিশে স্বর দিতে পার, চোরাবাজারে জলের দরে ছবিখানা বেচে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে পার, এমনকি আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে রুদ্ধদ্বারকক্ষে ছবিখানা পুড়িয়েও ফেলতে পার !

অ্যাগেনেস্‌ চাপা আত্নাদ করে ওঠে : পুড়িয়ে ফেলব ? ‘মোনালিসা’ অথবা ‘নাইট ওয়াচ’ !

বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন, আহ-হা ! পাসেনালি নিচ্ছ কেন কথাটা ? তুমি তো এখানে মসৃণে এক্স কিংবা মাদমোয়াজেল ওয়াই ! যদি তুমি ছবিটা চোরাবাজারে বেচে দাও তাহলে তা উদ্ধার করা

আরও কঠিন হয়ে পড়বে। চোরা-বাজারের অঙ্কগলিতেই ক্রমাগত পাক খেতে থাকবে সেটা! গুড়িয়ে ফেললে বিশ্বললিতকলার মহাসর্বনাশ! আর সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে যদি পুলিশের দ্বারস্থ হও তাহলে ‘বাঘ ছুঁলে আঠরো ঘা’! এজাহার দিতে দিতে প্রাণান্ত! তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, ঐ ছবিটি অশহরনের ব্যাপারে তোমার কোনও ভূমিকা ছিল না। পুলিশ তোমার এ-কথা যদি বিশ্বাস না করে, মনে করে—এর মধ্যে তোমারও লভ্যাংশ আছে, তাহলে তোমার খাতাপত্র, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, সেক্স-ডিপজিট লকার, ইনকামট্যাক্স-ফাইল ঘাঁটতে বসবে। নয় কি? বার্নিনী আলোচনাটাকে পুনরায় সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, বেশ, বুঝলাম, আপনি ‘অ্যালায়েড-আর্ট-কমিশনে’র উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কিন্তু একটি সংবাদপত্রের পক্ষে এতবড় ব্যাপারে—

সোজা হয়ে বসলেন লোরেন। বললেন, ভুল বললে ডক্টর বার্নিনী। আমরা সংবাদপত্রের কথা আলোচনা করছি না। আমরা ‘ফিগারো’র কর্মশৃঙ্খলা নির্ধারণ করছি। ফিগারো ‘একটি’ সংবাদপত্র নয়—ফিগারো হচ্ছে, ফিগারো।

ডক্টর বার্নিনী বলেন, বেশ, মানলাম! সে-ক্ষেত্রে আপনি আমাকে অথবা অ্যাগনেসকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? এ কাজ তো গোয়েন্দার। কলা-সমালোচকের নয়! আপনার অধীনে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক আছে যারা দক্ষতার সঙ্গে—

—না! কাজটা শুধু গোয়েন্দার নয়। আথা-গোয়েন্দার আথা-শিল্প-বিশারদের। আমি একটি ডাবল-য়ুনিট টীম তৈরী করতে চাই অধিবৃত্তের আকারে। অর্থাৎ তার দুটি ‘ফোসাই’—একজন গোয়েন্দা সাংবাদিক এবং একজন শিল্পকলা-বিশারদ। এরা একে অপরের পরিপূরক। শেষোক্ত মেসদার হবে অ্যাগনেস। এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য বার্নিনী?

বার্নিনী বলেন, সে ক্ষেত্রে আমি বলব, আপনার নির্বাচন যুক্তিযুক্ত হয়েছে। অ্যাগনেস ডাচ-শিল্প বিষয়েই গবেষণা করছিল। ও বোধহয় হান ভাঁ মীগেরের উপরেও কিছু গবেষণা করেছে। তাই নয় অ্যাগনেস?

অ্যাগনেস গ্রীবাঙ্কালনে সম্মতি জানায়।

বৃদ্ধ সম্পাদক একটি সিগার ধরিয়ে বলেন, তুমি আমাকে সংক্ষেপে বল তো অ্যাগনেস, হান মীগেরের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী?

অ্যাগনেস একটু নড়ে-চড়ে বসে। বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে বলতে থাকে— আধুনিক ডাচ শিল্পে হান ভাঁ মীগেরে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পী নন। জীবনে একবারই তিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন—সেটাও তাঁর কৈশোরে; বস্তৃত ছাত্রজীবনে। তারপর—আমি যতদূর জানি—তিনি কোনও প্রতিযোগিতাতেই কখনও কোনও পুরস্কার পাননি। কোনও উল্লেখযোগ্য ছবিও আঁকেননি। তবু আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম একটা-না, তিন-তিনটে অত্যার্চ ‘কোয়েন্ডিডেল’ লক্ষ্য করে। কাকতালীয় ঘটনা অবশ্য যে-কোন লোকের জীবনেই ঘটতে পারে; কিন্তু যদি লক্ষ্য করে দেখি, কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির জীবনে ‘মিলিয়ান-টু-ওয়ান’ চ্যাম্প-এর কাকতালীয় ঘটনা ক্রমাগত ঘটেছে...

— মিলিয়ান-টু-ওয়ান চ্যাম্প! তিন-তিন বার? কী সেগুলি?

— প্রথম কথা, উনি জীবনে দু-দুবার ন্যাশনাল লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়ে দুবারই বেশ কয়েক লক্ষ গিল্ডার্স উপার্জন করেন! আমার তো অল্প বয়স, আপনি স্যার আপনার দীর্ঘ

জীবনে এমন কোনো লোকের কথা শুনেছেন যে-ব্যক্তি জীবনে দু-দুবার ন্যাশনাল লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে?

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। বলেন, ঠিক কী কথা বলতে চাইছি তুমি?

— দুটি বিকল্প সম্ভাবনা। এক : মীগেরঁ এক ক্ষণজন্মার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন। এমন সৌভাগ্য শতাব্দীতে একজনের হয় কি না সন্দেহ! অর্থাৎ জীবনে দু-দুবার জাতীয় লটারীর প্রথম পুরস্কার পাওয়া। দুই : উনি আদৌ কোনও পুরস্কার পাননি। অর্থাৎ লটারিতে। পেয়েছেন একটা গুপ্তধন! যার কথা উনি দুনিয়াকে জানাতে চান না, জানাতে পারেন না। তাই নিজেই ঐ পুরস্কারপ্রাপ্তির কথাটা রটনা করেছেন!

বার্নিনী মাথা নেড়ে বলেন, যুক্তিসূর্ণ কথা। তুমি কি খোঁজ নিয়েছিলে সরকারী ন্যাশনাল লটারীর অফিসে?

— হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। কোনও হদিস করতে পারিনি। একক প্রচেষ্টায় আমি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি। তাছাড়া ঐ সময়েই হিটলার শোভাসভা আক্রমণ করে বসল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লোরেন বলেন, তুমি তিন-তিনটি কাকতালীয় ঘটনার উল্লেখ করেছিলে। দুটো তো লটারী। তৃতীয়টা?

— তৃতীয়টা হচ্ছেন ভেরমিয়ার!

— ভেরমিয়ার? মানে?

— ডক্টর বার্নিনী আমাকে সংশোধন করে দেবেন, আমি যদি কিছু ভুল বলি। ভেরমিয়ার মারা যান 1675 খ্রীস্টাব্দে। প্রথম দুশ বছর কেউ তাঁকে চিনত না, তাঁর নামই শোনেনি। ভেরমিয়ারকে বস্তুত আবিষ্কার করলেন বুর্গ, 1866 খ্রীস্টাব্দে। তারপর সেই 1866 থেকে 1936 এই দীর্ঘ সত্তর বছরের ভিতর মাত্র খান-পাঁচিশ অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। কারণ মতে বিশখানি, কারণ মতে ত্রিশখানি। প্রত্যেকটি চিত্রের বিষয়বস্তু ‘জেন্নি-পিকচার’

— হল্যান্ডের মধ্যবিস্তৃত গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। প্রত্যেকটির মূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। এগুলি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি খুঁজে পেয়েছেন। এখেল থেকে লন্ডন, মাদ্রিদ থেকে স্টকহলম। এবং যাঁরা তৈল-চিত্রগুলি উদ্ধার করেছেন তাঁরা ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন পরিবেশের মানুষ। আর তার পরেই একটা অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা—1937 থেকে 1943—মাত্র ছয় বছরে যুদ্ধবাস্তব পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল নয়খানি ভেরমিয়ার—বছরে গড়ে দেড়খানি করে!

— আশ্চর্য! —বৃদ্ধ বলে ওঠেন নিজের অজ্ঞাতেই।

— না স্যার! তুরুরের টেক্সানি আমি এখনও দাখিল করিনি!

— তুরুরের টেক্সা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ নয়খানি ছবিই পাওয়া গেল যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সে! এবং দেখা যাচ্ছে ঐ নয়খানি ছবির প্রত্যেকখানি কোন-না-কোন এক সময়ে ছিল হান ভাঁ মীগেরঁর সংগ্রহশালায়।

— ‘কোনো-না কোন এক সময়ে’ মানে?

— একক প্রচেষ্টায় আমি খুব বিস্তারিত সন্ধান নিতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি, নয়খানির মধ্যে অন্তত পাঁচখানি ছবির আবিষ্কর্তা হান ভাঁ মীগেরঁ স্বয়ং। তিনিই সেগুলি অখ্যাত অজ্ঞাত কোনও অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে উপহার দিয়েছেন বিশ্বললিতকলাকে!

বার্নিনী বলেন, আশ্চর্য! তাই নাকি?

বুদ্ধ লোরেন কিছু এবার অন্য কথা বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো অ্যাগনেস্? তুমি নিজেই বলেছ—হান ভাঁ মীগেরেঁ বর্তমান ডাচ-শিল্পীদের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও নন। সেক্ষেত্রে তুমি তাঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লে কেন? মীগেরেঁ সম্বন্ধে তুমি এমন সব তথ্য এখন দাখিল করছ যাতে বার্নিনীর মতো আর্ট কনোশার পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন! এর মানে কী?

অ্যাগনেস্ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে তার কৈফিয়ৎ : আমার সে-সময়ে সন্দেহ হয়েছিল মিস্টার মীগেরেঁ কোন একজন মধ্যযুগীয় ধনকুবেরের একটি চিত্রশালার সন্ধান পেয়েছেন! সেখানেই সঞ্চিত হয়ে ছিল ঐ অনবদ্য ভেরমিয়ারগুলি, কয়েক শতাব্দী আগে। তিনি সেই ভূগর্ভস্থ চিত্রশালা থেকে একের-পর একটি চিত্র উদ্ধার করে আনছেন—দু-এক বছর সময়ের ব্যবধানে। গড়ে বছরে দেড়খানি করে! সত্য কথাটা তিনি বলতে পারছেন না— কারণ হয়তো সেই মধ্যযুগীয় ধনকুবের একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। নামটা জানাজানি হলে তাঁর অধঃস্তন পুরুষেরা ছবিগুলির মালিকানা দাবী করে বসবে। অথবা সব কিছু জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য করা হবে।

বুদ্ধ ইজ্জিচোয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, তুমি যা বললে তা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে এতবড় খবরটা তুমি এতদিন গোপন রেখেছিলেন কেন বল তো?

— প্রথম কথা যুদ্ধের ডামাডোলে এ খবরটা আদৌ কোনও গুরুত্ব পেত না। দ্বিতীয়ত—আমি আমার সন্দেহের কথা বন্ধে খুলে বলেছিলাম। সে আমাকে মন্ত্রণাগুলির পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, যুদ্ধ মিটে গেলে—ঐ গোপন চিত্রশালার গুপ্তধন আমরা যৌথভাবে খুঁজে বার করব। তারপর বেচারি ববু, স্ট্রীট ফাইটিং-এ..

— আই নো, আই নো! শোন অ্যাগনেস্! তাহলে সে কাজটা শেষ করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তুমি কি একজন পুরুষ সহকারী চাও? আমি তোমাকেই ঐ ‘অপারেশন মিসিং ভেরমিয়ার’-এর দায়িত্বটা দিতে চাই।

বার্নিনী বলেন, কিন্তু মীগেরেঁ তো এখন আমস্টারডামের জেল হাজতে?

— তাতে কী? আমরা তো মীগেরেঁকে খুঁজছি না! আমরা খুঁজছি সেই টুটেনখামেনের ক্যাটাকুস্টা—সেই যেখানে ভূগর্ভস্থ সংগ্রহশালায় ধরে ধরে সাজানো আছে নানান শিল্পসম্পদ! অ্যাগনেস্, তুমি বরং আমাকে সংক্ষেপে বলতো—হান ভাঁ মীগেরেঁর জীবনটা। মানে যেটুকু তুমি জেনেছ।

অ্যাগনেস্ বললে, আমার নোটবই দেখে সঠিক বলতে পারব। তবে মোটামুটি কথা আমার মনেই আছে। শুনুন : হান ভাঁ মীগেরেঁর জন্মস্থান হচ্ছে ডেভেন্ডার—বিখ্যাত ডাচ শিল্পী তাবোর্গ-এর জন্মস্থলে। আমস্টারডাম থেকে আশি কিলোমিটার পূর্ব দিকে। ওঁর জন্ম 1889 সালে।

বাধা দিয়ে বুদ্ধ সম্পাদক বলে ওঠেন, ফর য়োর ইনফরমেশন অ্যাগনেস্ : বছরটা ক্ষণজন্মাদের! ঐ বছরই জন্মেছিল অ্যাডল্ফ হিটলার, জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। যা হোক, তারপর?

— ওঁর বাবা অঁরিকুস্ মীগেরেঁ ছিলেন কড়া স্কুলমাস্টার। আঁক কষার বদলে ছেলে ছবি আঁকছে শুনলে তাকে ধরে পিটিতেন। হান-ভাঁ তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকত। সৌভাগ্য, ওঁর মা প্রাকবিবাহ জীবনে গান গেয়ে উপার্জন করতেন, ছবি আঁকতেন। জন্মগত সূত্রে মীগেরেঁ যদি ললিতকলার দিকে ঝুঁকে থাকেন, তবে সেটা তাঁর মায়ের কল্যাণে। বাৎসরিক সঞ্চে বস্তুত ঝগড়া

করে হান ভর্তি হয়েছিলেন দৈন্যং বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্য বিষয়ে ডিগ্রি নিতে। পাশ করে বেরিয়ে আসার আগে ছাত্রজীবনেই তিনি একটি দুর্লভ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর অন্তর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হত। পাঁচ বছরের বাছাই করা শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হত। হান মীগেরেঁ সেই দুর্লভ প্রাইজটা পেয়েছিলেন। তিনি কী ঐকেন্সে ত্যাগ করেছিলেন—

ডক্টর বার্নিনী বলেন, আমি জানি—। উনি ঐকেন্সে রটাডার্মের একটি গীজার নিসর্গ-চিত্র। পরে সেটি একশ পাউন্ডে বিক্রি হয়ে যায়।

— তা হবে। তা সে যাই হোক, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে হান একটি ছাত্রীর প্রেমে পড়েন। অনতিকালে পরেই বাচ্চীটি গর্ভবতী হয়ে পড়ায় হান তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে—1913 সালে। এজন্য বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। হান বাধ্য হয়ে কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে রোজগারের নানান খান্দা দেখতে থাকেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কোন বিদ্যা জানা নেই। অথচ ওঁর ছবি বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন হান মীগেরেঁ। ক্রমে সেই জীবন গর্ভে ওর দুটি সন্তান জন্মায়। প্রথমটি পুত্রসন্তান, দ্বিতীয়টি কন্যা। তারপর এগারো বছর বিবাহিত জীবনান্তে ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। হেতুটি মমাসিক—হান ইতিমধ্যে ‘জো’-র প্রেমে পড়েছেন! ‘ইতিমধ্যে’ মানে প্রায় আট বছর আগে। জোহান—বিবাহিত। ‘জো’ সেই আট বছর ধরে ছিল হান মীগেরেঁর ‘মিস্টেস্’! প্রথমা পত্নীর চোখের আড়ালে। সে যাই হোক, প্রথমা জীবন সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে হান যখন ঐ জোহানকে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। প্রথমা জীবন অ্যানা মীগেরেঁ হতাশায় ভেঙে পড়েন। তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নাবালক পুত্র-কন্যাকে নিয়ে ডাচ উপনিবেশ—‘ডাচ-ইস্ট-ইন্ডিজ’-এ চলে যান। দ্বিতীয়া জীবন জোহানার গর্ভে মীগেরেঁর কোনও সন্তানাদি হয়নি। 1916 সালে হান মীগেরেঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল—প্রথম ও শেষ। তখন তিনি সাতাশ বছরের নওজোয়ান। সংসারে জীবন অ্যানা আর দুটি সন্তান। হান প্রচুর স্বরচনা করে, বস্তুত সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে এই একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আশা করেছিলেন, প্রদর্শনীতে বহু ছবি বিক্রি হবে। হল না। আশা ছিল—ঐ প্রদর্শনীতে হান চিত্রশিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। তাও শেলেন না। সংবাদিকেরা সকলেই মুখ ফিরিয়ে রইল।

আমস্টারডামের নামকরা কোন চিত্রসমালোচক প্রদর্শনী দেখতে আসেননি আদৌ।

ডক্টর বার্নিনী ওকে সংশোধন করে বলেন, না, ‘কেউই আসেননি’ বলাটা তোমার ঠিক হল না অ্যাগনেস্।

— হয় তো হল না। অঙ্কের হিসাবে তখন আমার বয়স এক বছর। প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমি কিছুই জানি না—যা শুনেছি...

— পাদঁ শ্যাম্পেন! তাহলে আমার কাছে ঐ অধ্যায়টুকু শুনে নাও। কারণ আমি সেই একক-প্রদর্শনীর নিমন্ত্রিত দর্শক ছিলাম। আমি উপস্থিত ছিলাম!

— রিয়েলি? বলুন তাহলে, আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে কী জানেন?

— মীগেরেঁর সঙ্গে সে-আমলে আমার পরিচয় ছিল না। ওর নামই শুনিনি। আমি নিজেও তখন শিল্প-সমালোচক হিসাবে খুব কিছু পরিচিত নই। তবু ওর নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছিলাম। মীগেরেঁ

বোধকরি আমার চেয়ে বছর ছয়-সাতের ছোট হবে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—ও সর্বস্ব পণ করে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। মীগেরেঁ আর তার প্রথমা স্ত্রী : অ্যানা। অখচ নামকরা চিত্রশিল্পী, সমালোচক, সাংবাদিকেরা বিশেষ কেউ আসেননি। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। উদীয়মান কোন শিল্পীর প্রতি এ জাতীয় উপেক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমালোচরা আদৌ বিরত হন না। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না—সে ছোকরা কী-ভাবে ঘড়ি-আংটি বন্ধক দিয়ে ‘হল’-ভাড়া মিটিয়েছে; নিমন্ত্রণপত্র ছেপেছে, বাড়ি-বাড়ি চিঠি বিলি করেছে। ছবিগুলো কী জাতের ছিল তা আজ আর মনে নেই, কিন্তু একটা ঘটনার কথা মনে আছে। প্রদর্শনীর শেষ দিনে মীগেরেঁ মরিয়া হয়ে ধরে এনেছিল ডক্টর ব্রেডিউস্কে। তুমি তো জানই, ডক্টর ব্রেডিউস্ সমগ্র হল্যান্ডের সর্ববিখ্যাত কলাসমালোচক। তিনি যদি ‘ভিজিটার্স বুক’-এ দু একটি ভাল মন্তব্য করে যান তাহলে ঐ নিঃস্ব শিল্পী একটা আশার আলোক দেখতে পায়। সেই বিশ্বাসেই মীগেরেঁ ঝুঁকে প্রায় পাকড়াও করে ধরে এনেছিল। আমি তখন প্রদর্শনীক্ষেপে হাজির। ডক্টর ব্রেডিউস্ ছবিগুলো ভাল করে দেখলেনও না। এক নজর চোখ বুলিয়েই বলে উঠলেন, ‘এসব ছবি দেখাতে তুমি আমাকে গাড়িতাড়া করে ধরে এনেছ? শোন বাপু, সোজা কথা বলি—সকলের পক্ষে সব কাজ হয়না। তোমার দ্বারা ছবি আঁকা হবে না। রাগ কর না। এটা ভবিতব্য। ভগবান কাউকে সে ক্ষমতা দেন, কাউকে দেন না। তোমার এখনো বয়স আছে, অন্য কোন প্রফেশনে নেমে পড় বরং...’ আমার স্পষ্ট মনে আছে মীগেরেঁ চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কে একজন মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ওঠেন, ‘সত্য-কথা কিছু মিষ্টি করেও বলা যায় ডক্টর ব্রেডিউস্!’ কে বলেছিলেন মনে নেই, কিন্তু তিনিও একজন নামকরা চিত্র সমালোচক—একেবারে ব্রেডিউস্-এর পর্যায়ে আর্টকনোশার না হলেও। বোধহয় ডক্টর ব্রুন। সে যাহোক, আমার এ-কথাও মনে আছে—ডক্টর ব্রেডিউস্ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘সেটা ঐ ছোকরার বদ-হজম ঘটাবে শুধু! মিষ্টি-কথায় ভুলে আরও পাঁচ-সাত বছর আলেয়ার পিছনে ছুটবে—তখন আর কেরানি কিংবা মটোর মেকানিক হবার বয়স আর ওর থাকবে না!’

বৃদ্ধ লোরেন বলেন, অত বিস্তারিত আমাদের না শুনলেও চলবে। মীগেরেঁর জীবনের ঘটনা তারপর কী জান, বল?

অ্যাগনেস্ আবার তার কাহিনীর সূত্র তুলে নেয় : ওঁর প্রথমা পত্নী অ্যানা, ডাচ-ইন্ডিজ-এ চলে গেলেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। জোহানা এরপর বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে। এখন আর কোন বাধা নেই। হান মীগেরেঁ অতঃপর জোহানাকে বিবাহ করেন। আমি যতদূর জানি, জোহানার কোন সন্তানাদি হয়নি—না প্রথম বিবাহের ফলে, না মীগেরেঁকে বিবাহ করায়। মোট কথা জোহানাকে বিবাহ করার পর মীগেরেঁ হল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। এসে আশ্রয় নেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। রোকেব্রুন-এ। সেখানে থাকতেই নাকি তিনি পর পর দুবার লটারির টিকিটে হঠাৎ ধনকুবের হয়ে যান। এর পর থেকে তাঁর জীবন কুয়াশা ঢাকা। তাঁর বাড়ির সামনে ফটকে বন্দুকধারী দ্বারপাল, ভিতরে ভ্যালো, প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাহিরে বাগানে চেন-খোলা ব্লাড-হাউন্ড। আর প্রবেশপথে বড় বড় হরফে লেখা : কুকুর হইতে সাবধান।

লোরেন বলেন, এবং তোমার হিসাব মতো মীগেরেঁ যে সময় দক্ষিণ ফ্রান্সে এসে অজ্ঞাতবাস শুরু করেন তার পর থেকেই বিশ্বললিতকলায় পরপর নয়খানি ‘ভেরমিয়ার’ আবিষ্কৃত হয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যার তিন-চারখানির আবিষ্কারকর্তা স্বয়ং হান তাঁ মীগেরেঁ!

— বুঝলাম ! তুমি তৈরী হয়ে নাও অ্যাগনেস্। দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমস্টারডামে যেতে হবে। মীগেরের ইন্টারভিউ নিতে।

— কিন্তু সে তো এখন জেল হাজতে ? — পুনরায় বলেন ডক্টর বার্নিনী।

— তাতে কী ? আমস্টারডামের পুলিশ কমিশনার ডি-ভেলডি আমার পরিচিত। আমার অনুরোধ সে এড়াতে পারবে না। ফিগারোকেকে সে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নিতে দেবে।

আসর ভেঙে গেল।

॥ তিন ॥

আঠাশে মে থেকে বারই জুলাই—কম দিন নয়। পাক্সা দেড় মাস পুলিশ-হাজতে লড়াই করেছে সে। তারপর ও ভেঙে পড়ল। আদ্যন্ত স্বীকার করল তার প্রবঞ্চনার ইতিহাস।

জেলখানার নির্জন পরিবেশে এই দেড়মাসে মীগেরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। বছর-দুই আগে তেতাল্লিশ সালে জোহানার সঙ্গে ওর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। নাহলে এই নিঃসঙ্গতার ভাগ নিতে সে হতভাগী নিশ্চয় ছুটে আসত। অন্তত ভিজিটিং আওয়ার্শে লোহার জালতির ওপাশে এসে দাঁড়াতে জোহানা। চৌদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন—তার আগেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দুজনের, অ্যানার চোখের আড়ালে। আচ্ছা, জো কি জানে খবরটা ? ওর এই বন্দী হবার দুঃসংবাদটা ? নিশ্চয় জানে। মীগেরের ত্রেপ্তার হবার খবর তো সবকটা কাগজ ফলাও করে ছেপেছে। পুলিশ বিখ্যাত আর্ট ডীলার হান ভাঁ মীগেরের উপর মানসিক অত্যাচার করে প্রমাণ করতে চাইছে একটা দুষ্টিচক্রের অস্তিত্ব—যারা যুদ্ধকালে শত্রুশক্তিকে জাতীয় সম্পদ বিক্রয় করে দিয়েছে। সংবাদপত্রের কাছে খবরটা মুখরোচক; তাই নানান সাংবাদিক ওস্তাদ নানান যুক্তিতর্ক শেখ করে কাগজের পাতা ভরাচ্ছেন। জোহানার কি তা নজরে পড়নি ? মীগেরে নিজে ছাড়া একমাত্র সেই হতভাগীই হয়তো জানে — ও অভিযোগ একেবারে ফাঁকা বুলি ! গোয়েরিঙ বা তা দলবলের কাছে যদি কোন হতভাগা কোনও বিখ্যাত ছবি বিক্রয় করে থাকে, তবে তা মীগেরের জালিয়াতে হয়নি, হতে পারে না। কারণ জার্মান-অধিকারের অনেক আগেই মীগেরে সঙ্গীক সেরে গিয়েছিল দক্ষিণ-ফ্রান্সে। অথচ মূর্খ পুলিশগুলো ওকেই আঁকড়ে ধরে দুষ্টিচক্রটার সন্ধান করতে চাইছে। জোহানা খবরের কাগজ পড়ে, সব কিছুই সে জানতে পেরেছে। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কারণ এই পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র জোহানাই বোধকরি জানে ওর সত্য পরিচয় !

‘সত্য পরিচয়’ ?

না। সেটা মীগেরের ‘সত্য পরিচয়’ নয়। সেটাও তার মিথ্যা পরিচয় ! যদিও সেটা তার গোপন কথা। হান ভাঁ মীগেরের অন্তরে যে বেদনা, যে প্রকাশের যন্ত্রণা, যে বিদ্রোহ — তার খবর জোহানা কোনদিন পায়নি। সে ‘সত্য পরিচয়’ পাওয়ার চেষ্টাই করেনি জোহানা। কেমন করে করবে ? সে যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মনের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী ছিল বিপরীত মেরুর বাসিন্দা ! জোহানা ছিল ‘এগোইস্টিক হেডোনিজম’-এর শিকার—আত্মকেন্দ্রিক সুখসন্ধানী। জীবন-যৌবন দ্রুত ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে—যা পার কুড়িয়ে নাও। ভোগ কর; আনন্দ কর ! আর মীগেরের অন্তরে ছিল একটা প্রকাশের যন্ত্রণা ! সে ‘সুন্দর’-কে খুঁজেছে, ‘সত্য’-কে খুঁজেছে, এবং ‘শিব’-কেও। এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগত-প্রপঞ্চে সে যে আনন্দেরস আন্বাদন করেছে তার কথা মীগেরে

উত্তরকালকে শোনাতে চেয়েছে। ক্যানভাসের উপর তুলির টানে। ওরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। ঐ 'ওরা' ! তথাকথিত আর্ট-কনৌশার-এর দল ! শিল্পবোদ্ধার দল ! শিল্প-বুদ্ধির দল ! জো বুঝতে পারেনি শিল্পীর এই প্রকাশের যন্ত্রণার কথা। সে শুধু বুঝছিল যে, মীগের্ণে এ সামল্যের বোঝা আর বইতে পারছে না, পারবে না। ধরা মীগের্ণে পড়েনি—কোনও পণ্ডিত-মূর্খই বুঝতে পারেনি মীগের্ণের হস্তলাঘবতার কথা। দুনিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল শিল্পী—ঐ তথাকথিত আর্ট-কনৌশারদের বিরুদ্ধে, আর যে মূর্খ সাধারণ মানুষ ওদের মাথায় তুলে নাচে তাঁদের বিরুদ্ধে। জিতেছিল। কিন্তু জয়ের ঐ স্বর্ণমুকুটের ভার আর যেন বইতে পারছিল না। একটা মানসিক দ্বন্দ্ব সে ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধিমত্তী জোহানা শিল্পীর যন্ত্রণার হেতুটা প্রণিধান না করলেও পরিণামটাও আন্দাজ করেছিল। তাই-সময় থাকতে সে সরে গেছে। সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে শিল্পীর সঙ্গে—সে ভেঙে পড়ার আগেই। ভালই করেছে ! আহা, সে সুখে থাক ! জোহানা যত বড় আত্মকেন্দ্রিক সুখসন্ধানীই হোক না কেন, সে সম্ভানে মীগের্ণের সর্বনাশ করবে না। আত্মগোপন করে থাকবে বরাবর। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে সংবাদপত্রে ওর বিচারের বিবরণ। কিন্তু কোথায় আছে সে এখন ? জুরিখ্ ? না কি ভিয়েনা ? যেখানে ব্যাঙ্কে রাখা আছে ওর ভাগের-ভাগ ? স্বামীর উপার্জনের একটা বিরাট অংশ—পাঁচ না ছয় শূন্য-ওয়ালা সুইস্-ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই।

না, জোহানার কথা ও ভাববে না আজ। বরং আজ বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে ওর প্রথম-প্রেমের কথা। অ্যানার মুখখানা। অ্যানা ! পরিণত যৌবনা, দুই-সন্তানের জননী ওর প্রথমা স্ত্রী নয়, —বেণীদোলানো কিশোরী অ্যানা ! স্কুলের ছাত্রী ! যখন সে ওর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল সংসারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে !

অ্যানা কি আজও বেঁচে আছে ? সুমাত্রাতে ? মীগের্ণে জানে না। বহুদিন তার কোন খোঁজ খবর পায়নি। আর তার সেই দুটি সন্তান ? একমাথা সোনালীচুল-ওয়ালা জ্যাক আর আর ফুলের মত ফুটফুটে ঈনেভ ? বাঃ ! শুধু অ্যানার সন্তান হবে কেন তারা ? ওরা দুটি তো হান ভাঁ মীগের্ণেরও সন্তান ! ভারী ইচ্ছে করছিল আজ তাদের দেখতে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে তাদের কাছে ক্ষমাসুন্দর বিদায় চেয়ে নিতে। 'সলিটারী প্রিজন্'—এ অতীত জীবনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

ওর বাবা অরিকুস্ মীগের্ণে ছিলেন কড়া ইস্তিমাস্টার। ওলন্দাজ ছাত্রদের ইংরাজি, অঙ্ক আর ইতিহাস পড়াতেন। দু-চারখানা স্কুলশাঠ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। কড়া মেজাজের লোক ; শুধু স্কুলে নয়, সংসারের চৌহদ্দিতেও তাঁর কড়াশাসন অব্যাহত। এমনকি ওর মা মাদাম অগুস্তাও ভয় করে চলতেন স্বামীকে। মা ছিলেন বাবার চেয়ে চৌদ্দ বছর ছোট। অরিকুস্ কাঠখেট্টা, প্র্যাগম্যাটিক—সুকুমার শিল্প তার সহিত না। গান-বাজনায় তার অরুচি, চিত্র-ভাস্কর্য তার মতে পণ্ড্রম আর কবিতা লেখা—ন্যাকামি ! অথচ ওর মা— অগুস্তা—প্রাকবিবাহ জীবনে গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন। স্বামীর ঘর করতে আসার পর অবশ্য সে সব বাতিক চাপা পড়ে গেছিল। যাবে না ? একের পর এক সন্তান এসেছে যে তাঁর কোলে। হান ছিল পাঁচ ভাইবোনের মাঝের জন।

ছেলেবেলা থেকেই হানের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। যা দেখে তাই আঁকে। শেনসিল আর পেন-অ্যান্ড-ইংক স্কেচ। আট-নয় বছর বয়সে সে সুন্দর-সুন্দর ছবি আঁকেছে। বাপ দেখতে

শেলেই ছিড়ে ফেলত। আর অশুস্তা তার স্বামীকে লুকিয়ে ওকে যোগান দিত রঙ-তুলি-কাগজ !
 কুলে ভর্তি হল। ছাত্র ভালই— সব চেয়ে বেশি নম্বর শেত ডুইং পরীক্ষায়। বাপ খান্না, মা
 খুশি। বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—রীতিমত ঝগড়াঝাঁটি করে অশুস্তা ওকে ভর্তি করে দিল ডুইংস্কুলে।
 টিউশিয়নের শুরু হলেন কোতেলিঙ। তাঁর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠল অচিরে।

আঠারো বছর বয়সে দেলফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল স্থাপত্য-বিষয়ে ডিগ্রি নিতে। এখানে সে
 একটি দুর্লভ পুরস্কার পায়। শিল্পী হিসাবে এটা ওর জীবনে প্রথম স্বীকৃতি—শেষ স্বীকৃতিও
 ষটে। না, সোনার পদকটার কথা ও ভাবছে না আজ—সেটা তো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেউ
 না কেউ পায়। ও ভাবছে সোনার-বরণ মেয়েটির কথা !

ও প্রথম পুরস্কার পাওয়াতে সহপাঠীরা ওকে কাঁধে তুলে নেচেছিল। অরিকুস্-এর কোন ভাবান্তর
 নেই—ছবি-আঁকায় প্রথম হওয়া তার কাছে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়। বরং উচ্ছ্বসিত
 হয়েছিল অশুস্তা—পুত্রের সাফল্য। সে রাত্রে নিজে হাতে কেক বানিয়েছিল। খাইয়েছিল ওর
 বন্ধুবান্ধব, সহপাঠীদের।

পরদিন সাইকেলে চেষ্টা করে যাবে, গেটের কাছে পথের মাঝে ওকে রুখল একটি মেয়ে।

—পার্বী! গতকাল আপনিই ঐ গীজার ছবিখানাতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন, নয় ?

হান সাইকেল থেকে নামেনি। একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে গতিরোধ করেছে শুধু। তাকিয়ে দেখল
 সে মেয়েটিকে। বছর আঠারো বয়স, পুরস্কৃত দেহের জন্য কিছু বেশি মনে হয়। ঘন নীল চোখ
 আর সোনা-গলানো এক মাথা চুল। কিন্তু চুলের বাহার অথবা চোখের নীলিমা কোন তরুণীকে
 এমন দুঃসাহসিকা করে তোলে না। হান বলে, হ্যাঁ, সেটা কি আমার অপরাধ ?

—না অপরাধ হবে কেন ? অনেকেই ও জাতীয় ‘গিমিক’ করে থাকে !

—‘গিমিক’ ! মানে ?

—আমি জানতে চাইছি গীজটি কোন শিল্পীর নকল ? দি হু, না তাবোর্গ ?

হান স্তম্ভিত হয়ে গেল মেয়েটির স্পর্ধায়। বললে, আপনিও বুঝে কম্পিট করেছিলেন ? সাদৃশ্য
 পুরস্কারও পাননি ?

—না ! আমি ছবি আঁকি না। তবে ছবি দেখি, ছবি বুঝি। আমার বেশ মনে পড়ছে, ঐ গীজার
 ছবিখানি আমি অন্যত্র দেখেছি। কার আঁকা মনে করতে পারছি না বলেই আপনার সাহায্য
 চাইছি। অবশ্য যদি মনে করেন সেই স্বীকৃতিতে আপনার প্রেস্টিজ ডিলে হয়ে যাবে, তবে থাক
 ও কথা !

হান দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললে, না ! আমার প্রেস্টিজ অত ঠুনকো নয়। পথের মাঝখানে কোন
 তরুণী এভাবে কেন কোন পুরুষকে আটকে কৈফিয়ৎ তলব করে তা আমার জানা আছে। কিন্তু
 এ-জাতীয় ‘গিমিক’-এর কোন প্রয়োজন নেই ! ঈশ্বর আপনাকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দিয়েছেন। এভাবে
 নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার প্রয়োজন নেই।

—আপনি বলতে চান, গীজটি ‘রিয়াল-লাইফ’ থেকে আঁকা ? কপি নয় ?

—আপনার অবিশ্বাস হলে স্কুল ছুটির পর এখানে আসবেন, আপনাকে দেখিয়ে আনব। মাইল
 পনের দূর। রটাডমের কাছাকাছি একটি প্রাচীন গীজা ওটা। আপনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন
 করতে চাইলে দেখিয়ে আনতে পারি। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবেন তো ? উষ্টে পড়ে
 যাবেন না ?

মেয়েটি তার সোনালী চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আপনাকে অতটা কষ্ট করতে হবে না। আমি সাইকেলে চেষ্টাই আসব। আজে না, চক্ষুকর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেনে নিতে রাজী নই—গীজাটি আপনি বাস্তবে দেখে দেখে ঐকেছেন। কপি করেননি।

অ্যানার সঙ্গে সেই ওর প্রথম পরিচয়। স্কুলছুটির পর মেয়েটি তার নিজস্ব লেডিজ-সাইকেল নিয়ে এসে হাজির। দুজনে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিল রটাডাঘ। যে দৃষ্টিকোণ থেকে হান ছবিটা ঐকেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার দেখল ছবিটা। নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল। বললে বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ধারণা করতে পারিনি এটা তুমি দেখে দেখে ঐকেছ পাকা আর্টিস্টের মতো! কী, ক্ষমা করলে তো?

হান মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, না! এ অপরাধের ক্ষমা অত সহজে পাওয়া যায় না!

মুখ টিপে হাসল অ্যানা। বললে, কী খেসারৎ দিতে হবে আমাকে?

— শোন বলি! এ গীজার ছবিখানি আমি আবার আঁকব। প্রথমবার ঐকেছি সকালের আলোয়; এবার আঁকব পড়ন্ত বেলায়। শেষ সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত ঐ একই গীজা।

— বুঝছি। ‘মানে’, ‘মনে’র মতো তুমি একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন রৌদ্রালোকে আঁকতে চাইছ? ইম্প্রেশনিষ্ট-স্টাইলে!

—হ্যাঁ! ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ফোর-গ্রাউন্ড থাকবে এবার একটি পুষ্প-পশারিণী। চার্চের সিঁড়ির ধাপে সে বসে আছে তার পুষ্প পশরা নিয়ে!

— বেশ তো। আঁক না। তাতে আমার কী?

— না, কিন্তু সেই পুষ্প-পশারিণীর মাথায় থাকবে ভিশুভিয়াসী গলিত-লাভার মত সোনালী চুল, চোখ দুটি হওয়া চাই নর্থ-সীর মতো ঘন নীল, আর তার পরনে থাকবে সাদা স্কার্ট আর মেরুন রঙের ব্লাউস—ঠিক যেমন তুমি পরে আছ আজ!

— তাই বুঝি? তাতেই বা আমার কী?

— সেটাই তোমার শান্তি! তোমাকে রোজ এসে সিটিং দিতে হবে!

ঝিলঝিল করে হেসে উঠেছিল অ্যানা! বলেছিল, সেটা আবার কোন্ জাতের শান্তি! শিল্পীর মডেল হওয়া তো মেয়েদের দুর্লভ সৌভাগ্য। আমি ভেবেছিলাম—আরও কিছু কঠিন শান্তি বুঝি দেবে তুমি।

— হয় তো দেব! শান্তি পাওয়ার জন্য তুমি বেশ ব্যস্ত হয়েছ মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রথম দিনেই কি শান্তি দেওয়া শোভন? শান্তি পাওয়ার জন্য তোমার কামনা-বাসনা আরও একটু তীব্র হোক না ততক্ষণ!

— অসত্য কোথাকার!

ছবিখানা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল।

লাগার কথা নয়। ষোল ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি মাপের একটি তৈলচিত্র আঁকতে যদি এতটা সময় লাগে তাহলে পড়তায় পোষায় না। কিন্তু কী শিল্পী, কী তার মডেল—কেউই চাইছে না ছবিটা শেষ হয়ে যাক। আঁকা শেষ হয়ে গেলেই তো দুজনে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে বেড়ানোর অছিলাটাও শেষ হয়ে যাবে। দুজনের একসাথে আইসক্রিম পালারে গিয়ে বসা, ফাঁকা রাস্তায় যৌথসঙ্গীতের আসর জমানো আর আগড়ম-বাগড়ম গল্প! অ্যানা পিতৃহীন—সংসারে আছে

মা আর বুড়ি দিদিমা। তারা জানে, মেয়ে শুধু একজনের সঙ্গে ‘ডেটিং’ করছে। ছেলেটি ভাল—আর্কিটেকচার-এর শেষ শ্রেণীর ছাত্র। দুদিনেই পাশ পরে বের হবে। স্থাপত্যের বাজার ভাল। পশার জমতে দেবী হবে না। অরিকুস্ কিছু জানতেন না ছেলে কার সঙ্গে ডেটিং করছে, জানতেন হানের মা—অশুভা! অ্যানকে তিনি দেখেছেন। পুত্রবধু হিসাবে মনোনীত করতেও আপত্তি নেই তাঁর। আর এ খবর জানতেন অ্যাভি ফারেরা। ঐ রটার্ডারের শহরতলীর গীজার পাদরী। তিনি প্রায়ই এসে দেখতেন হানের শিল্পকর্ম। মাঝে মাঝে অনুযোগও করতেন, ছবিটা বড় লাক্ষ্যগতিতে এগিয়ে চলেছে সমাপ্তির পথে। তারপর একদিন। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ আকাশ জুড়ে নামল অকাল বর্ষণ। ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিল। কিন্তু চার্টের ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন পাদরী অ্যাভি ফারেরা। ছাতা হাতে তিনি এগিয়ে এলেন ওদের উদ্ধার করতে। আশ্রয় দিলেন গীজার ভিতর।

দু-কামরার ছোট কোয়ার্টার্স। একটি সন্ধ্যাসীর শয়নকক্ষ, একটি ড্রইং-রুম। ফায়ার-প্রেসে আগুন বেলে তিনি বার করে আনলেন বান ক্রটি, বিস্কিট আর ওয়াইন। এদের আপত্তিতে কর্পাত করলেন না। অতিথি সেবায় ব্যতায় হতে দেবেন না অ্যাভি ফারেরা।

কিন্তু বৃষ্টি আর থামেই না। ক্রমে শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। শিল্পী আর তার মডেল এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হানের গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট, কোট নেই; আর অ্যানা তো পরিধান করেছে তার সেই দৈনন্দিন শোশাক —সাদা স্কার্ট আর মেরুন-রঙের ব্লাউস। পাদরী বললেন রাতটা তোমরা এখানেই থেকে যাও! এই প্রচণ্ড শীতে এতটা সাইকেল চালিয়ে ফেরা যাবে না। বিশেষ, ঝোড়ো হাওয়াটা বইছে ওদের গতিমুখের দিক থেকে। অ্যানা ইতস্তত করছিল, অ্যাভি ফারেরা কর্পাত করলেন না। বললেন, বুঝছি তোমাদের ইতস্তত করার হেতুটা। ভয় নেই — এটা চার্চ। আমি কাল সকালে নিজে গিয়ে তোমার বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব।

অ্যানা বললে সে শিড়হীন। শুধু মা আর দিদিমা আছেন।

— ঠিক আছে। তাঁরা বুঝবেন। আমার এখানে দুটি ঘর। আমি আর ঐ চিত্রকর— কী যেন নাম তোমার? —আমরা দুজন শোব বাইরের ঘরে। আর তুমি থাকবে আমার বেডরুমে।

হান বললে, আমার নাম হান মীগেরে, ফাদার!

— অলরাইট হান। তুমি আর আমি আজ শোব বাইরের ঘরে।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। অ্যানা গরীব ঘরের মেয়ে। ঘরকন্নার কাজ জানে। ইলেকট্রিক স্টোভে তিনজনের নৈশাহার বানিয়ে নিল। অ্যাভি ফারেরা অনেক গল্পগাছা করলেন! তাঁর ব্যবস্থামত রাতে শয়নের আয়োজন হল।

পরদিন তিনি ওদের সঙ্গে এলেন ডেভেটারে। সাইকেলে নয়, ঘোড়ায় চেষ্টে। তাঁর একটি ঘোড়া ছিল, গীজার সম্পত্তি। অ্যাভি ফারেরা এসে নিশ্চিন্ত করে গেলেন অ্যানার মা আর দিদিমাকে। অনুঢ়া কন্যা ডেটিং করতে গিয়ে সারারাত যদি না ফেরে তবে সেটা সে-আমলের হল্যাভেও একটা নৈতিক অপরাধ বলে ধরা হত। অ্যানার মা-দিদিমা নিশ্চিন্ত হলেন। অ্যাভি ফারেরা শুধু একটি কথা বলতে ভুলেছিলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী হয়েতা সেই ঘটনার তাৎপর্যটুকু প্রণিধান করতে পারেননি। পূর্বরাতে একবার তাঁকে ঘণ্টাখানেকের জন্য গীজার বাইরে যেতে হয়েছিল। ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাবার পর। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকৃত্য করতে! সেই ঘটনাখানেকের অনুপস্থিতিতে চার্চে কী ঘটেছিল তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি

জানতেন—তিনি শেষকৃত্য করতে যাবার পর হান ডুইং-রুমের অর্গল রুদ্ধ করে দেয়, আর ঘণ্টাখানেক পরে এসে যখন তিনি দরজায় করাঘাত করেন তখন আবার তাঁর তরুণ অতিথি দ্বার মোচন করে দিয়েছিল!

বৃদ্ধ হান তাঁ' মীগেরেঁ এই নির্জন বন্দী আবাসে সেই অবাকরাত্রির কথাটা মনে করতে চাইলেন। প্রায় আটত্রিশ বছর আগেরকার একটি বিশেষ রাত্রি। সব কথা মনে পড়ে না—কিন্তু প্রথম প্রেমের, প্রথম আত্মনিবেদনের কথা কি একেবারে ভোলা যায়?

কিন্তু আনন্দ আর দুঃখ আসে পর্যায়ক্রমে, রৌদ্রকরোচ্ছল গ্রীষ্মের পর হিমেল শীতের মতো। অঁরিকুস্ পুত্রে ত্যাগ করলেন, হান ক্ষান্ত হল না তাতে কলেজ থেকে নাম কাটা গেল। অ্যানার হাত ধরে হান মীগেরেঁ বেরিয়ে এল রাস্তায়। সেই আনন্দঘন রাত্রিটির স্বীকৃতি দিল সেই চার্চে গিয়ে। বিবাহ করল অ্যানাকে। তার হবু-সন্তানের জননীকে।

এরপর একটানা জীবনযুদ্ধ! দুঃসাহসিকা বটে সেই কিশোরীটি। এক-কামরা খুশির ঘরে কী-করে যে সে সংসার চালাতো, স্বামী ও সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করত, তার হিসাব জানে না হান। ডক-ইয়ার্ডে মেহনতি মজদুরের কাজের অভাব নেই—কিন্তু অ্যানা কিছুতেই তাতে রাজী হতে পারে না। বলে, ও সব কথা মনেও এন না! তুমি শুধু ছবি এঁকে যাও! একের পর এক! আজ তোমার ছবির বাজার নেই, কিন্তু একদিন শত শত গিল্ডারে তোমার ছবি বিক্রি হবে!

মুখ্ অ্যানা! শত শত নয়, এমনকি হাজার-হাজার গিল্ডারেও নয়। হান তাঁ' মীগেরেঁর তৈলচিত্র একদিন লক্ষ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছে! কিন্তু সেটা দু-চোখ মেলে দেখবার অবকাশ পায়নি সেই দুঃসাহসিকা! সে শুধু বেদনার তারতুম্বই বহে গেছে, সুখের মুখ দেখেনি কোনদিন!

জীবনের প্রথম বোয়ালিশটা বছর শিল্পী হিসাবে হান মীগেরেঁ আদৌ কোন স্বীকৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে স্বল্পমূল্যে সে ছবি বেচেছে। অধিকাংশই ফটো-দেখে-আঁকা জেনুরি শিকচর। তাতেই কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। সাতাশ বছর বয়সে যখন ওর প্রথম একক-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় তখনো ও অনেক-অনেক স্বপ্ন দেখতো। এই কয় বছরে সে খান-পঞ্চাশ ছবি এঁকেছে স্ব-ইচ্ছায়। অর্থাৎ গ্রুপ ফটোগ্রাফ থেকে সদ্যমৃত কোন একজনের পোর্ট্রেট নয়। সেগুলি আঁকতে হত গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে। শীতকালে যাতে ফায়ার-প্লেসটায় আগুন জ্বলে। ঐ খান-পঞ্চাশ ছবি শিল্পীর খেয়ালখুশির স্বাক্ষর। যাতে প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পীর স্বাধীনসত্তার স্বরূপ। শুধু হান একা নয়, অ্যানারও দৃঢ় বিশ্বাস—সেগুলি যখন একত্রে প্রদর্শিত হবে তখন আমস্টারডাম, হেগ থেকে বড় বড় শিল্পবিদ্যারদের দল এসে দেখবেন। স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সবাই স্বীকার করবেন ওর কৃতিত্ব। জ্যাকের বয়স তখন বছর চারেক, আর তার ছোট বোন ঈনেভ সবে হাঁটিতে শিখেছে। তবু সংসার সামাল দিয়ে অ্যানা এসেছিল প্রদর্শনীক্ষেত্রে ছবি টাঙাতে। ফুল দিয়ে সাজাতে। আশ্চর্য-মেয়ে! কী-জানি-কী-করে মেয়েটার ধারণা হয়েছিল-হান মীগেরেঁ এক দুর্লভ প্রতিভার শিল্পী। জাত আর্টিস্ট! সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। শুধু 'সমকাল' তাকে চিনতে পারছে না—এই যা! তা তো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে। ভেরমিয়ার, ড্যান গথ্, পল গোগ্যাঁ কেউই তো সমকালের কাছে স্বীকৃতি পাননি। তাই বলে তাঁরা ব্যর্থ? ঠিক তেমনিভাবে হান তাঁ' মীগেরেঁর প্রতিভার স্মরণ একদিন হবেই—দুনিয়াকে একদিন নতমস্তকে স্বীকার করতে হবে অ্যানাই ঠিক বুঝেছিল, সমকাল ঐ শিল্পীকে বুঝে উঠতে

পারেনি। এই বিশ্বাসের গুঁটলটাকে আঁকড়ে ধরে সেই বাইশ বছরের মেয়েটি সব কিছু করেছে। উনিশ বছর বয়সে ওয়েডিং গাউন পরে ঐ বাশে-তাড়ানো বেকার ছাত্রটির ঘর করতে এসেছে; দু-দুটি সন্ধানকে জন্ম দিয়েছে, মানুষ করেছে, আর আজ তার সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে স্বামীর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে! উদ্বোধনের আগের রাত থেকে ভাঙা-হাটের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে প্রদর্শনীকক্ষের দ্বারপথে—জনে জনে বাড়িয়ে ধরেছে ‘ভিজিটার্স-বুক’: কিছু লিখে দিয়ে যান! মেয়েটাকে তার দাদার জিন্মায় বসিয়ে সে ঘরাঙ্কিতে চড়ে নিজে-হাতে দেয়ালে পেরেক ঝুঁকেছে। সার দিয়ে ছবিগুলি টাঙিয়েছে। ঈনেভকে প্যারাম্বুলেটোরে বসিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে ফুলপট্টিতে। গোছা-গোছা টুলিপ আর গ্ল্যাডিওলাই এনে সাজিয়েছে প্রদর্শনী কক্ষটো—যেন ছবির একজীবিশন নয়, ওরই ফুলশয্যা! খরচ মেটোনো যাবে না বলে শেষ মুহূর্তে যখন হান বেকের দাঁড়িয়েছিল তখন ঐ মেয়েটাই তাকে ধমকে ঠাণ্ডা করেছে। কোথা-থেকে-কী-করে সেই চরম মুহূর্তে হানের হাতে তুলে দিয়েছিল এক-থলে গিল্ডার্স! তখন বুঝতে পারেনি, বুঝবার মতো সময়ও ছিল না—পরে টের পেয়েছিল। ওয়েডিং-রিং আর সেই সোনার পদকটি বাদে সমস্ত গয়নাই মেয়েটি জমা রেখেছিল ‘পন-ব্রোকার্স-শপে’। বন্ধকী-খণের বেড়া জালে। ধনকুবের মীগেরের আজও স্পষ্ট মনে আছে—সবগুলি অলঙ্কার ফিরিয়ে আনা যায়নি। খরচ-খরচা মিটিয়ে হাতে প্রায় কিছুই ছিল না। মাত্র খান-সাতেক বিক্রি হয়েছিল প্রদর্শনীতে। তাও জলের দামে! বন্ধকী-দোকান থেকে গহনাগুলো হয়তো ফিরিয়ে আনা যেত, যদি ন্যায্য দামে অন্তত কিছু ছবি বিক্রি হত। তা তো হল না! তাই অ্যানার সেই অতি সাধের গহনাগুলো—বিবাহে ওর দিদিমা যে জাপানি মুক্তোর মালাটি দিয়েছিল, মায়ের ব্রেসলেটজোড়া, আর ফিরে আসেনি। তাতে কিছু কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করেনি মেয়েটা! বলেছিল— গেছে তো গেছে! আবার হবে। তুমি দেখে নিও। একদিন শত শত গিল্ডার্সে তোমার ছবি বিক্রি হবে!

শত শত! বোকা মেয়ে!

কিন্তু যেদিন ওর আঁকা ছবি ঘোল লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হল তখন কোথায় সেই হতভাগিনী? ওর জীবনের প্রথম-প্রেম : অ্যানা? তখন উত্তীর্ণ-যৌবনা মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গিটাও বদলে গেছে। তখনও তার ছিল অর্থকষ্ট—কিন্তু তখন সে ‘পূর্বজীবনের বেদনার স্মৃতি’ বইতে অপারগ!

ট্রাজেডি সেটা নয়! ‘পূর্বজীবনের বেদনার’-কথাটা অ্যানা জানতেও পারেনি কোনদিন! ঐ একক-প্রদর্শনী দেখতেই এসেছিল জোহানা তার স্বামীর হাত ধরে। সেখানেই বিবাহিত হান মীগেরের আর বিবাহিতা জোহানার চারচক্ষুর প্রথম মিলন। আর সেই প্রদর্শনীকক্ষেই সদ্য-পরিচিதாகে শিল্পী উপহার দিয়েছিল একগুচ্ছ টুলিপ আর গ্ল্যাডিওলাই। নুন-আস্তে-পান্তা-ফুরানো সংসারের গৃহিণীর সংগৃহীত পুষ্পসম্ভার!

ট্রাজেডি সেটাই! হিরোইন তখন মঞ্চে অনুপস্থিত!

— বলুন মস্যুয়ে মীগেরের, ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানা আপনি কোথা থেকে উদ্ধার করেছিলেন? আর কাকে বেচেছিলেন? উ?

— কী আশ্চর্য! আপনারা কি আমাকে পাগল করে ছাড়বেন? বলছি তো, আমার মনে নেই! আমি জানি না! আমি জানি না, জানি না!

সলিটারি প্রিজন্। একটা বিছানা, টেবিল-ল্যাম্প, লিখবার টেবিল। ইজিচেয়ার। সংলগ্ন বাথরুম। উপরে জানলা। তা দিয়ে বাঁকা হয়ে রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে। হয়তো এখন আমসটার্ডামের

পথে পথে বার হয়ে পড়েছে শহরবাসীরা। ঝুলে যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তে-চাকার গাড়িতে হকাররা নানান সওদা নিয়ে ফিরি করতে বেরিয়েছে। জানলাটা অত উঁচুতে কেন? কিছুই দেখা যায় না বাইরের দৃশ্য। দিনের মধ্যে আট-দশবার ওরা আসে। একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। গণমুখগুলো কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। সে লোকটাকে কোন দিন চোখেই দেখেনি। শুধু সে কেন, কোন হতভাগা নাৎসী সময়নায়ককেই সে কখনো কোন ছবি বিক্রি করেনি, ওর গোপন কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। সেটা ঐ মুখগুলো আন্দাজই করতে পারছে না। ওদের দোষ নেই। সেটা যে অবিশ্বাস্য! সব কথা এখনই ও ঝুলে বলতে পারে না। বলবে; তবে এখন নয়। সময় হল। আপাতত কী যেন ভাবছিল?

হ্যাঁ, সেই 1932 সাল। জোহানাকে বিবাহ করার বছর-তিনেক পরের কথা। অ্যানা তার পুত্রকন্যাকে নিয়ে তার কয়েক বছর আগেই চলে গেছে সুন্দর জাভা না সুমাত্রায়। ডাচ উপনিবেশ। আশ্চর্য মেয়ে : অ্যানা! কোন অভিযোগ সে আনেনি, কোন অনুযোগ করেনি। যে মুহুর্তে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর ভালবাসা হারিয়েছে সেই মুহুর্তে নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছে তার জীবন থেকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে কোনই অসুবিধা হয়নি হানের। বরং জোহানা তার প্রথম স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে বেশ বেগ পেয়েছিল। সে যা হোক, বিবাহের পরেও অর্থাভাবে জো-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক হনিমুনটা তিন বছর ধরে মূলতুবি ছিল। সেবার কয়েকটা ক্যানভাস হঠাৎ ভাল দামে বিক্রি হয়ে গেল। হাতে এল বেশ কিছু নগদ অর্থ। জো অ্যানা নয়, সে কপিকবাদিনী। ভবিষ্যৎ তার কাছে জলবুদ্বদ, যৌবন থাকতে জীবনকে উপভোগ করার তাগিদ তার। বললে, চল দুজনে দক্ষিণ-মুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

মীগেরেঁ রাজী হল। ওরা প্রথমে গিয়েছিল সুইৎজারল্যান্ড। তারপর ভিয়েনা হয়ে ইতালী। ফেরার পথে ফ্রান্স। একখানা থার্ড-ক্লাস লবাকড়ে গাড়ি কিনেছিল ইসটলমেটে। তাতে চেপেই ইউরোপ পরিভ্রমণ। মিলানে দা-ভিক্সির ‘শেষ সায়মাশ’, ফ্লোরেন্সে মিকেলোঞ্জেলোর ‘ডেভিড’, ‘মোজেস’, ভ্যাটিকান সিটিতে সিস্টিন চ্যাপেল সিলিঙ! রোমের আর্ট গ্যালারিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ছবিতে প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খেল মীগেরেঁ।

1606 খ্রীষ্টাব্দে আঁকা কারাভাগগোর : ইন্সায়ুস্-এ যীশু!

কারাভাগগো সপ্তদশ শতকের একজন প্রখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রকর। তাঁর ছবিতে আলো আর ছায়া অদ্ভুতভাবে মিতালী করে! তাঁর আঁকা ঐ ছবিটায় ও কী দেখল তা বলার আগে নিষিদ্ধ করতে হয় শিল্পী কী ঐঁকেছিলেন। হ্যাঁ, শিল্পী যা ঐঁকেছিলেন, যা বলতে চেয়েছিলেন, তা দেখেনি মীগেরেঁ। কিন্তু সে সব কথা পরে। আপাতত বলি চিত্রপটে কী দেখা যাচ্ছে!

কারাভাগগোর ক্যানভাসে দেখা যাচ্ছে—খীসাস্ এবং তাঁর দুজন গুণগ্রাহী বসে আছেন একই ডাইনিং টেবিলে। পশ্চাৎপটে একজন স্বাদ্য-পরিবেশক এবং একটি পরিচারিকা। মোটামুট পাঁচটি চরিত্র।

কাহিনীর মূল উৎস লুক-কথিত সুসমাচারের কয়েকটি পংক্তি। হোলি বাইবেলে ঐ কয়েকটি ছত্রে সেন্ট বর্ণনা করেছেন প্রভু যীশুর ‘রেজারেকশন’ বা পুনর্জন্ম-প্রসঙ্গ। যীশু ক্রুশকাঠে বিদ্ধ হয়ে মানবহিতার্থে আত্মত্যাগের দ্বার পরে কেউ কেউ নাকি তাঁকে কায়াময় মূর্তিতে দেখতে পেয়েছিল। সেটাই ‘রেজারেকশন’-প্রসঙ্গ। সেন্ট লুক এখানে তেমনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—ঘটনা

‘ইম্মায়ুস্’-এর। ইম্মায়ুস্ জেরুজেলামে যাবার পথে একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম। সেই জনপদের দিকে যাবার সড়কের ধারে পথপ্রান্তের এক সরাইখানায় যীসাসূকে নাকি দুজন দেখতে পায় এবং চিনতে পারে। তাদের একজনের নাম : ক্লিওপাস। আমি যতদূর জানি—তুল হলে কোন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান পাঠক আমাকে দয়া করে শুধরে দেবেন—বাইবেল-এ ঐ নামটি দ্বিতীয়বার উল্লিখিত হয়নি। অর্থাৎ ক্লিওপাস যে প্রভুর শিষ্য এমন কথা জোর করে বলা চলে না। দ্বিতীয়জনের নামোন্মেষ করেননি সেন্ট লুক। তা সে যাই হোক, ওরা দুজনে সরাইখানার একটি টেবিলে বসে আপন মনে নৈশাহার সারছিল। যে রাত্রে ঘটনা, তার কয়েকদিন পূর্বেই ক্রুশকাঠে যীশুর তিরোধান ঘটেছে। তাঁর নশ্বর দেহ ক্রুশকাঠ থেকে অবনমিত করে সমাধিস্থ করাও হয়েছে। টেবিলের ও-প্রান্তে নতুন যে আগভুক্ত এসে বসেছে তার দিকে চোখ তুলে দেখবার ওদের না ছিল অবকাশ, না বাসনা। পরিচরিকা যখন সেই আগভুক্তকে রুটি-মাংস দিয়ে গেল তখন তিনি নিঃশব্দে রুটিটিকে তিন টুকরো করলেন। বান-রুটির এক-তৃতীয়াংশ নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বাকি দুটি অংশ ওদের দুজনের প্লেটে তুলে দিলেন।

ওরা দুজনেই চমকে ওঠে! এ আবার কী! এমনটা তো হয় না। হবার কথা নয়। অজানা, অচেনা দুই সহভোজীকে অযাচিত ভাগ দিয়ে আহার করা! ওরা এতে অভ্যস্ত নয়! তাই দুজনেই অবাক বিস্ময়ে আগভুক্তের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

এবং তৎক্ষণাৎ আঁৎকে উঠল ক্লিওপাস!

হ্যাঁ! সেই পাগল লোকটাই! সেই যে লোকটা বলত: ‘ল্যভ দাই নেবার!’ সিজারের দুনিয়ায় যে পাগলটা প্রলাপ বকত: ‘কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে তাহলে তার দিকে ও-গালটা বাড়িয়ে দিও!’

কিন্তু তা কেমন করে হবে? সে পাগলটা তো সেই প্রলাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ইতিমধ্যে! পন্ডিয়াস্ পীলেতের বিচারে ঐ লোকটাই না সেদিন...

সে কথাই জানতে চাইল ক্লিওপাস—

কিন্তু জানা হল না। ওদের সামনের চেয়ারটায় কেউ নেই! অভুক্ত পাণ্ডুর আহাৰ্যপাত্র অস্পর্শিত। উপেক্ষিত বান-রুটিটার ছিন্ন অংশটুকু উবুড় হয়ে পড়ে আছে অভুক্ত প্লেটে।

যীসাস্ অন্তর্ধান করেছেন ইতিমধ্যে!

কারাভাগগোর আঁকা সেই বিশ্ববন্দি তৈলচিত্রটির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধ মীগেরেঁ। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে। পাঁচ-মিনিট, সাত-মিনিট, দশ-মিনিট! শেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল জোহানার। স্বামীর দিকে ফিরে তার কানে কানে বললে, কী দেখছ অমন করে? চল—সম্মিত ফিরে শেল মীগেরেঁ। রুদ্ধস্বরে বললে, তোমার যদি ভালো না লাগে তবে হোটেল ফিরে যাও। আমি এ ছবিটা দেখব।

ওর কঠস্বরে অন্যান্য দর্শক ওদের দিকে ফিরে তাকায়। জোহানা একটু অপ্রস্তুত। মীগেরেঁর কণ্ঠমূলে নিম্নস্বরে বললে, দেখলে তো এতক্ষণ! আর কত দেখবে? গ্যালারির অন্যান্য ছবি... হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে হান—বিরক্ত কর না আমাকে! আমি সারাদিন ধরে এই একখানা ছবিই দেখব! তোমার আপত্তি আছে?

আশপাশের সব কটা চোখ কেন্দ্রীভূত হল দম্পতির দিকে। যেন তারা একটা পাগলকে দেখছে! যেন চিত্রশালায় এমনটা হয় না, হবার কথা নয়! মরমে মরে গেল জোহানা। তার ইচ্ছা

করছিল—চিট্রপটের ঐ উপেক্ষিত বান-রুটির টুকরোটোর মত উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে।
বেচারি তো জানে না—হান ভাঁ মীগেরেঁ ঐ অনবদ্য ক্যানভাসে মানবত্বাতা যীসাসকে দেখতে
পায়নি আদৌ! সে দেখতে পাচ্ছিল—কুইন অব শেবার রত্ন-ভাণ্ডার! টুটেনখামেনের টাকায়
টইটনুর টুই!

সোনা-রূপা-হীরে-জহরৎ! কারাভাগ্যের ছবিখানা ওকে বলছে : চিচিং ফাঁক!
স্বপ্ন দেখছে না মীগেরেঁ! ‘চিচিং ফাঁক’ মন্তব্য সে সতাই খুঁজে পেল ঐ তৈলচিত্রটিতে। বেয়াল্লিশ
বছর বয়স পর্যন্ত যে ভ্যাগাবন্ডটা ছিল নেদারল্যান্ডের একজন উপেক্ষিত, অখ্যাত, অজ্ঞাত,
অদ্য-ভঙ্ক্য-ধনুপ্তগ শিল্পযশপ্রার্থী অকিঞ্চন, ঐ চিত্রদর্শনের ফলশ্রুতি হিসাবে মাত্র পাঁচ বছর
পরে সেই মানুষটাই হয়ে গেল : মিলিওনেয়ার! ধনকুবের!

শিল্পী ঐঁকেছিলেন : রেজারেকশন—যীসাস্-এর।

দর্শকের অন্তরে হল : রেজারেকশন—সেটান-এর!

— মস্যুয়ে মীগেরেঁ আপনি অহেতুক আপনার বন্ধুদের বাঁচাতে চাইছেন। সে চেষ্টা সফল হবার
নয়। ওরা বাঁচবে না; মরবেই। আপনি কেন শুধু শুধু ওদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে
ফেলছেন?

— কাদের কথা বলছেন, অফিসার? —মীগেরেঁর মস্তিষ্কে আর ঠিকমতো কাজ করছে না।
তার ক্রমে ক্রমে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

— ঐ ডক্টর ওয়াশটার হোফার আর মস্যুয়ে ভাঁ স্ক্রিভেসান্দে।

— তাঁরা কারা? ...ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওরা আমস্টারডামের দুজন নামকরা আর্ট-ডীলার!
আমার কম্পিটিটর। আপনি সেই ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানার কথা বলছেন, না? ভেরমিয়ারের
সেই অনবদ্য মাস্টারপিস! কিন্তু বিশ্বাস করুন অফিসার, ওদের দুজনের মধ্যে কাউকেই আমি
সেই ‘অ্যাডালটারেস্’ ছবিখানা বেচিনি!

— বিশ্বাস করলাম। তা তো হতেই পারে। তাহলে বলুন—কাকে বেচেছিলেন?

— মিস্ত্রকে। রটার্ডামের আর্ট-কলেক্টর জন মিস্ত্রকে। সেটা বেয়াল্লিশ সালের কথা। তখনো
কিন্তু ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিঙ নেদারল্যান্ডে আসেনি।

— মেনে নিলাম। তা তো হতেই পারে। এবার বলুন কোথায় পেয়েছিলেন ছবিখানা?

— আমার...আমার এক বান্ধবীর কাছে। ইতালিয়ান মহিলা...কিন্তু তাঁর নামটা আমি আপনাদের
জানাতে পারব না—

— কেন? কেন জানাতে পারবেন না?

— নামটা জানাজানি হয়ে গেলে সে মেয়েটির সর্বনাশ হয়ে যাবে যে! মিলানে তার স্বামী
আছে, সন্তান আছে...

— আপনি ভুল করছেন মস্যুয়ে মীগেরেঁ। এটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের জুন মাস। বিশ্বযুদ্ধ
বহুদিন হল থেমে গেছে। ইতালীর শাসক ফাসিস্ত বেনিতো মুসোলিনির মৃত্যু হয়েছে। এখন
আর মাদাম ম্যুরোখ্-এর স্বামী বা সন্তানের কোন ভয় নেই মিলানে।

মীগেরেঁ স্তম্ভিত হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, কী বললেন? ম্যুরোখ্?

— হ্যাঁ, মাদাম ম্যুরোখ্। এই নামটাই তো গোপন করবার কথা বলছিলেন তখন, তাই নয়?

— তবে তো....আপনারা সবই জানেন ?

— না, সবটা জানি না। কিছু কিছু জানি। যেমন জানি, আপনি গোয়েরিঙকে কোনও ছবি বিক্রি করেননি, যেমন জানি আপনি ঐ দুটচক্রের অংশীদার নন। কিন্তু না, সব কথা আমার জানি না! এখন বলুন, মসৃণে মীগেরেঁ—ঐ মাজুরোখ্ এখন কোথায় আছে?

— আমি জানি না, বিশ্বাস করুন...আমি সত্যিই জানি না।

— বিশ্বাস করলাম। তা তো হতেই পারে। এখন ঐ যুদ্ধান্তের দুনিয়ায় সে বেঁচে আছে কি না তাই হয়তো জানেন না আপনি। কিন্তু উনিশ'শ আটত্রিশ সালে, মানে সেই যেদিন মাজুরোখ্ আপনার 'প্রিমেরেরায়' ঐ ছবিখানা লুকিয়ে এনে দিয়েছিল তখন সে কোথায় থাকত? তখন তার স্বামী মিলানের কোন ঠিকানায় থাকত?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মীগেরেঁ। বলে, কেন অহেতুক তাহলে হয়রানি করছেন আমাকে? আপনারা তো জানেনই কীভাবে, কোথা থেকে ঐ 'অ্যাডালটারেস্' ছবিখানা আমার হাতে এসেছিল। স্থান-কাল-পাত্র সবই তো জানেন...

— না, সব কিছু জানি না। মাজুরোখ্ নামটুকুই জানি। তার পুরো পরিচয়টা জানি না। আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না—সেই মেয়েটি ফাসিস্ট স্পাই ছিল কি না।

— আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি অফিসার, মাজুরোখ্ স্পাই ছিল না।

— কী করে জানলেন? আপনি নিশ্চিত?

— হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কী করে জানলাম সে কথা অবশ্য বলতে পারব না।

- বুঝেছি। আপনার যুক্তি হচ্ছে—মাজুরোখ্ স্পাই হতে পারে না, যেহেতু সে ছিল আপনার গোপন প্রণয়িনী। জোহানার সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে-যে-হেতু সে রাতের পর রাত আপনার 'প্রিমেরেরা' প্রমোদকুঞ্জে কাটিয়ে গেছে?

মীগেরেঁ তার প্লাটিনাম-ব্রন্ড সাদাচুলের গোছা দু-হাতে খামচে ধরে বললে, না! তানয়! অফিসার! সব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারব না, বলব না। সত্যিকথা বলতে কি, সব কথা আমি নিজেও জানি না। আমার কাছেও অনেকখানি হৈয়ালিই রয়ে গেছে। কিন্তু এটুকু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মাজুরোখ্ কোনও ফাসিস্ট স্পাইয়ের নাম নয়—

— কোন যুক্তিতে? কেন—তা আপনি এখনো বলেননি।

পুলিস-অফিসারের চোখে চোখ রেখে এবার বললে, যেহেতু 'মাজুরোখ্' নামটা অলীক! ও নামে বাস্তবে কেউ কোনদিন ছিল না। নামটা আমার বানানো—

— অথচ ডক্টর বুনকে উনত্রিশে আগস্ট উনিশ'শ সাঁইত্রিশ সালে বলেছিলেন যে, মাজুরোখ্ একটি ইতালিয়ান সুন্দরী। তার স্বামী মিলানে থাকে। সে গোপনে সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসেছিল একখানা ভেরমিয়ার বিক্রি করতে? বলেননি?

— সাল-তারিখ মনে নেই, তবে ঐ কথা একদিন আমি ডক্টর বুনকে বলেছিলাম স্বীকার করছি—

— এবং তাঁকে এ-কথাও বলেছিলেন যে, মাজুরোখ্ আপনার গুপ্ত প্রণয়িনী।

— লুক হিয়ার অফিসার, হ্যাঁ তাও স্বীকার করছি—বলেছিলাম। কিন্তু সে-সব মিথ্যা কথা। আদ্যন্ত মিথ্যা! মাজুরোখ্ স্পাই নয়, ও নামটা অলীক!

— তবে কী নাম মেয়েটির?

— কী আশ্চর্য! সমস্ত ব্যাপারটাই অলীক। ও-ভাবে কোন মেয়ে 'ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্মায়ুস'

আমাকে এনে দেয়নি।

— বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেওয়া গেল— কোন মেয়ে ছবিখানা আপনাকে এনে দেয়নি। শুধু মার্ভোরোখ্ নামটুকু নয়, ইতালিয়ান মেয়েটিই অলীক। কিন্তু ছবিখানা তো অলীক নয়? ভেরমিয়ারের সেই ষোল লক্ষ গিল্ডার্স দামের ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্সট্রাস’ ছবিখানা? উষ্টর বুনও অলীক চরিত্র নয়। আপনি তাঁকে ছবিখানা বিক্রয় করেছিলেন এটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য আপনি মেনে নিচ্ছেন! এবার তাহলে বলুন কোথায় পেয়েছিলেন সেই ছবিখানা।

হান ভাঁ মীগেরে নিম্পলকনেত্রে তাকিয়ে থাকে তদন্তকারী অফিসারের দিকে। অফিসারটি এবার বলে ওঠে, সুতরাং নতুনভাবে জটিলতার সৃষ্টি করবেন না। মার্ভোরোখ্কে অলীক বলে, আপনার খেয়ালী মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলে আপনাকে নতুন করে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কোন ভূগর্ভস্থ গুপ্ত সংগ্রহশালা থেকে কেমন করে আপনি সেই ভেরমিয়ারখানা উদ্ধার করেছেন!

এবারেও মীগেরে কোন জবাব দিল না। নত নেত্রে কী-যেন সাসের মস্ত্র আওড়াতে থাকে বিড় বিড় করে। ইন্টারোগেটিং অফিসার নড়ে-চড়ে বসে। এই লক্ষণটা ভয়াবহ—এ নীরবতা আর সাসের মস্ত্রের আওড়ানো। হাজ্জতী-আসামীকে দিয়ে ক্রমাগত কথা বলাতে হয়। শব্দকব্জি নিলেই সর্বনাশ। তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিক থেকে শুরু করে আবার, মসুয়ে মীগেরে! আমি বিশ্বাস করেছি, এতদিন পরে সব কথা আপনার ঠিক মনে পড়েছে না। তা তো হতেই পারে। আপনি তো জাত-ক্রিমিনাল নন। সাদা-সিধে ভালোমানুষ। শিল্পী! চিত্রকর! ছবি আঁকেন, ছবির কেনাবেচা করেন। পুলিশের কাছে জবাববন্দি দেবার প্রসঙ্গই ওঠেনি আপনার দীর্ঘ জীবনে। আচ্ছা, বলুন তো—দক্ষিণ ফ্রান্সে রোকব্রুন শহরের সেই বাড়িটার কথা আপনার মনে আছে? সেই ‘প্রিমেভেরা’?

হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠল বন্দী। বললে, থাকবে না? যেন ‘কস্টেব্ল’-এর আঁকা একখানা ছবি!

— ঠিক সমুদ্রের ধারে, নয়? অসংখ্য সী-গাল উড়ত আকাশে, আর দিবারাত্র সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ত বিস্তীর্ণ বালুতটে। তাই নয়?

মীগেরে দু-চোখ বুজে স্মৃতির ক্যানভাসে বাড়িখানা দেখতে থাকে। রোকব্রুন শহরের সেই ‘প্রিমেভেরা’!

— আপনি ঐ বাড়িতে ছয় বৎসর একা ভাড়া ছিলেন। তাই নয়? উনিশ শ বত্রিশ থেকে আটত্রিশ! মনে পড়েছে?

— সাল-তারিখ মনে নেই। তবে দীর্ঘদিন ঐ বাড়িটায় আমি একা থাকতাম। বছর-পাঁচ ছয় হবে।

— ঐ বাড়ি থেকে আধ-কিলোমিটার দূরে একটা হোটেল ছিল। মনে পড়ে? তার নাম ‘লা ম্যাগনিফিক’!

— হ্যাঁ! রোমানেন্স-স্থাপত্যের সঙ্গে গথিক-স্থাপত্যের এক জগা শিচুড়ি! রোকব্রুন ঐ একটাই তো হোটেল। বাদবাকি পেইং-গেস্ট-এর ব্যবস্থা।

— এবার আপনাকে জানাচ্ছি, সেই হোটেল রেজিস্টারে আমরা দেখেছি ‘মার্ভোরোখ্’ নামে একটি মহিলা এসে উঠেছিল। একা। আর তার আদি নিবাস হিসাবে রেজিস্টারে লিখেছিল ‘মিলান, ইতালী’। এ আমি নিজে চোখে দেখেছি। তা থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, ‘মার্ভোরোখ্’ নামটা

অলীক নয়? ঐ নামে একটি রক্ত-মাংসের জীব বাস্তবিক ছিল?

মীগেরঁ অনেকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বললে, না, তাতেও সে কথা প্রমাণ হয় না। এটাই প্রমাণ হয় কোন একটি মেয়ে ঐ ছদ্মনামে হোটেল উঠেছিল।

— সে কেন ছদ্মনাম নেবে?

— আমি তা কেমন করে জানব? হয়তো সে ইতালী থেকে কাউকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল!

— মানলাম। তার মানে আপনার অতীত জীবনে এমন কিছু ছিল যাতে একটি ভিনদেশী মেয়ে—সে বাস্তবে মার্ভোরো হোক-বা-না-হোক—আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল! তাহলে বলুন—কী সেই অতীত জীবনের নেপথ্য ইতিহাসটা?

মীগেরঁ রুখে ওঠে—আপনার চার্জটা কী মশাই? কোন ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করতে চান, আগে তাই বলুন দেখি! গোয়েরিঙকে ছবি বেচা, না আর কিছু?

— আমি যদি এখন বলি : ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ?

— মার্ডার! খুন! বাঃ! কে খুন হল? তার মৃতদেহটা কোথায়?

— এবার আমি যদি বলি—মৃতদেহটা আপনি খণ্ড খণ্ড করে ঐ প্রিমেভেরাতেই পুড়িয়ে ফেলেছেন? যে খুন হল তার নাম : মার্ভোরো? সে ইতালিয়ান!

মীগেরঁ জবাব দিতে পারে না। স্বলভদৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। না, স্বলভ দৃষ্টি নয়, এবার যেন পাগলের দৃষ্টি। অথবা দিশেহারা নাবিকের। ঝড়ের রাত্রে জাহাজটা যখন উখাল-পাখাল করছে তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন যদি হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে যে, তার কম্পাসটাও খোয়া গেছে—তখন তার দৃষ্টি যে রকমটা হয়!

— বলুন মস্যুয়ে মীগেরঁ! রীতিমত সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্লেক্স পুলিশ কি একদিন আপনার বাড়িটা—ঐ প্রিমেভেরায় খানা-তল্লাসী করেনি? হোটেল থেকে ঐ মেয়েটি বেয়মক্কানির দেশ হবার পর? আপনার প্রতিবেশীরা কি অভিযোগ করেনি যে, ‘প্রিমেভেরা’-র চিম্নি দিয়ে ক্রমাগত ঘোঁওয়া বার হত? দুর্গন্ধযুক্ত ধূম? এমনকি মধ্যরাত্রেও? যখন আপনি প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রিত?

অনেক কষ্টে মীগেরঁ বাকশক্তি ফিরে পায়। বলে হ্যাঁ, পুলিশে সার্চ করেছিল। আমার ছবি, ক্যানভাস, জিনিসপত্র সব তখন চুরি করেছিল। কিছুই পায়নি। কোন সূত্রই নয়! মার্ভোরো নামে কেউ কোনদিন ছিল না। তার খুন হবার প্রশ্নই ওঠে না।

— মার্ভোরো নামটা অলীক হতে পারে। মেয়েটার নাম হয়তো ছিল জিল।

— জিল? জিল কে? আমি চিনি না, আমি জানি না!

— আই সী! আচ্ছা জিলকে না চিনলেও জ্যাক মীগেরঁকে তো চেনেন? বৃদ্ধ অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে বললেন, জ্যাক আমার একমাত্র পুত্র!

— সে এখন কোথায়?

চীৎকার করে ওঠে বন্দী—ড্যাম ইট! ন্যাকা সাজছেন! আপনি জানেন না যে—সে ডাচ ইস্ট-ইন্ডিজ মারা গেছে।

— জানি। আমি জানি। আমি শুধু জানতে চাইছি—আপনি কতটা জানেন। এবার বলুন তো জ্যাক মীগেরঁ কীভাবে মারা যায়?

এবার অতি শান্তস্বরে সে জবাব দিল। কে বলবে পূর্ব প্রশ্নটার জবাব সে দিয়েছিল চীৎকার

করে। এবার বললে, অফিসার! এ কী শুরু করেছেন আপনি? জ্যাকের প্রসঙ্গ কেন তুলছেন? তাকে শেষবার যখন দেখি তখনো সে নিতান্ত বালক! তারপর তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। আপনি তা নিশ্চয় ভালভাবে জানেন। তা হোক, তবু সে আমার সম্ভান! আমার পুত্র! আপনার কি সম্ভান নেই? আপনার একমাত্র পুত্রটি যদি ফায়ারিঙ স্কোয়াড-এর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে সে দুঃস্বপ্নের কথা কি আপনি ভুলে যেতে চাইবেন না?

— ‘জিল্’ মীগেরেঁ হচ্ছে সেই বিদ্রোহী জ্যাকের প্রণয়িনী। সম্ভবত তার স্ত্রী! তার সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ নেই বলতে চান?

— না, নেই! আমি জিল্কে চিনি না, কোনদিন দেখিনি। কোন পত্রালাপও করিনি! এই মুহূর্তে জানলাম তার অস্তিত্বের কথা! আমার পুত্র যে বিবাহ করেছিল তাও জানতাম না আমি।

— মিছে কথা বলছেন এবার! আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, জিল্ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ—হঠাৎ ধৈর্য হারালো বন্দীর। চিংকার উঠল, গেট আউট! আই সে গেট আউট! তোমার কোনও প্রশ্নের জবাব আমি দেব না! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের চার্জটা কী আগে তাই বল। তারপর আমার সলিসিটরকে সামনে রেখে আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেব। নাউ ক্রিয়ার আউট।

— মস্যুয়ে মীগেরেঁ! আপনি ধৈর্য হারাবেন না। আমারও পুত্রসম্ভান আছে। তার বয়সও ঐ জ্যাকের মতো! আমি বুঝতে পারছি আপনার কী-রকম কষ্ট হচ্ছে! যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি...

— ক্রিয়ার আউট! যু বাস্টার্ড!

— প্রীজ মস্যুয়ে মীগেরেঁ...

— ক্রিয়ার আউট! যু বাস্টার্ড! তোব্ মতো বেজন্মার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না! গেট আউট!

॥ চার ॥

ফিগারো সম্পাদকের বৈঠকে কনফারেন্স শেষ হল। খাতাপত্র ফাইল শুষ্কিয়ে নিয়ে সবাই কক্ষত্যাগের উপক্রম করছে। সম্পাদক ডক্টর নিকোলাস লে লোরেন বললেন, পয়ঁক্যারে, তুমি একটু অপেক্ষা কর। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ইউজিন পয়ঁক্যারে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল। উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, এ-কথায় বসে পড়ে। পয়ঁক্যারের বয়স ত্রিশের কোঠায়। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ফিগারো পত্রিকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। ইতিপূর্বে ছিল ইন্টেলিজেন্স বিভাগে। প্রাকযুদ্ধ আমলে। সুতরাং গোয়েন্দা-সুলভ সব কয়টি গুণই আছে তার। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে তার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফিগারোতে বার-তিনেক আলোড়নকারী ‘রিশোর্টার্জ’ দাখিল করেছে—যাতে শুধু পারী বা ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপ চমকে উঠেছিল। যুদ্ধ চলাকালে সে ছিল আমস্টার্ডামে। এখনো সেখানকার আঞ্চলিক সংবাদদাতা। নাৎসী অধিকারকালে সেখানেই গৃহবন্দী ছিল।

ঘর খালি হবার পর বৃদ্ধ লে-লোরেন ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বল তো পয়ঁক্যারে, কেন তুমি আমার এই ‘অপারেশন মীগেরেঁ’কে বর্জন করতে চাইছ?

পয়ঁক্যারে ম্লান হেসে বললে হেতুটা জানতে চাইবেন না, স্যার। আমার সাজেশান—আপনি

আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকেই এই দায়িত্ব দিন। হয় আমাকে, নয় অ্যাগনেস্কে।

— কেন? কেন নয় দুজনকেই যৌথভাবে? সেটাই তো জানতে চাইছি আমি।

— স্যার! আপনাকে বেছে নিতে হবে। বেছে নিন—প্রশ্নটা হয় শিল্প সম্বন্ধীয়, নয় রাজনৈতিক। যদি প্রথমটা হয়—তাহলে অ্যাগনেস্ যাবে আমস্টারডামে; সে খুঁজে দেখুক রহস্যটা কী। আর যদি মনে করেন রহস্যজাল ভেদ করতে রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন তাহলে অ্যাগনেস্ যাবে না, দায়িত্বটা আমিই গ্রহণ করব।

— বাট হোয়াই, হোয়াই? কেন নয় দুজনে একসঙ্গে? যৌথ দায়িত্ব নিয়ে? আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না, রহস্যটা কী জাতীয়? এটা তো বুঝছ? প্রশ্ন হচ্ছে একটা—মীগেরেঁ যুদ্ধের কয়েক বছরে কপর্দকহীন থেকে কোটিপতি হয়েছে। কী করে, তা আমরা জানি না। সম্ভবত সে একটি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে—লোকচক্ষুর অন্তরালের এক লুপ্ত মিউজিয়াম! সেটাই খুঁজে বার করতে চাইছি আমরা। রহস্যটা শিল্প-সম্বন্ধীয় তো বটেই কিন্তু তিন-চারটি রাষ্ট্রের নাম ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়ে গেছে রহস্যটার সঙ্গে। নেদারল্যান্ডস্, ফ্রান্স, জার্মানী আর ইতালী! ফলে তোমাকেও চাই। এখন বল—দুজনে একত্রে কাজ করার অসুবিধাটা কোথায়? বিশেষ, তুমি আমস্টারডামের বাসিন্দা।

পঁয়কারে টেবিলের উপর কাগজ-চাপাটাকে নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললে, সত্যি কথাটা স্বীকার করতে সাংবাদিকের এথিঙ্গে বাধছে স্যার!

— সাংবাদিকের এথিঙ্গে? তোমার বিবেক! কী ব্যাপার?

— বস্—এর কাছে সহকর্মীর বিরুদ্ধে কিছু বলাকে প্রাকৃতভাষায় বলে : ‘চুগলিকাটা’!

— আই সী! অ্যাগনেসের বিষয়ে...?

— আপনি অভিজ্ঞ সাংবাদিক। আমাকে দিয়ে স্বীকৃতি নাই বা করালেন?

বৃদ্ধ একটি সিগারেট বার করে ধরালেন। দেশলাই কাঠিটাকে সম্পূর্ণ জ্বলতে দিলেন। তারপর সেটাকে অ্যাশ-ট্রে’র গর্ভে নিক্ষেপ করে বললেন, পঁয়কারে! যেদিন তোমাকে ব্যাপটাইজ করা হয় তার আগেই আমি ফিগারোর সম্পাদক হয়েছি। এ দুনিয়ায় দেখতে এবং জানতে আমার কিছু বাকি নেই। অনেক অনেক-অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির গোপন কথা আমার মগজের গ্রে-সেলে ধরে ধরে সাজানো। চার্লিস থেকে ট্রুম্যান, হল্যান্ডের বৃদ্ধা রাজমাতা ডায়েজার কুইন উইলহেলমীনা থেকে তাঁর যৌবনবতী কন্যা জুলিয়ানা পর্যন্ত সবাই। স্তালিন, শের্তা, দ্য গল কেউ বাদ যাবেন না। তার সঙ্গে তোমার সহকর্মী মাদাম অ্যাগনেস্ শ্যাম্পেন সম্বন্ধে কোন গোপন কথা যদি আমার গোচরে আসে তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। সম্পাদক হিসাবে সব কয়টি কর্মচারীর সবরকম ‘লুপহোল’ সম্বন্ধে আমার অবহিত থাকাই ভাল। তাতে শুধু ফিগারো নয়, তাদেরও মঙ্গল। তুমি যা জান, খুলে বল দিকিন?

পঁয়কারে মনস্থির করে। বলে, অল রাইট স্যার! সব কথাই খুলে বলব আমি। আপনি ঠিকই বলেছেন। ফিগারোর সম্পাদকের পক্ষে প্রত্যেকটি কর্মীর প্রত্যেকটি ‘লুপহোল’ সম্বন্ধে অবহিত থাকা মঙ্গলের। কিন্তু তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো। আমি ডক্টর বার্নার্নির কাছে শুনেছি কিছুদিন আগে অ্যাগনেস্ আপনাকে হান ভাঁ মীগেরেঁর জীবনীটা সংক্ষেপে জানিয়েছিল। তাই নয়?

— হ্যাঁ, বলেছিল। সে-কথা কেন?

— ও কি হান জ্যাক মীগেরের কথা কিছু বলেছে ?

— হান জ্যাক মীগেরের ? সে কে ?

— অরিকুস হান-ভাঁ মীগেরের একমাত্র পুত্র। মীগেরের দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর নাম অ্যানা। তাঁর দুটি সন্তান হয়। পুত্রটির নাম জ্যাক ; কন্যাটির নাম ইনেড। দ্বিতীয়া স্ত্রী জোহানার কোন সন্তানাদি হয়নি। জোহানার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল 1916 সালে, তাঁর একক প্রদর্শনীতে। জোহানা ওয়েলমাল ছিলেন একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ মঞ্চ শিল্পী। সুন্দরী, গ্রাম্যমাস, লাস্যময়ী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিবাহিতা। তাঁর স্বামী ডক্টর ব্যারেল ডি বোয়ের একজন শিল্পসমালোচক। মীগেরের স্ত্রীর আমন্ত্রণ পেয়ে ডক্টর বোয়ের সঙ্গীক প্রদর্শনী দেখতে আসেন। তারপর থেকে জোহানা বন্ধুত্ব ছিল মীগেরের গুপ্ত প্রণয়িনী। 1924-এ অ্যানা দ্য ভুৎকে ডিভোর্স করার পাঁচ বছর পরে মীগেরের জোহানাকে বিবাহ করে। সেই সময়ে ওর প্রথমা স্ত্রী পুত্র-কন্যা সমেত ইস্ট-ইন্ডিজ চলে যায়।

— এসব কথা মোটামুটি শুনেছি অ্যাগনেসের কাছে। তারপর ?

— অ্যানা প্রথমে যায় সুমাত্রাতে। পরে ডাচ-সরকার পরিচালিত একটি স্কুলে চাকরি পেয়ে চলে আসে ব্যাটাভিয়ার (বর্তমানে নাম জাকার্তা), অর্থাৎ জাভা দ্বীপে। ইনেডকে ডর্তি করে দেয় একটি অবৈতনিক মিশনারী স্কুলে। ছেলেটি ততদিনে স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পেয়েছে। মায়ের প্রচেষ্টায় জ্যাক চাকরি পায় ব্যাটাভিয়ার সেক্রেটারিয়েটে। গোয়েন্দার চাকরি। পুলিশ বিভাগে। কিন্তু ছেলেটার মাথায় ছিল দৃষ্ট বুদ্ধি। কী জানি কী করে সে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টির বন্ধুর পড়ে। আপনি জানেন, আহমদ সুকর্ণো আর মহম্মদ হাভা 1927 সালে ঐ রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ অ্যানা ইস্ট-ইন্ডিজ পৌঁছানোর বছর কয়েক পরে। ইতিমধ্যে ডাচ-সরকার ঐ রাজনৈতিক দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দলের দুই কর্ণধার সুকর্ণো আর হাভা তখন জেলে বন্দী। কিন্তু পার্টি যথারীতি আন্তারখাউন্ড কাজ করে যাচ্ছিল। ঐ ছোকরা—জ্যাক—পঞ্চম বাহিনীর কাজে মাথা গলায়। কিন্তু ডাচ কলোনিয়াল সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ জ্যাক-ছোকরাকে ধরে ফেলে। জ্যাক মীগেরের মৃত্যুদণ্ড হয়। ফ্যারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করে যায়। ওর বোন ইনেড মিশনারী স্কুল থেকে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। আর অ্যানা পুত্রের মমাস্তিক মৃত্যু সহ্যেতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

বৃদ্ধ অ্যাশট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বলেন, শুনলাম। এর মধ্যে অ্যাগনেসের প্রসঙ্গ কোথায় ?

— সেটা এবার বলব। জ্যাকের মৃত্যু হয়েছিল উনিশ শ ছত্রিশ সালে। তার বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ। পাঁচ বছর ব্যাটাভিয়ার গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার পর। এই পাঁচ বছরে সে সরকারী দপ্তর থেকে অনেক গোপন নথীপত্র সরিয়ে ফেলে, কিছুর ফটো কপি বানায়। বন্ধুত্ব সে একটি রীতিমত ফাইল তৈরী করে ফেলে—মারামুজ ফাইল! সেই ফাইলের কাগজপত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সক্ষম যে, ডাচ-শাসকেরা ইস্ট-ইন্ডিজের নিগারগুলোর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। আপনি তো জানেনই স্যার—এইসব কলোনিয়াল শাসনে পুলিশকে কিছুটা নির্দয় হতেই হয়—নাহলে নিগারগুলোকে তাঁবে রাখা যায় না। কিন্তু দুনিয়ার ফ্রি-প্রেস সেইসব ‘মাস-রেশিং’ বা ‘জেনোসাইড’কে বরদাস্ত করতে চায় না। জ্যাকের ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল জানি না, কিন্তু সে খুব নিখুঁতভাবে অকাটা তথ্য সংগ্রহ করে গেছে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ

থেকে। ডাচ-ইন্টেলিজেন্স ওর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিমত। এক দলের ধারণা—যেকোন কারণেই হোক জ্যাক ঐ নিগারগুলোর স্বাধীনতা-সংগ্রামে মদৎ যোগাতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ ফাইলটো নিয়ে সে জাপান অথবা আমেরিকায় পালিয়ে যাবে। সেখান থেকে ঐসব দলিল-দস্তাবেজ সমেত প্রবন্ধ লিখে সে ডাচ-সরকারকে বৈজ্ঞানিক করবে—বিশ্বকে জানিয়ে দেবে ডাচ-শাসকেরা কী জাতের অত্যাচার চালাচ্ছে। অপর দলের ধারণা—জ্যাক বিদেশ থেকে ডাচ-সরকারকে চাপ দিত! প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে ঐসব কাগজ ফেরত দিত। কোন্ তথ্যটা সঠিক, জানি না। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, জ্যাক ধরা পড়লেও সেই মারাত্মক ফাইলখানা তার হেপাজতে পাওয়া যায়নি! লোকে বলে, এজন্যই নাকি অ্যানার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়, আর তাতেই সে মারা যায়। আত্মহত্যার ব্যাপারটা সরকারী প্রচার! আর ঐ একই কারণে জ্যাকের বোন ইনেভ ব্যাটাভিয়া থেকে পালায়। ইলোপ-টিলোপ বাজে কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্যাক আদৌ ফায়ারিও কোম্যাডের-এর সামনে দাঁড়ায়নি। ঐ ফাইলটা উদ্ধারের জন্য পুলিশ যে অত্যাচার চালায় তাতেই হঠাৎ সে বেমক্কা মারা যায়।

বৃদ্ধ শুধু মনে করিয়ে দেন, তুমি কিন্তু অ্যাগেনেস্ প্রসঙ্গে এখনো আসনি, পঁয়কারে!

— জানি স্যার। এবার বলব। আমার খবর-জ্যাকের দলে যে চার-পাঁচটি গুপ্তসদস্য ছিল তার মধ্যে ছিল একটি তরুণী। জ্যাকের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। বাস্তবে সে ছিল জ্যাকের প্রণয়িনী, হয়তো বা স্ত্রীই। কারণ পুলিশের সূত্র অনুযায়ী ওরা দুজনে জাভা-সুমাত্রার বিভিন্ন ছোট্টেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে একই ঘরে রাত্রিবাস করেছে। মেয়েটার পিতৃদত্ত নামটা যে কী, তা জানা যায়নি। গুপ্তচর দলে তার নাম ছিল : ‘জিল’। হয়তো ‘জ্যাক অ্যান্ড জিল’ ছড়া থেকেই ঐ নামের সূত্রপাত। মোটকথা সেটা ওর ছদ্মনাম। জ্যাকের দলের প্রত্যেকটি সদস্যই একে-একে ধরা পড়ে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাভা-সুমাত্রা দখল করার আগেই। শুধু ‘জিল’কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর পাওয়া যায়নি সেই মারাত্মক ফাইলটা!

বৃদ্ধ ছাইদানীতে সিগারের দক্ষাবশেষটা ফেলে দিয়ে বললেন, বুঝলাম! কিন্তু অ্যাগেনেসই যে সেই জিল—এমন অনুমান করার সপক্ষে তোমার কী যুক্তি?

— মাদাম অ্যাগেনেস্ শ্যাম্পেনের পূর্ব-ইতিহাস আপনি কতটুকু জানেন স্যার?

— অ্যাগেনেসের বাল্যকাল কেটেছে ডাচ ইস্ট-ইন্ডিজের। ব্যাটাভিয়া না সুরাভিয়া ঠিক জানি না। সেখানকার কলেজ থেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি নেয়। ডাচ-পাসপোর্টে চলে আসে ফ্রান্সে। পারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতাতেই পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পায়। ঐ সঙ্গে ‘ফাইন-আর্টস্’ বিষয়ে কী একটা ডিপ্লোমা। মডার্ন ডাচ-পেইন্টার্সদের উপর গবেষণা করবার জন্য একটা স্কলারশিপ পায়। এই সময়েই পারীতে ডক্টর শ্যাম্পেনের সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয় হয়। ডক্টর শ্যাম্পেন মেডিক্যাল ম্যান-সিদ্ধিদিন কোর্টশিপের পর দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। অ্যাগেনেস্ অতঃপর ফ্রেন্স সিটিজেনশিপ গ্রহণ করে, বিবাহসূত্রে। দুজনে সুইজারল্যান্ডে হনিমুনে যায়। ফিরে এসে অ্যাগেনেস্ শুরু করে তার রিসার্চের কাজ আর তার স্বামী প্রাইভেট প্র্যাকটিস। ঐ সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অ্যাগেনেস্ গবেষণা শেষ করতে পারে না। সে ফিয়ারোতে একটি কর্মসংস্থান করে নেয়। তেতাল্লিশ সালে পারীর রাস্তার যুদ্ধে ডক্টর শ্যাম্পেন শহীদ হন। অ্যাগেনেস্ তার ম্ল্যানেটে এখন একাই থাকে—

— মিসেস্ অ্যাগেনেস্ শ্যাম্পেনের ‘মেইডেন’ নাম কী? তার পিতৃপরিচয়?

— হ্যাঁ, সেটাও জানি। ওর মা আর বাবার বিবাহ হয়নি। বলতে পার সে হিসাবে সে লেঅনাদোঁ দ্য-ভিঞ্চির মতো—বাস্টার্ড! ওর বাপ ছিল কলোনিয়াল ডাচ, মা একজন মুসলিম মহিলা। ডাচ-ইস্ট-ইন্ডিজের একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর কী পদবী ছিল তা অবশ্য জানি না। অ্যাগনেস্‌ ব্যাটাভিয়া থেকে চল আসার আগেই ওর মায়ের মৃত্যু হয়। বাপকে সে তো কোনদিন চোখেই দেখেনি। সে যাই হোক, তুমি এখনো পর্যন্ত এমন কিছু বলতে পারনি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জ্যাক মীগেরের প্রণয়িনী অথবা স্ত্রী ‘জিল’ আর ‘অ্যাগনেস্‌ শ্যাম্পেন’ একই ব্যক্তি।

— এবার সেই কথাই বলছি। পুলিশের হিসাব মতো জিল ছিল জ্যাকের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তার মানে, অঙ্কের হিসাব মতো জিল-এর বর্তমান বয়স উনত্রিশ। অ্যাগনেসেরও তাই। সেটা অবশ্য কোন প্রমাণ নয়। বরং বলা যেতে পারে—বয়সের পার্থক্য দেখিয়ে ঐ সম্ভাবনাকে অ-প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয় কথা—পাসপোর্টের এনডোর্সমেন্ট-মোতাবেক অ্যাগনেস্‌ ডাচ ইস্ট-ইন্ডিস্‌ থেকে ফ্রান্সে এসে মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নামে সতেরই ডিসেম্বর 1936 ; লক্ষণীয়—তারিখটা জিল-এর অন্তর্ধানের তিন মাস পরে। যে সময়টা সচরাচর লাগে ঐ জাহাজের। সেটাও অবশ্য কোন প্রমাণ নয়। তৃতীয়ত, অ্যাগনেস্‌ বাঁ-হাতে লেখে। পুলিশের তথ্য অনুসারে জিল ছিল ‘লেফট-হ্যান্ডার’। চতুর্থত, ডাচ-ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা যায়—জিল-এর ডান হাতে কজির কাছে একটা বড় অপারেশনের দাগ আছে। আশ্চর্যের কথা—অ্যাগনেসের পাসপোর্টে ‘পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক’ হিসাবে ঐ চিহ্নটাই উল্লিখিত। পঞ্চমত অ্যাগনেস্‌ যে রোকেব্রুন-এর হোটেল ‘লা ম্যাগনিফিক’-এ গিয়ে ছদ্মনামে কয়েক রাত্রি বাস করে আসে এটা প্রায় নিশ্চিত—ঐ হোটেলের ম্যানেজার তার ফটো দেখে সনাক্ত করেছে।

— তুমি কেমন করে জানলে ?

— নোদারল্যান্ড ইন্টেলিজেন্স সূত্র থেকে। তারা ‘জিল’-কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের ধারণা সেই মেয়েটির হেপাজতেই আছে ঐ মারাত্মক ফাইলটা।

— কিন্তু রোকেব্রুন-এর সঙ্গে জিল-এর সম্পর্ক কী ?

— অ্যাগনেস্‌ আপনাকে ‘প্রিমেরেরা’ প্রসঙ্গে কিছু বলেনি ?

— ‘প্রিমেরেরা’ ? বস্ত্রচল্লির আঁকা সেই ছবিখানা ? না।

— না, স্যার। বস্ত্রচল্লির ‘প্রিমেরেরা’ নয়। এ একটা বাড়ির নাম। শুনুন তবে—

আমস্টারডাম পুলিশের তথ্যসূত্র থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছিল এবার তা পেশ করে। অর্থাৎ হান ভাঁ মীগেরেঁ দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে হনিমুনে বেরিয়ে মাঝপথে থেমে যায়। মাঝপথ অর্থে দক্ষিণ-ফ্রান্সের ঐ রোকেব্রুন শহর। ছোট গণ্ডগ্রাম—সমুদ্রের কিনারে একটা টুরিস্ট স্পট। কিন্তু স্নানের সুবিধা নেই : তাই টুরিস্টরা বেশিদিন থাকে না। আসে আর যায়। সেখানেই এসে উঠেছিল মীগেরেঁ তার সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী জোহানাকে নিয়ে। তারপর কিম্বদন্ত্যমতঃপরম ! ঐ শহরেই একটা বাড়ি ভাড়া করে সে একা-একা থাকতে শুরু করে। নব পরিণীতা বধু ফিরে যায় পারীতে। এমনটা হয় না, হবার কথা নয়। কিন্তু তাই ঘটেছিল। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে কী-জানি কেন হান ভাঁ মীগেরেঁ দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর স্বেচ্ছাবন্দীর জীবন অতিবাহিত করেন ঐ পাণ্ডববর্জিত গ্রামের একটা ভুতুড়ে বাড়িতে—হ্যাঁ, ‘ভূতের বাড়ি’ বলেই সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা ফাঁকা পড়ে ছিল কয়েক বছর। ওখানে একটি জোড়া খুন হবার পর। বাড়িটার নাম

‘প্রিমেভেরা’ !

এখানে যখন মীগেরেঁ থানা গেড়েছে তারপর থেকেই বিশ্বললিতকলায় পর পর খান-কয়েক ‘ভেরমিয়ার’ আবিষ্কৃত হয়। আর ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকখানি ছবিই কোন-না-কোন সময়ে এসেছে হান ভাঁ মীগেরেঁর সংগ্রহশালায়।

লে লোয়েনের মনে পড়ে গেল—ওর ভিতর পাঁচখানি বিশ্ববন্দিত তৈলচিত্রের আবিষ্কারক স্বয়ং হান ভাঁ মীগেরেঁ।

— ‘প্রিমেভেরা’ ছেড়ে তিনি যখন পুনরায় আমস্টার্ডামে এসে বসবাস শুরু করলেন তখন তিনি কোটিপতি। ইতিমধ্যে তিনি নাকি বার দুয়েক ন্যাশনাল লটারির প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। পৈয়কারের দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে ডক্টর লোয়েন জানতে চাইলেন—তুমি বলছ, মীগেরেঁ ঐ ‘প্রিমেভেরা’তে থাকতে থাকতে প্রথম যে অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কার করেন সেটা সওয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছিল। কে কিনেছিলেন ?

— ডক্টর ডেভিড বুন। ঊনত্রিশে আগস্ট 1937 সালে। ডক্টর বুন আমস্টার্ডামের একটি প্রখ্যাত সলিসিটরস ফার্মের সিনিয়র পার্টনার। অত্যন্ত মানী-ব্যক্তি। অগাধ সম্পত্তির মালিক। সে সময়ে একজন প্রভাবশালী পালার্মেণ্টেরিয়ান। তিনি মিছে কথা বলার লোক নন। তিনিই ঐ সদ্য-আবিষ্কৃত ভেরমিয়ারখানি সওয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে ক্রয় করেছিলেন। ছবিটার নাম ক্রাইস্ট অ্যাট ইয়্যাস। ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে যাচাই করিয়ে। অর্থাৎ ছবিটা সত্যি ভেরমিয়ারের জাঁকা এটা প্রমাণিত হবার পরে।

— মীগেরেঁ ছবিখানি কী করে উদ্ধার করল সে কথা ডক্টর বুনকে বলেছিল ?

— বলতে হবেই। সে একটা আঘাতে গল্প শুনিয়েছিল। তাকে নাকি ছবিখানি এনে দেয় একটি ইতালিয়ান মহিলা—তার নাম ‘মার্ভোরো’।

— সওয়া পাঁচ লক্ষের ভিতর মীগেরেঁ সেই মহিলাকে কত দিয়েছিল ?

— তার হিসাব নেই ! মার্ভোরোকে মীগেরেঁ আদৌ কিছু দিয়েছিল কি না তার প্রমাণ নেই। বরং নেনারল্যান্ডস্ ইন্সট্রিক্শন থেকে আর একটি বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম আমি : উনিশ শ ঊনচল্লিশে, মানে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মাস ছয়েক আগে রোকেব্রুন-এর হোটেল ‘লা ম্যাগনিফিকে’ একটি মেয়ে একা এসে উঠেছিল। বছর চব্বিশ বয়স। রেজিস্টারে সে নাম লেখায় ‘মার্ভোরো’। লিখেছিল তার প্রাক্তন নিবাস : মিলান, ইতালী। উদ্দেশ্য হিসাবে লিখেছিল : দেশ ভ্রমণ। মেয়েটি দিন-তিনেক পরে হোটেল থেকে বেমক্কা নিখোঁজ হয়ে যায়। স্থানীয় পুলিশ সন্দেহ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মস্যুয়ে মীগেরেঁ তখনো থাকতেন ঐ ‘প্রিমেভেরা’য়। একেবারে একা। অতবড় বাড়িতে। চাকর-বাকর, হেল্পিং-হ্যান্ড কিছু ছিল না। নিজেই রাঁখাবাড়া করতেন। নিজেই বাসনপত্র ধুতেন। বাড়ি থেকে বারই হতেন না। শুধু মাঝে মাঝে বাজার করতে বার হতেন। দিবারাত্র একটা জোয়ান মানুষ অতবড় বাড়িতে কেমন করে দিন কাটায় এ নিয়ে পাড়া-পড়াশীদের দূরন্ত কৌতূহল। পুলিশ যখন নিরুদ্দিষ্টা ‘মার্ভোরোর’ সন্ধান করছে তখন মীগেরেঁর এক প্রতিবেশী পুলিশ-স্টেশনে এসে গোপনে জানিয়ে যায়—প্রিমেভেরার চিম্নি দিয়ে নাকি ক্রমাগত ঘোঁয়া বার হয়। তাতে অনেক সময় দুর্গন্ধ থাকে। এমনকি মধ্যরাত্রেও—যখন গৃহস্বামী প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রাগত তখনো ঘোঁয়া বের হওয়া বন্ধ হয় না। পুলিশের সন্দেহ হয়, ঐ বিদেশী আর্টিস্ট ভদ্রলোক যে কোন কারণেই হোক মেয়েটিকে খুন করেছে। পুলিশ অবশ্য

কোন ‘মোটর’ খুঁজে পায়নি। হত্যা করার হেতুটা। কারণ সন্দেহভাজন ব্যক্তি যে ঐ মাদ্রোখ নামের মেয়েটির কাছে থেকে একটি অনবদ্য ভেরমিয়ার উদ্ধার করেছেন, আর সেটা প্রায় পাঁচলক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেছেন—এ খবর পুলিশ পায়নি। কারণ ডক্টর বুন তথ্যটি গোপন রেখেছিলেন। মীগেরের অনুরোধেই। কারণ মীগেরে ডক্টর বুনকে বলেছিল, মাদ্রোখ ছবিটা ইতালী থেকে গোপনে নিয়ে এসেছে। তার নামটা জানাজানি হলে তার উপর ফাসিস্ত ইতালী অত্যাচার করবে। এদিকে ডক্টর বুন আবার জানতেন না যে, ঐ গণ্ডগামে অর্থাৎ রোকেব্রুন-এর পুলিশ মীগেরেকে মার্ডার চার্জ-এ অভিযুক্ত করতে চায়। মাদ্রোখের অন্তর্ধানের বিষয়েও তিনি আমস্টার্ডামে বসে কোনও খবর পাননি। সে যাই হোক, রীতিমত সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্লেক্স পুলিশ প্রিমেভেরাতে খানা-তল্লাসী করে। আপত্তিজনক কিছুই পায়নি। মোটকথা মীগেরের বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। ওদিকে মাদ্রোখকে তারপর আর কেউ কোথাও দেখেনি! বৃদ্ধ লোরেন অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, পঁয়কারে! তুমি বোধহয় ঠিক কথাই বলেছ। এ তদন্ত যৌষ্ণ্যভাবে হবার নয়! ঠিক আছে, তোমাকে এ দায়িত্ব আমি দিচ্ছি না। অ্যাগনেসের সঙ্গে আর একবার কথা বলি। তবে অ্যাগনেস যখন আমস্টার্ডামে যাবে, তখন সব ব্যবস্থাপনা তোমাকেই করতে হবে। অর্থাৎ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা।

॥ পাঁচ ॥

অফিস ছুটি হতে যখন আর মিনিট-দশেক বাকি তখন অ্যাগনেস শ্যাম্পনের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুলে নিতেই ও-প্রান্ত থেকে সম্পাদক ডক্টর লোরেন বললেন, তুমি বাড়ি যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। কথা আছে।

ফাইল-পত্র গুছিয়ে অ্যাগনেস একবার টয়লেটে গেল। সম্পাদকের ঘর থেকে সে সোজা পথে নামবে। তাই অভ্যাসমত টয়লেটে গিয়ে চুলটা একটু ঠিক করল। মুখে-চোখে জল দিয়ে টিশু-পেপারে মুছে নিল। হাল্কা করে লিপস্টিক লাগালো। তারপর সম্পাদকের চেম্বারে এসে দেখে তিনি ওর প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষা করছেন।

— বস, তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে।

অ্যাগনেস সামনের ডিজিটিং-চেয়ারে আলতো করে বসল।

— আগামী কালকের ‘ফিঙ্গারোর’ হেড-লাইন নিউজটা দেখেছ?

— না স্যার, কেন?

ডক্টর লোরেন বললেন, হান ভাঁ মীগেরে আমস্টার্ডামের পুলিশ-কমিশনারকে একটা চ্যালেঞ্জ ছো করেছেন : সে পুলিশের চোখের সামনে নতুন একখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার পয়দা করে দেবে। পুলিশ-কমিশনার ডি-ভেল্ডি সে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন! আমস্টার্ডামে এখন শুরু হচ্ছে সেই দ্বৈরথ-সমর।

অ্যাগনেস মাথামুণে কিছুই বুঝতে পারল না। বলে, তার মানে?

— তার মানে, মীগের দাবী করেছে—গত ছয় বছরে যে নয়খানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটি তার নিজে-হাতে আঁকা! ‘ইন্সয়েন্স-এর পাবলিশারী যীশু’

থেকে শুরু করে ‘অ্যাডালটারেস’, প্রত্যেকখানি ছবি নাকি পয়দা হয়েছে হান ভাঁ মীগেরের ভুলি থেকে!

— এ তো বন্ধ উম্মাদের প্রলাপ, স্যার! ঐ নয়খানি ছবিই তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছেন আর্ট-কনৌশারেরা! এমনকি ডক্টর ব্রেডিউস স্বয়ং! সার্টিফাই করেছেন—সেগুলি অরিজিনাল ভেরিমিয়ার। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারী তা লক্ষ-লক্ষ গিল্ডার্সে কিনে সাজিয়েছে! তা নকল-ছবি হতেই পারে না!

— মীগেরের বক্তব্য-সে-সব কথা ও জানে। ওর বক্তব্য বিশ্বের যাবতীয় আর্ট-কনৌশার ভুল করেছেন! প্রত্যেকটি ছবি তার নিজ-হাতে আঁকা। ডি ভিল্ডিকে সে বলেছে—পুলিসের চোখের লাগনে সে আবার একখানা অরিজিনাল ভেরিমিয়ার এঁকে দেবে—যা দেখে কোনও সান-অব-এ-বীচ আর্ট-কনৌশার ধরতে পারবে না। বলবে সেটাও ভেরিমিয়ারের হাতের কাজ! ডি ভেল্ডি সেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন। মীগেরেকে তার স্টুডিওতে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে! একমাস ধরে সে ঐ ছবিখানা আঁকবে রুদ্ধদ্বারের অভ্যন্তরে, একমাত্র পুলিশ-প্রহরায়।

অ্যাগনেস্ অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিল না। সে যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। যেন অনেক-অনেকদিনের নিরুত্তর-প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সে মনের ভিতরটা হাতড়িয়ে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা অসম্ভব! তা হতেই পারে না। খুব সম্ভবত মস্যুয়ে মীগেরে তাঁর মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ডিলিরিয়াম বকছেন!

— ডি-ভেলডিরও তাই ধারণা।

— আপনি এখন কী করতে চান?

— আমি এইমাত্র আমস্টার্ডামের পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে ট্রাঙ্কলে কথা বললাম। সে রাজী হয়েছে একমাত্র আমার কাগজের প্রতিনিধিকে ঐ রুদ্ধদ্বার কক্ষ উপস্থিত থাকবার অনুমতি দিতে। সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে। এ একটা দুর্লভ সুযোগ। আমি জানি, টাইম্‌স্, ডেলি টেলিগ্রাফ, এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেন্স জার্নাল ‘মাতিন’ও অনুরূপ প্রস্তাব পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ডি ভেল্ডি শুধুমাত্র ফিগারোকে যে সুযোগ দিতে রাজী হয়েছে; তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে চাই আমি। কাল সকালের প্লেনেই তুমি আমস্টার্ডাম চলে যাও। একমাস থাকতে হবে তোমাকে। সব খরচ-খরচা—বলা বাহুল্য—পত্রিকার। সব ব্যবস্থা করবে আমস্টার্ডামে আমাদের প্রতিনিধি পঁয়ক্যারে।

অ্যাগনেস্ বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। কাগজ-চাপাটা নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, ডি-ভেল্ডি আর সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র ফিগারোকেই যে এককথায় অনুমতি দিল এ ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে না?

— এককথায় তো সে রাজী হয়নি। তাকে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে হয়েছে—।

— আপনি কি জানিয়েছিলেন—আপনার নিজস্ব প্রতিনিধির নাম?

— হ্যাঁ, জানিয়েছি। দেখলাম, সে তোমাকে নামে চেনে। ডি-ভেল্ডি নিজের আর্ট-কালেকটর। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি নাকি দেখবার মতো। তাই সে তোমার নাম জানে—মানে, ফিগারোর অ্যাসিস্টেন্ট আর্ট-ডিরেক্টররূপে।

দ্বাখা ঝাঁকিয়ে অ্যাগনেস বলে, না স্যার, এর পিছনে অন্য ব্যাপার আছে।

— অন্য ব্যাপার! মানে? কী ব্যাপার?

— আমাকে সে ব্যক্তিগতভাবে জানে, চেনে। যুদ্ধ বাধার আগেই আমি একবার আমস্টার্ডামে গিয়েছিলাম—এ ডাচ-শেইটারদের নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে। কোন একটা অলীক অভিযোগে নেদারল্যান্ড-পুলিস আমকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। আমি কোনক্রমে ওদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। তাই ডি-ভেল্ডি যেই শুনেছে আশনি আমাকেই পাঠাতে চাইছেন, অমনি সে রাজী হয়ে গেছে। আমাকে হল্যান্ডের যে-কোন জায়গায় দেখতে পেলোই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

বৃদ্ধ কুণ্ঠিত ভূতঙ্গ বলেন, অভিযোগটা যখন অলীক, তখন আমার পক্ষে সেটা জেনে রাখা ভাল। কী জাতের অভিযোগ?

— সেটা স্যার, আমার পার্সোনাল ব্যাপার। আমি বলতে পারব না।

বৃদ্ধ গভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! তারপর বলেন, তার মানে সবটাই অলীক অভিযোগ নয়। তাই কি?

— আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, স্যার।

— আই সী! তাহলে আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও :তুমি জ্যাক মীগেরের নাম শুনেছ?

অ্যাগনেস্ চকিত মুখ তুলে তাকায়। বলে, হ্যাঁ, কেন?

— সেদিন আমি যখন হান ভাঁ মীগেরের জীবনীটা জানতে চাইলাম তখন তো তুমি বলনি, যে হানের একমাত্র পুত্র জ্যাক দেশদ্রোহিতার অপরাধে বাটাভিয়ায় প্রাণ দিয়েছে?

অ্যাগনেস একটু গুছিয়ে নিয়ে বললে, সেটা মসুঁয়ে মীগেরের জীবনের ঘটনা নয়। জ্যাক প্রাণ দিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে বাবার বিবাহ-বিচ্ছেদের অনেক পরে।

— তুমি যখন সুমাত্রাতে থাকতে তখন জ্যাক মীগেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে?

— আপনি এসব প্রশ্ন কেন করছেন?

— কারণ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সব সহকর্মীর সব রকম ‘লুপহোল’ সম্বন্ধে আমার অবহিত থাকা দরকার। বল, জ্যাক মীগেরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে?

হঠাৎ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় অ্যাগনেস্। বলে, আপনি যা জানতে চাইছেন তা আমি মুখে বলতে পারব না। আমার লিখিত স্টেটমেন্ট আধঘণ্টার মধ্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লোরেন একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু অ্যাগনেসকে বাধা দিলেন না।

অ্যাগনেস্ গট্গট্ করে ফিরে এল নিজের টেবিলে। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। অধিকাংশ সহকর্মীর চেয়ার খালি! যারা রাত্রে শিফটে কাজ করবে তারা ই শুধু যে-যার কাজে নিবদ্ধদৃষ্টি। অ্যাগনেস ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। মিনিট-পাঁচেক গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবল। লেটার-প্যাডের উপর আনমনে আঁকিবুঁকি কাটল কিছুক্ষণ। তারপর সে মনস্থির করল। টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলে একখণ্ড কাগজ ভরে দিল তাতে। বাড়তি কার্বন দিল না। অফিস-কপি রাখবে না সে। তারপর তার দু-হাতের দশটা আঙুল কালবৈশাখী ঝড়ের মাতনে নেচে উঠল। মিনিট-দশেক পরে মেশিন থেকে কাগজটা বার করে পড়ল। না, মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আঙুলগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কোন ছাপার ভুল হয়নি চিঠিখানায় :

“ডিমার ডক্টর লোরেন, নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কিছু গুপ্তকথা থাকে, যা দ্বিতীয় ব্যক্তি—এমনকি জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকেও

জানানো যায় না—এম্‌প্‌রয়ার তো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, আপনার যুক্তিটাও অনস্বীকার্য! সম্পাদক হিসাবে সব কর্মীর সব-রকম ‘লুপ-হোল’ সম্বন্ধে আপনার অবহিত থাকা প্রয়োজন। না হলে এতবড় দায়িত্বশূর্ণ কাগজের সম্পাদনা করবেন কেমন করে? দুটি সমস্যার একটিমাত্র সমাধান। সেই সমাধানটুকু এ পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম! আপনার কাছে আমার না-দেখা বাপের স্নেহ পেয়েছি, এজন্য বিদায় কৃতজ্ঞতা জানাই। আচ্ছা, বাপকে কি মেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়? ঠিক জানি না। জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি!”

এই ব্যক্তিগত চিঠির সঙ্গে স্টেশন্‌ল করে গেঁথে দিল তার ফর্মাল পদত্যাগপত্র। চিঠি দুটি খামে ভরে মুখটা বন্ধ করল। খামের উপর লিখল : ‘ব্যক্তিগত ও জরুরী’।

এবার উঠে ওর পার্সোনাল লকারটা খুলল। বার করে আনল একটা নীল রঙের ডেশিয়ার ফাইল সেলোফেন পেপারে মোড়া। ইতস্তত করল। হাতঘড়িটা দেখল একবার : সন্ধ্যা সাতটা। বাইরে পারীর পথে-পথে তখন আলো-আঁধারের লুকোচুরি। যুদ্ধবিধ্বস্ত পারী তখনো নিয়নবাতির শতনরী পরিধান করেনি তার কণ্ঠে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুলি অপসারিত হয়নি। এমন আলো-আঁধার পথে ঐ ফাইলটা নিয়ে বার হতে সাহস হল না অ্যাগনেসের। একটা পরাধীন দেশের শতশহীদের রক্তে রাঙানো ঐ মূল্যবান ফাইলখানাই ওর ক্রুশকাষ্ঠ। ও স্বেচ্ছায় সেটা কাঁধে বয়ে বেড়াবার দায়িত্ব নিয়েছে! কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত!

ফাইলটাকে যথাস্থানে রেখে লকারটা বন্ধ করল আবার। চাবিটা হাত-বটুয়ায় ভরে লোরেনের খামটা খুলে ফেলল। পত্রশেষে একটি পুনশ্চ সংযোজন করল :

“অফিস-লকারে আমার কিছু মূল্যবান কাগজপত্র রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। কাল দিনের বেলা এসে সেগুলি অপসারিত করব এবং শূন্য লকার আমার স্থলাভিষিক্তের জন্য রেখে যাব।”

নতুন খামে চিঠিখানা ভরে আবার নাম লিখল।

সম্পাদকের চেম্বারে ব্যক্তিগত কোন চিঠি বা কাগজ পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ বেষ্ট-কেরিয়ার আছে। সেটা ক্রমাগত চলতে থাকে। তার উপর খামটা রেখে ও পথে নামে।

একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। কাল থেকে ও বেকার।

ফিগারোর হেড-অফিস প্লাস দে লা কঁকদ-এর দক্ষিণে পঁদে লা কঁকদে। সে’ন নদীর উত্তর পারে। অ্যাগনেসের অ্যাপার্টমেন্ট অনেকটা পূবে—পঁদে দামিয়েং ছাড়িয়ে। অফিস থেকে ফেরার পথে ও সাধারণত ভুগর্ভ টিউব-রеле যায়। তাতে সময়টা সংক্ষেপে হয়। আজ তার হাতে অটেল সময়। বস্তুত এখন সময় কাটানোই ওর পক্ষে বিড়ম্বনার। কাল থেকে সে-সব কথা ভাবা যাবে। আজ ও হেঁটে ফিরবে অনেকটা পথ। সে’ন নদীর উত্তর-পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। অফিস ছুটির ভীড়। শিল্পিল্ করে মানুষজন চলেছে। ওদের জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে প্রিয়জন। নদীর ওপারটা বরং ফাঁকা। পঁ দে আংস্ সাঁকো বেয়ে সে চলে এল সে’ন এর বাম তীরে। সামনেই অ্যাস্তুং দ্য ফ্রাস্ ; তারপরেই নত্রদাম গীজা। একটি দ্বীপের মধ্যে। গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে উমানন্দের শিবমন্দিরের মতো। নত্রদাম গীজার দূশাশ দিয়েই বয়ে চলেছে সে’ন। তফাৎ এই উমানন্দের মতো নত্রদাম গীজায় উপনীত হতে হলে ভয়াবহ নৌযাত্রার প্রয়োজন নেই। পারী নগরীর এক দিক্‌চিহ্ন ঐ গীজাটি—‘হাঙ্ক ব্যাক’-এর কাহিনীখনা

স্থাপত্যটি। বিশ্বললিতকলার সৌভাগ্য বলতে হবে নাৎসী বিমানের বোমাবর্ষণে পারীর এইসব শতাব্দীসঞ্চিত স্থাপত্য বিধ্বস্ত হয়নি। নদীর এই বামতীরে পাশপাশি ত্রিপলখাটানো কফি-কনারি, স্ন্যাক-বার, আইসক্রীম-পার্কার আর মদিরা-বিপণী। অ্যাগনেস একটা কিয়স্ক-এ এসে বসল। সেল্ফ-হেল্প্‌ আয়োজন। হঠাৎ ওর মনে হল বেকার-জীবনের এই উন্মাদনাট্য সেলিব্রেট করা উচিত। ও একপাত্র রেমি মার্চিন কনিয়াগ্‌ নিয়ে জমিয়ে বসল। সচরাচর সে শ্যাম্পেন পান করে না। আজ ওর বিগত জীবনসঙ্গীর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। ওর স্বামী ডক্টর শ্যাম্পেন থাকলে আজ ওকে নিশ্চয় অভিনন্দন জানাত—এই সিদ্ধান্তের জন্য।

অ্যাগনেস্‌ কী করতে পারত? ফিগারো পত্রিকার গোপনবার্তা যেমন সে জানাতে পারত না তার জীবনসঙ্গীকে, তেমনি আজ ফিগারো-সম্পাদককেও জানাতে পারে না ডক্টর আহমেদ সুকর্ণের গোপন কথাটাও! আবদুল মহম্মদের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! ঐ ফাইলটার কথা সে আজীবন গোপন করে রাখবে—যতদিন না সেই রেস্তোরার—সেই ব্যাটাভিয়া-বন্দরের কিনারে ‘লাল-ড্রাগন’ পান্থশালার বাকি আধখানা বিল-ভাউচার নিয়ে প্রত্যাশিত মানুষটি উপস্থিত হয়। মনে আছে নির্দেশ—গ্রে-সুট, লালটাই, শোখরাজের টাইপিন পরা একটা অজানা মানুষ এসে ওর কাছে দশ-ডলারের ভাঙনি চাইবে। ওকে দেখাবে সেই বিল-ভাউচারের বাকি আধখানা! স্পষ্ট মনে আছে সেই সঙ্ক্যার ঘটনাটা। সেই যেদিন সে ইস্ট-ইন্ডিজ ত্যাগ করে ইউরোপের পথে রওনা হয়েছিল।

ব্যাটাভিয়া বন্দরের ‘লাল-ড্রাগন’ রেস্তোরায় একান্তে দুটি চেয়ার দখল করে বসেছিল ওরা দুজন — অ্যাগনেস আর আবদুল মহম্মদ। রেস্তোরার ছোকরা টেবিলে রেখে গেছে আহাৰ্য-পানীয়। সী-ফিশের ঝোল, ভাত আর স্থানীয় একটা নরমজাতের মাদকপানীয়। রেস্তোরাঁ তখন প্রায় নির্জন। এত সঙ্ক্যারাত্রি কেউ ডিনার খেতে আসে না ব্যাটাভিয়ায়। মহম্মদ বলেছিল, জিল-বহিন, ভুলো না, তোমার নাম অ্যাগনেস : তোমার বাবা আর মায়ের বিবাহ হয়নি। তুমি বাস্টার্ড! হঠাৎ যদি কেউ পিছন থেকে তোমাকে ‘জিল’ নামে, অথবা তোমার স্বনামে ডেকে ওঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে না। এই ভুলটা অনেকেই করে ফেলে, ধরা পড়ে যায়। তাই পথে বার হবার সময় প্রতিবার স্মরণ করবে আবার এই সাবধানবাণী—মনে করবে, আজই কেউ তোমাকে ঐভাবে ফাঁদে ফেলতে চাইবে। নিজের নামটা ভুলে যাবে, নিজের সত্য পরিচয়টাও। আজ থেকে তুমি অ্যাগনেস্‌ আহমেদ!

অ্যাগনেস্‌ জানতে চেয়েছিল, সে মেয়েটি আসলে কে?

—আমারই এক কাজিন! মারা গেছে! তারই পাসপোর্টে তুমি ফ্রান্সে যাচ্ছ।

—কিন্তু এই পাসপোর্টটা যে জাল তা ধরা যাবে না?

—কেমন করে যাবে? তোমাদের দুজনের একই বয়স, তোমার ডান-হাতের কব্জিতেও অপারেশন করা হয়েছে, পাসপোর্টে যে ফটো সাঁটা আছে সেটা তোমার। তোমার যে দৈহিক বর্ণনা আছে—নীল চোখ, ব্রন্ড চুল, মায় পাসপোর্ট অফিসারের স্বাক্ষর আর সীলটাও সাঁচ্চা! ধরবে কেমন করে?

—কী করে জোঁগাড় করলে এমন পাসপোর্ট?

—ডাক্তার সা’ব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পাসপোর্ট অফিসেও আছে আমাদের পার্টির লোক।

— সে কি ইন্দোনেশিয়ান ? ডাচ নয় ?

আবদুল হাসল। বলল, বোকার মত কথা বলছ কেন জিল-বহিন ? তুমি কি ডাচ নও ? জ্যাক মীগেরের ধমনীতে কি ডাচ-রক্ত বইত না ?

হঠাৎ জ্যাকের উল্লেখে অ্যাগনেসের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ন্যাপকিন্ দিয়ে চোখটা মুছে নেয়। আবদুল অনুতপ্ত হয়ে বলে, আয়াম সরি !

— না, না, তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। হঠাৎ এই বিদায়বেলায় জ্যাকের কথা উঠে পড়ায়...যাক সে-কথা, কী-যেন বলছিল তখন ?

— তোমাকে একটা অত্যন্ত জরুরী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি। শোন, মন দিয়ে শোন— চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবদুল মহম্মদ নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, তোমার কেবিন নম্বর হচ্ছে সাতাশ। ডবল্-বেডেড কেবিন। তোমার সঙ্গিনী একজন মিশনারী নান্—ডাচ মহিলা। তুমি জাহাজে উঠে কেবিনটা খুঁজে নেবে। দুটি বিকল্প সম্ভাবনা—হয় সেই মহিলাটি তোমার আগেই কেবিনে উপস্থিত হতে পারেন, অথবা তোমার পরে। সে যাই হোক, তুমি উপরের বাস্কেটা নিও। সেটাই স্বাভাবিক—বর্ময়সী সহযাত্রীকে নিচের বাথটা ছেড়ে দেওয়া। তুমি কেবিনে পৌঁছেই এই ছোট্ট অ্যাটাচি-কেসটা তোমার উপরের বাস্কে রেখে দেবে। তারপর কেবিনের বাইরে এসে অপেক্ষা করবে। একজন জাপানী ভদ্রলোক—যিনি তোমাকে চেনেন, কিন্তু তুমি তাঁকে চেন না—করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসবেন। তাঁর পরনে থ্রে-রঙের সুট, গলায় লালরঙের টাই, তাতে শোখরাজ বসানো টাইপিন। তাঁর হাতে থাকবে ছবছ ঐ রকম একটা অ্যাটাচি-কেস। তোমার কাছে এসে তিনি বলবেন, ‘মাদমোয়াজেল, তোমার কাছে দশ-ডলারের ভাঙানি হবে ?’ তুমি বলবে, ‘হ্যাঁ, হবে। কেবিনের ভিতর আমার পার্সটা আছে।’ তারপর তোমরা দুজনেই কেবিনে ঢুকবে। তুমি তোমার অ্যাটাচি-কেস খুলে পার্স থেকে দশ-ডলারের ভাঙানি দেবে এবং ভদ্রলোক তোমাকে এই দশ-ডলারের নোটটা দেবেন। নম্বরটা দেখে রাখ। তারপর তুমি তোমার সহযাত্রিনী ডাচ মহিলাটিকে—যদি তিনি কেবিনের ভিতরেই থাকেন—আড়াল করে দাঁড়াবে। জাপানী ভদ্রলোকটি ভাঙানি নিয়ে চলে যাবার সময় নিজের অ্যাটাচি-কেসটা রেখে ভুল করে তোমার অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে যাবেন। বুঝলে ?

অ্যাগনেস্ বলেছিল, বুঝেছি, কিন্তু এসব করা হচ্ছে কেন ?

— তুমি যখন জাহাজে উঠবে তখন তোমাকে ওরা সার্চ করবে। তাই তোমার অ্যাটাচি-কেসে থাকবে সাধারণ জামা-কাপড়-কসমেটিক। ঐ জাপানী ভদ্রলোক যিনি অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে জাহাজে উঠবেন, তিনি জ্যাকের সেই মারাত্মক ফাইলটা নিয়ে উঠবেন। ফাইলটাকে ইন্দোনেশিয়ার বাইরে পাচার করতে চাইছি আমরা। তোমাকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। পারবে ?

অ্যাগনেস্ বলেছিল, ধর যদি আমি রাজী হই। তারপর ? আমি ওটা নিয়ে কী করব ?

— সে কথা পরে বলছি; কিন্তু তার আগে তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার— ফাইলটা সমেত যদি তুমি ধরা পড়, তাহলে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত—এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?

— না বোঝার কোন কারণ নেই।

— তার পরেও তুমি জানতে চাইছ—ফাইলটা নিয়ে কী করবে ?

অ্যাগনেস হেসে বলেছিল, আবদুল, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি জ্যাককে ভালবাসতাম! সে যেজন্য প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত! এবার বল, ফাইলটা নিয়ে আমি কী করব? কাকে হস্তান্তর করব?

আবদুল মহম্মদ জবাব দিতে পারেনি। কারণ ঠিক তখনই বেয়ারাটা রেন্ডোরার বিল-ভাউচার আর ভাঙানি নিয়ে উপস্থিত হল। আবদুল তাকে এক ‘রোশেয়া’ বকশিস দিল। লোকটা পিছন ফিরতেই আবদুল পেড বিলটাকে দুটুকরো করে একটি টুকরো অ্যাগনেসের দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, নাও এটা ধর।

— কী ওটা? কী হবে?

— যত্ন করে রেখে দাও তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে। শোন, তুমি কখন কোথায় থাকবে তা আমরা খবর রাখব। তুমি শুধু ঐ ফাইলটা অত্যন্ত সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রেখ। সময় আর সুযোগ মত আমাদের লোক তোমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করবে। হয়তো পাঁচ-দশ বছর পরে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে। তার পরিধানেও থাকবে ঐ একই পোশাক— গ্রে-সুট, লাল টাই, পোখরাজের টাইপিন। কিন্তু সেটাই সনাক্তিকরণের শেষ চিহ্ন নয়। কাউন্টার এস্পায়োনেজও ঐ পোশাকে তোমার কাছে ঐ ভাবে উপস্থিত হতে পারে। তাই সনাক্তিকরণের-চিহ্ন এই ভাউচারের বাকি আধখানা। খাঁজে-খাঁজে যদি মিলে যায় তবেই তুমি নিশ্চিত হয়ে তাকে দিয়ে দেবে ঐ গচ্ছিত সম্পদ!

অ্যাগনেস সেই শত-শহীদের রক্তে রাঙানো গচ্ছিত সম্পদটা আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজও।

অ্যাপার্টমেন্টে যখন এসে পৌঁছালো তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

ভেবেছিল, জামা-কাপড় ছেড়ে নাইট-গাউনটা পরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তাও হল না। ওর দরজার সামনে অপেক্ষা করছে ফিগারো-অফিসের এক ‘কুরিয়ার’। জরুরী চিঠিপত্র বিলি করার কাজ তার। ওকে দেখে বলল, খ্যাঙ্ক গড, রাত শেষ হবার আগেই আপনি এসে পৌঁছেন।

— কী ব্যাপার? তুমি?

— কাগজপত্রগুলো নিয়ে সই করে আমাকে মুক্তি দিন, ম্যাডাম। সেই সন্ধ্যারাত থেকে ধনী দিয়ে বসে আছি।

অ্যাগনেস কথা বাড়ায় না। মোটা ম্যানিলা কাগজে মোড়া এন্ডেলপটা নিয়ে ওর খাতায় সই করে দেয়। স্বয়ং সম্পাদকের দপ্তর থেকে এসেছে—পার্সোনাল ও অর্জেক্ট সীল-চিহ্ন সমেত। বড় খামখানির ভিতর আরও একটি সীলমোহর করা খাম। সেটির প্রাপক মসুঁয়ে পর্য্যকারে—আমস্টারডামের বিশেষ সংবাদদাতার নাম লেখা। সেটাও ‘পার্সোনাল এবং অর্জেক্ট’। আর অ্যাগনেসকে লেখা ফিগারো সম্পাদকের একখানি চিঠি—ওর পদত্যাগপত্রের জবাব :

‘মাই ডিয়ার অ্যাগনেস,

‘নিজের ক্রুশ যারা নিজেরাই বহন করে তাদের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবার অধিকার থাকে সাম্রাজ্য ভেরোনিকার-ও। আমি সেই সাম্রাজ্য ভেরোনিকার ভূমিকাটুকুই পালন করছি মাত্র। তোমার পদত্যাগপত্রটি প্রত্যর্পণ করলাম। ‘দুটি সমস্যার একটিমাত্র

সমাধান আছে’— তোমার, যুক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি। এই সঙ্গে আমস্টার্ডাম-এ যাবার এয়ার-টিকিট যুক্ত করে দিয়েছি। কাল সকাল নয়টায় তোমার প্লেন। আমস্টার্ডামে এয়ারশোটে তোমাকে রিসিভ করতে আসবে পঁয়কারে—তাকে তুমি ভালই চেন। তার নাম-লেখা খামটা তাকে দেবে। তোমার জন্য আমস্টার্ডামে হোটেল বুক করে রেখেছে পঁয়কারে। ফরেন এক্সচেঞ্জও সেই যোগাবে। তোমার ডেসপ্যাচ সেই প্রত্যাহ পাঠাবে। তোমার লকারে যে সব জরুরী কাগজপত্র রেখে গেলে তার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত থেক। আরও একটা কথা—ডি-ভেলডি তোমাকে গ্রেপ্তার করবে না—এ গ্যারান্টি দিয়ে রাখছি। করলেই বা কী? সাংবাদিকতার কাজে খানিকটা ঝুঁকি তো নিতেই হয়। ফিগারো সম্পাদকের আশ্বাস পেয়ে নিশ্চয় তুমি সেটুকু রিস্ক নেবে। পঁয়কারে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তার কথা মেনে চলবে। তোমার এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, বাপ্ কি মেয়েকে কৃতজ্ঞতা জানায়? ঠিক জানি না। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার। সেটা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।”

চোখ দুটি জলে ভরে এল অ্যাগনেসের।

॥ ছয় ॥

বারই জুলাই, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ—অর্থাৎ জেরার মুখে যেদিন ও আত্মসমর্পণ করল। এ কয়দিন দুঁজ আর ইন্টারোগেশানে আসেনি। দুঁজকে দেখলেই বন্দী ‘হোস্টাইল’ হয়ে ওঠে। সাফ জবাব দেয়—তোমার কোন কথার জবাব আমি দেব না। আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কী, আগে তাই বল। তারপর আমার সলিসিটরকে সামনে রেখে যা বলার তা আমি বলব। ফগে ইন্টারোগেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আমস্টার্ডাম পুলিশের কমিশনার ডি-ভেলডি স্বয়ং। অবশ্য তাঁর সময় অল্প। প্রশাসনিক কাজেই তাঁর দিন যায়। তবু তিনি নিজেও আর্ট-কলেকটর। বহুদিনের জানা-শোনা মীগেরের সঙ্গে। তাই প্রতিদিনই সম্মুখ এসে বসেন। মীগেরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা, খোশ গল্প চলে—অধিকাংশই আর্ট সম্বন্ধীয়। কোন্ পত্রিকায় কী জাতের প্রবন্ধ বার হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা। বন্দী যেন বুঝতে না পারে যে, তাকে জেরা করতেই আসছেন উনি। অনেক বইপত্রও সরবরাহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে! বন্দী কিছু সে সব নাড়াচাড়া করে না। দিবারাত্র চুপচাপ বসে থাকে। কী যেন ভাবে!

ওর সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে মর্ফিয়ার অভাব!

গত দশ-পনের বছর ধরে সে প্রতিদিন সম্মুখ একটা করে মর্ফিয়া ইন্জেকশান নেয়। জেল-কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করেনি।

নেশার তাড়নায় যখন ছটফট করে না তখন সে অতীত-দিনের রোমন্থন করে চলে শুধু।

অ্যানা সৌভাগ্যের মুখ দেখে যায়নি! অ্যানার অন্তর্ধানের অনেক পরে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল

মীগেরেঁ। কিন্তু প্রথমবার ছন্নড়-ফোঁড় সৌভাগ্যে আকাশের চাঁদ যখন ধরা দিল—পুত্রকন্যা এবং তাদের গর্ভধারিণী জননীর সন্ধান করেছিল কলোনিয়াল অফিসে গিয়ে। ঠিকানা যোগাড় করতে সক্ষমও হয়েছিল। অ্যানা তখনও জাকার্তায় ইন্ডুল মাস্টারী করে, আর জ্যাক তখনো জাকার্তাতেই কর্মরত। মোটা অঙ্কের একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়েছিল প্রাক্তন স্ত্রীর নামে। সেটা 1936 সাল। ব্যাঙ্ক ড্রাফটখানা ফেরত এসেছিল ওর কাছে। চিঠির জবাব দিয়েছিল—অ্যানা মীগেরেঁ নয়, তার যুবক পুত্র : জ্যাক। জ্যাকের বয়স তখন কত? বছর বাইশ-তেইশ। তারুণ্যে ডরপুর। জীবনমৃত্যুকে যে বয়সে মনে হয় পায়ের ভৃত্য। জ্যাকের চিঠিখানা কি সে রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল? না কি আজও রাখা আছে ব্যাঙ্ক-ভল্টে? মনে নেই। কিন্তু চিঠিখানার কথা মনে আছে। মায়া চিঠির ভাষাটুকুও।

জ্যাকের সন্ধানখনটা ভুলবার নয়—‘ডিম্বার মসুঁয়ে মীগেরেঁ!’ বাপকে লেখা সন্তানের চিঠি! লিখেছিল, ‘আমার মা তাঁর পূর্বজীবনের বেদনার স্মৃতি বহন করতে অশারঙ্গ এবং অনিচ্ছুক। তাঁর মতে—যা হারিয়েছেন তার পরিপূরক নেই—অস্তুত অর্থমূল্যে! এখানে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি আমাদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছেন। ফলে ‘অর্থ’ কী, তার অর্থ তাঁর না-জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে জানাতে চান যে, লটারির টিকিটে আপনি হঠাৎ অগাধ অর্থ উপার্জন করেছেন শুনে তিনি আনন্দিত। তিনি আরও জানাতে বলেছেন যে, আপনার এই অর্থপ্রাপ্তি তাঁর কাছে অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয়। তিনি তৃপ্তি পাবেন ঐভাবে লাভ করা আপনার অতুল বৈভব যদি সংপক্ষে ব্যয়িত হয়। পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে। ইতি জ্যাক।’

চিঠিখানা পাঠ করে রীতিমতো অবাক হয়েছিল মীগেরেঁ। একাধিক কারণে।

প্রথম কথা, অ্যানা কেন তার দান প্রত্যাখ্যান করল? অভিমান? প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও? দ্বিতীয় কথা, জ্যাক কেন লিখেছে—এই লটারি পাওয়ার ব্যাপারটা তার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয়?’ কথাটার মানে কী? এটা কি অ্যানার কাছে ‘প্রত্যাশিত দুঃসংবাদ?’ না কি ‘আশঙ্কিত সুসংবাদ?’ কী বলতে চেয়েছে ওরা? কতটা বুঝতে পেরেছে? এবং শেষ কথা, জ্যাক কেন লিখেছে—পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টায় মীগেরেঁর তরফে বিপদের আশঙ্কা আছে?

শেষ প্রশ্নটার জবাব অনতিবিলম্বেই পেয়েছিল।

জানতে পেরেছিল—চব্বিশ বছরের জ্যাক তার ওলন্দাজ-রক্তকে অস্বীকার করে ঐ কয়লাকালো নিগারগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। হাঙা না সুকার্নে—কী যেন নাম—সেই হতভাগাগুলোর দলে ডিড়ে গিয়েছিল। চেয়েছিল ডাচ কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাতে। প্রাণ দিল তাতেই।

— মসুঁয়ে মীগেরেঁ! আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমি বন্ধুস্থানীয়। আপনার কোন ক্ষতি কি আমি করতে পারি? তাহলে কেন আমাকে সব কথা খুলে বলছেন না?

— মসুঁয়ে ডি-ভেল্ডি, সব কথা খুলে বললে আপনি ভাববেন আমি পাগল! তা ছাড়া সব কথা আমি নিজেও যে জানিনে ছাই! আমার কাছেও অনেক কিছু রহস্যঘন!

— কী রহস্যঘন? কোন ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছেন না?

— ঐ ‘ম্যাজুরোথ এপিসোড’টা—সে কেমন করে হোটেল রেজিস্টারে স্বাক্ষর করল?

— কেমন করে আবার ? সবাই যে ভাবে করে ! সমস্যাটা কোথায় ?

— কী আশ্চর্য ! ‘মাজুরোখ’ তো কোন বাস্তব মানুষ নয় ! নামটা যে আমি পয়দা করেছি। সে যে আমার মনগড়া একটা কাল্পনিক চরিত্র। সে কেমন করে হোটেল রেজিস্টারে সহি করবে ?

— আপনি আবার সেই স্ট্যান্ড নিচ্ছেন ? ‘মাজুরোখ’ একটা কাল্পনিক মেয়ে ?

— কী করব ? আপনিই যে আমাকে সব সত্যি কথা বলতে বলছেন !

— তাহলে ‘মাজুরোখ’ আপনাকে ছবিখানা দেয়নি বলতে চান ? ঐ ‘অ্যাডালটারেস’ খানা ? কিন্না তার আগে সেই ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্মায়ুস’ ?

— সে-কথাই তো বলছি তখন থেকে ।

— তাহলে কে দিয়েছিল ছবিখানা ?

মীগেরেঁ হঠাৎ মনস্থির করে। বলে, সে-কথাও বলেছি। আপনারা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছেন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আমি ডিলিরিয়াম বক্ছি।

— কী কথা ? কী বলেছেন ?

— ভেরমিয়ারের ঐ ‘অ্যাডালটারেস’ ছবিখানা আমাকে কেউ দেয়নি। ওখানা আমি ঐঁকেছি। নিজে হাতে ! ঐ প্রিমেভেরাতে বসে !

ডি-ডেলডি শ্রাণু করে বলেন, আবার আপনি আবোল-তাবোল শুরু করেছেন !

— না, না, না ! বিশ্বাস করুন ! ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি— শুধু ঐ ‘অ্যাডালটারেস’ নয়, বুয়েছেন—দশ-বছরের ভিতর আমি কম-সে-কম চৌদ্দখানা ছবি ঐঁকেছি যা লক্ষ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি হয়েছে ! বুয়েছেন ? আট-দশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারিতে সেগুলি আজও শোভা পাচ্ছে ! সব—সবই নকল ! দশখানা ভেরমিয়ার, দুখানা দিহ, এক-একখানা ফ্রান্স হাল্জ্ আর তেবোর্গ ! এক-আধখানা নয়। দশ বছরে দশখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার—যা মহান-শিল্পী ভেরমিয়ার নিজেও আঁকতে পারেননি !

ডি.ডেলডি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তবু কথার পিঠে কথা চালিয়ে যেতে হবে। বলেন, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন মস্যুয়েঁ মীগেরে। আপনি ডক্টর বুনকে যখন ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্মায়ুস’ ছবিখানি বিক্রি করতে যান তখন তিনি সেটা ডক্টর ব্রেডিউস্কে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিয়েছিলেন !

— তাতে কী হল ?

— তাতে প্রমাণ হল যে, ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্মায়ুস’ স্বয়ং ভেরমিয়ারের আঁকা — আপনার আঁকা নয় ! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ডক্টর ব্রেডিউস্ ছিলেন ভেরমিয়ার বিষয়ে অথরিটি। তিনি শুধু হল্যান্ডের নয়, বিংশতাব্দীর পৃথিবীতে..

— সব চেয়ে বড় বোকা-পাঁঠা ! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, বুড়োটা ইতিমধ্যে ফৌৎ হয়েছে। না হলে তাকে কান ধরে ওঠ-বোস্ করতে হত ! নিজে মুখেই স্বীকার করতে হত সে শুধু হল্যান্ডের নয়, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে সবচেয়ে বিশ্বাস্য বোকাপাঁঠা !

— বেশ, ব্রেডিউস্-এর কথা ছাড়ুন। আজকের দুনিয়াতেও আছেন অনেক অনেক আর্ট-কনৌশার এবং ভেরমিয়ার-বিশারদ। আমি যদি তাঁদের এখানে সমবেত করি তাহলে আপনি তাঁদের কাছে প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্মায়ুস’ ছবিখানা ভেরমিয়ারের আঁকা নয় আপনার আঁকা ?

— না, পারি না। কিন্তু কেন পারি না জানেন? শুনুন বলি : আজকের দুনিয়ায় যাঁরা তথাকথিত ভেরমিয়ার-বিশারদ বলে সম্মান পাচ্ছেন তাঁরা আমার ঐ দশখানি নকল ভেরমিয়ারকে আসল বলে ধরে নিয়ে নানান গবেষণা করেছেন। আর্ট জ্ঞানালে প্রবন্ধ লিখেছেন, পি.এইচ.ডি করেছেন, ডি. ফিল্ করেছেন! এখনো তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাংশন করা অর্থে লেকচার-ট্যার করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কেমন করে আশা করেন—সেই সব স্বনামধন্য বোকাপাঁঠার দল মেনে নেবে যে, তাঁদের গালে আমি থান্ড মেরেছিলাম?

— তাহলে আপনি প্রমাণ করতে পারেন না যে, ওগুলো আপনার আঁকা?

— কেন পারব না? বোকাপাঁঠারা মানতে চাইবে না মানে এ নয় যে, তা প্রমাণ করা যাবে না।

— কিন্তু প্রমাণ করবেন কার কাছে?

— বিজ্ঞানের কাছে। তথাকথিত আর্ট-কনৌশরদের কথা ভুলে যান মস্যুয়েঁ ডি.ভেল্ডি। আপনি কিছু প্রথমশ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে জোগাড় করুন দিকি— পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র যারা বোঝে—মাইক্রো-কেমিস্ট্রি, রেডিওগ্রাফি, এক্স-রে ফটোগ্রাফের উপর যারা পড়াশুনা করেছে। আমি ল্যাবরেটরিতে বসে তাদের কাছে প্রমাণ করব এ ছবিগুলি বিংশ শতাব্দীতে আঁকা। আমার আঁকা তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারব না। তাই আমার বিকল্প প্রস্তাবটা মেনে নিন না মস্যুয়েঁ কমিশনার?

— কী আপনার বিকল্প প্রস্তাব?

— পুলিশ-প্রহরায় আমাকে একখানা ছবি আঁকতে দিন। আমার নিজস্ব স্টুডিওতে। আমার স্বাভাবিক খাদ্য-পানীয় মফিয়া মঞ্জুর করুন। একখানা চারশ বছরের পুরানো ক্যানভাস আর কিছু খনিজ-আকর আমাকে সরবরাহ করুন। কথা দিচ্ছি—একমাসের মধ্যে আপনার ঐ দুঁজ না দুয়া কী-যেন নাম—ওর চোখের সামনেই আমি আর একখানা নতুন অরিজিনাল ভেরমিয়ার পয়দা করে দেব। ইতিমধ্যে ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে আমন্ত্রণ করুন—

— শুয়োরের বাচ্চা?

— ঐ যাদের আপনি আর্ট-কনৌশার আর ভেরমিয়ার-বিশারদ বলেন আর কি! নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, লন্ডন, পারীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই তেনাদের ডেকে পাঠান। আমস্টারডামে একটি ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ সোয়াইল,’ অনুষ্ঠিত হক। ওদের শুধু জানাবেন না যে, পুলিশ প্রহরায় ছবিটা আমিই আঁকেছি। দেখবেন, বিশ্বের তাবৎ ভেরমিয়ার-বিশারদ মুক্তকণ্ঠ হয়ে যাবেন নতুন একটি ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ায়। তাবৎ রাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি আপনাকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে সেই ছবিটি খরিদ করতে চাইবে।

— অল রাইট! আই অ্যাকসেস্ট য়োর চ্যালেঞ্জ, স্যার!

হান ভাঁ মীগেরের এই সদস্ত ঘোষণা এবং নেদারল্যান্ড পুলিশের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের খবরটা চাপা রইল না। দুনিয়ার সব কাগজে পরদিন এই বিচিত্র কেচ্ছাটি প্রকাশিত হল। লন্ডন-টাইমস্ প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছেপেছিল :

HE PAINTS FOR HIS LIFE

শিরোনামার নিচে একটি ছবি। জেলখানায় নয়, নিজের স্টুডিওতে পুলিশ প্রহরায় তুলি-হাতে হান ভাঁ মীগেরেঁ। শিল্পীর সামনে একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাস। তাতে রঙ চাপেনি তখনো। একমাসের মধ্যে ঐ শূন্য ক্যানভাসটা নাকি মস্তবলে হয়ে যাবে নবতম আবিস্কৃত ‘অরিজিনাল’ ভেরমিয়ার !

॥ সাত ॥

— ‘অপারেশন মীগেরেঁ’-অভিযানে তুমি আমার সঙ্গে যৌথ-দায়িত্ব নিতে কেন অস্বীকৃত হলে, পঁয়কারে ?

পঁয়কারে গাড়ি চালাতে চালাতে তার পার্শ্ববর্তিনীকে এক নজর দেখে নিল। আমাস্টার্ডাম এয়ারটার্মিনালে সে এসেছিল অ্যাগনেসকে রিসিভ করতে। লে লোরেনের ট্রান্স-টেলিফোনের নির্দেশ পেয়ে। নিজের গাড়িতে এখন মহিলাটিকে নিয়ে চলেছে বিমানবন্দর থেকে শহরের একটি খানদানী হোটেল-এ। বললে, খবরটা তোমার কানে গেল কেমন করে ?

— বাঃ ! এখন তো ফিগারো অফিসের প্রতিটি জানলার সার্শি পর্যন্ত সে খবরটা জানে। এ নিয়ে প্রতিটি সেকশ্যান্ নানান মুখরোচক আলোচনায় এখন মুখর।

— মুখরোচক আলোচনা ! সেটা কী ধরনের ?

— কারও কারও মতে তোমার-আমার মধ্যে নাকি তীব্র রেশারেশি—মুখ দেখাদেখি নেই। দ্বিতীয় দলের মতে অফিসের প্রতিযোগিতার জন্য নয়, তোমার-আমার ঝগড়াটা সম্পূর্ণ অন্য কারণ। তুমি নাকি...

— কী হল ? মাঝপথে থেমে গেলেন কেন ?

— তুমি নাকি আমার কাছে ‘প্রশোজ’ করেছ, আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

পঁয়কারে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, ওদের কি কাজকর্ম নেই ?

— সে হিসাব আমাদের না করলেও চলবে। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেলেন।

— কী প্রশ্ন ? ও, হ্যাঁ ! কিন্তু কে-বললে যৌথ-দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি ? এই তো তোমার জন্য হোটেল কঁতিনেতালে ঘর বুক করেছি, এয়ারপোর্টে এসেছি তোমাকে রিসিভ করতে, নিজের গাড়িতে তোমাকে পৌঁছেও দিছি। আর তাছাড়া আরও একটা মস্ত দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে আমাকে : হল্যান্ডের চতুঃসীমার ভিতরে তোমার নিরাপত্তা।

— নিরাপত্তা ! সেটা আবার কী জাতীয় জন্তু ? ইয়োরোপে যুদ্ধ তো অনেকদিন থেমে গেছে ! গুলি-গোলা যা চলছে তা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। হল্যান্ডে আমার বিপদ কিসের ?

— ও প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করব, অ্যাগনেস ! তুমি এয়ারপোর্টে আমাকে যে চিঠিখানা দিলে তাতে ডক্টর লোরেন আমাকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, টাইপ করা চিঠির ঐ লাইনটা আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন। বিশ্বাস না হয় দেখ, আমার বাঁ-পকেটে রয়েছে।

অ্যাগনেস উৎসাহ দেখালো না। ‘শ্রাগ্’করল শুধু। ভাবখানা : বৃদ্ধের ভীমরতি ধরেছে।

পঁয়কারে আবার একবার আড়চোখে দেখে নিল তার পার্শ্ববর্তিনীকে। সে জানে, ভালভাবেই জানে—মেয়েটা কী প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হল্যান্ডে এসেছে। অ্যাগনেস ‘জিল’ কি না তা পঁয়কারে নিশ্চিতভাবে জানে না—কিন্তু এটুকু জানে, ডাচ-সরকার সেই রকম সন্দেহ করে। পঁয়কারে এও জানে যে, অ্যাগনেস জানে না : পঁয়কারে কতটা জানে ! সে এবার

বললে, তুমি মাথা ঘুরিও না অ্যাগ্নেস্‌, সামনের ‘ভিউ-ফাইন্ডারে’ লক্ষ্য করে দেখ তো—আমাদের ঠিক পিছনেই যে কালো-রঙের মাসেডিজ-খানা আসছে তার আরোহী দুজনের কাউকে চেন কি না।

নির্দেশ মতো আয়নাটাকে সরিয়ে-নড়িয়ে অ্যাগ্নেস পিছন-গাড়ীর যাত্রী যুগলকে দেখল। দুজনই পুরুষ। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। একজনের চোখে কালো চশমা, অপরজনের মোম-দিয়ে পাকানো গোঁফ। কাউকেই চিনতে পারল না। বলল সে কথা।

পঁয়কারে বলে, এয়ারপোর্টে কাস্টমস্‌ যখন তোমার সুটকেস্‌ তখন করছিল তখন ওরা দুজন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তোমার পিছনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল তোমার সুটকেসের ভিতরটা।

অ্যাগ্নেস বলে, হয় তো ওরা দুজন ঐ একই ফ্লাইটে এসেছে। হয় তো ‘কিউ’এ ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল ওরা। আর ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখা? ওটা তোমার সন্দেহবাতিক মনের বিকার।

— না, ওরা একই ফ্লাইটে আসেনি। আমি যখন এয়ারপোর্টে তোমার প্লেনের ল্যান্ডিং-এর জন্য অপেক্ষা করছি তখন ওরা এয়ারপোর্টেই ছিল। আমার মনে হচ্ছে ওরা তোমাকে ‘ফলো’ করছে!

অ্যাগ্নেসের বুকের ভিতরটা যে ছাঁৎ করে উঠলো মুখে সে ভাবের প্রতিক্রিয়া হল না। বললে, ঋমোখা আমাকে ‘ফলো’ করতে যাবে কেন? আমি কিছু হীরে-জহরৎ স্মাগল করে আনিনি! আর দেখেও তো ওদের ‘ক্রিমিনাল’ বলে মনে হচ্ছে না।

— না ‘ক্রিমিনাল’ নয়, তবে ‘ক্রাইম’-এর সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক—‘ক্রিমিনাল’ ধরে বেড়ানো। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে তুমি ওকে চেন না, আমি চিনি। ওর নাম : জাঁ ভাঁ যেংসু। ও ডাচ-ইন্টেলিজেন্সের একজন দুঁদে গোয়েন্দা! ছোটখাট অপারেশনে ওকে দেখা যায় না—কিন্তু জালে রাঘব-বোয়াল পড়বার সম্ভাবনা থাকলে ওকে ডাকা হয়।

অ্যাগ্নেস স্বাভাবিক হবার জন্য হাতবটুয়া খুলে লিপ্‌স্টিকে ঠোঁটটা মেরামত করল কিছুক্ষণ। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, তুমি ওকে চিনলে কেমন করে?

— তুমি জান না, ‘ফিশারো’তে চাকরি নেবার আগে আমি ‘ডাচ-ইন্টেলিজেন্সে’ ছিলাম?

— ও হ্যাঁ, তাই তো! সেজন্যই তোমার মাথায় এইসব উদ্ভট চিন্তা! তা বেশ তো, —এস, একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। পরের ক্রসিং-এ ‘সিগন্যাল’না দিয়ে তুমি বেমক্স লেন চেষ্টা করে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকো যাও! দেখা যাক পিছনের গাড়িটা কী করে?

— পুলিশে যদি টিকিট ধরিয়ে দেয়? ফাইনটা কে দেবে?

— তুমি! যেহেতু অলীক আশঙ্কাটা তোমার।

— অল রাইট! তাই করে দেখা যাক।

সামনেই একটা ক্রসিং। কোন সিগন্যাল না দিয়ে নিতান্ত বেআইনীভাবে লেন চেষ্টা করে পঁয়কারে ঢুকে পড়ল পাশের গলিতে। ওদের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক। পিছনের গাড়ির চালক সোজা বেরিয়ে গেল। এমনকি সামনের গাড়ির এই বেআইনী বাঁক-বাঁদরামোর জন্য প্রত্যাশিত খিস্তিটুকু পর্যন্ত না আউড়েই। দুজনেই লুকিয়ে লক্ষ্য করল সে-গাড়ির নাম্বার প্লেটটা।

অ্যাগ্নেস বললে, দেখলে? তুমি গোয়েন্দাগিরির চাকরি ছাড়লেও গোয়েন্দাগিরির ভূত তোমার মস্তিষ্কে ছেঁড়ি যায়নি! রঙ্জুতে আজও সর্গভ্রম হয় তোমার!

পঁয়কারে জবাব দিল না। ঘুরপথে ওরা এসে উপনীত হল হোটেল কঁতিনেতাল-এ।

গাড়িটা গেটে-এ গিয়ে থামতেই ছুটে এল হোটেলের পেজ-বয়। কেরিয়ার থেকে অ্যাগনেসের সূটকেসটা তুলে নিয়ে যেতে থাকে রিসেপশান-কাউন্টারের দিকে। পঁয়কারে তখন গাড়ি ‘পার্কিং-জোন’ এ রাখতে ব্যস্ত। ঠিক তখনই নজর হল অ্যাগনেসের—হোটেলের অপরিদিকে। একটা ‘নো-পার্কিং-জোন’-এ, বস্তুত ফায়ার-প্লাগের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে একখানা কালো রঙের মার্সেডিজ গাড়ি। গাড়িতে কেউ নেই। নম্বর—হ্যাঁ, যেটা অ্যাগনেস মনে করে রেখেছে। সেটাই।

ঘর ‘বুক’ করাই ছিল। সাততলার একটি একক-শয্যাকক্ষ। সাতশ একুশ নম্বর ঘর। সেখানে পৌঁছে পঁয়কারে বললে, এখন বেলা এগারোটা। তুমি বিশ্রাম নাও, লাঞ্চ সারো। আমি বিকাল চারটের সময় আসব। বাধা দিয়ে অ্যাগনেস বলে, এটা নিতান্তই আন-শিয়ালরাস্ হয়ে যাচ্ছে না পঁয়কারে? আমি তোমার গেস্ট! আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ সারব, তুমি বিল মেটাবে... পঁয়কারে স্ব্যাক করে ওঠে, হ্যাং য়োর শিয়ালব্রি! তুমি আমার গেস্ট না হাতি। আমি অফিশিয়াল নির্দেশ মোতাবেক যা করার তাই করছি।

— তার মানে তুমি আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবে না?

— না! লাঞ্চ নয় আমি এখন ব্যস্ত। অনেক কাজ আছে...

— অকৃতজ্ঞ! অসভ্য! একটি সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্যে লাঞ্চ খাওয়ার যে আনন্দ...

— কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও অ্যাগনেস্! আমি বলতে যাচ্ছিলুম, লাঞ্চ নয়, ডিনার!

— লা ম্যাগনিফিক! লা গ্ল্যাভি!!

— আরে সবটা শোন প্রথমে! সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের দুখানা টিকিট কাটা আছে ‘স্টাডস্চৌবর্গ’-এ (যদি Stadsschouwburg শব্দটার বাংলা রূপান্তর সেটাই হয়); আজ গ্যোয়েতের ফ’স্ট (Faust) আছে। শো শেষ হলে আমরা যাব ‘প্যারাদিসো’ (Paradiso) —আমস্টারডামের সবচেয়ে নাম করা নাইটক্লাব।

— ও বব্! এই মুহূর্তে যদি তুমি ‘প্রপোজ’ কর, আমি নির্ঘাৎ তা ‘অ্যাকসেপ্ট’ করে নেব!

— কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আদৌ ‘প্রপোজ’ করছি না! শোন! আরও কতকগুলো কাজের কথা আছে!

— বল?

— আমি ঠিক বিকাল চারটের সময় আসব। তুমি তৈরী হয়ে থেক। প্রথমেই তোমাকে নিয়ে যাব একটা ‘রেস্ট-আ-কার’ শপে। তোমার জন্য একখানা গাড়ি ভাড়া করে দেব একমাসের জন্য। তারপর আমরা যাব ‘কাইজারগচ’-এ।

— ‘কাইজারগচ’ কি একটা ডিপার্টমেন্টাল-স্টোর? আমাকে মিংক-কোট কিনে দেবে বলে?

— আছে না! ‘কাইজারগচ’ একটা রাস্তার নাম। যেখানে বাস করেন : ভেরমিয়ার দা সেকেন্ড—অঁরিকুস্ আন্তোনিয়ুস্ তাঁ মীগেরেঁ।

— উনি এখন পুলিশ হাজতে নেই?

— না, নেই। তুমি কাগজে দেখনি? উনি নিজের বাড়িতে আজ দিন-কয়েক ধরে আঁকছেন একখানা নতুন ‘অরিজিনাল ভেরমিয়ার’। পুলিশ প্রহরায়। তার সাক্ষী থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছে একমাত্র তুমি! মীগেরেঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে আমরা বের হব শহর দেখতে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করব। রাখবে?

— কী বল ?

— কোন কারণে যদি তুমি হোটেল ছেড়ে বাইরে যাও তাহলে আমাকে একটা ফোন করে যাবে। আমি না থাকলে আমার ল্যান্ডলেডিকে জানিয়ে যেও— কোথায় যাচ্ছ, কতক্ষণ পরে ফিরবে।

অ্যাগনেস বলে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না বব্ ? আমি নাবালিকা নই, তুমি ছাড়াও আমস্টার্ডামে আমার বয়-ফ্রেন্ড থাকতে পারে—

পঁয়কারে হঠাৎ ধমকে ওঠে, বারে বারে রসিকতা করে ব্যাপারটাকে চাপা দেবার চেষ্টা কর না অ্যাগনেস। তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস্। আমি জানি যে, তুমিও নজর করে গাড়িখানা দেখছ।

— গাড়ি ? কোন গাড়ি ?

— কালো-রঙের মাসেডিজখানা ! যেটা এখন হোটেলের সামনে ফায়ার-প্লাগ আটকে খাড়া করা আছে।

অ্যাগনেস্ থমকে গেল। পঁয়কারে একই সুরে বলে গেল, ডক্টর লোরেন আমাকে জানিয়ে রেখেছেন, আমস্টার্ডামে তোমাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করবার একটা আশঙ্কা আছে। নিতান্ত বাজে অভ্যুহাতে ! তাই প্রথমটা তুমি এই ‘অ্যাসাইনমেন্ট’টা নিতে চাওনি।

এবারও অ্যাগনেস নীরব রইল। পঁয়কারে বলে, কেন তোমাকে পুলিশে খুঁজছে তা আমি জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু আমার নির্দেশ মেনে না চললে তো আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারব না, অ্যাগনেস। অ্যাগনেস অনেকক্ষণ নীরবে কী-যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে ওর চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, থ্যাঙ্কস্ বব্ ! হ্যাঁ, একটা জটিলতা আছে বটে আমার। কিন্তু সে-সব কথা আমি বলতে পারব না। আমি অপরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডক্টর লোরেন পীড়াপীড়ি না করলে আমি সত্যি এই ‘অ্যাসাইনমেন্ট’টা নিতাম না!...ঠিক আছে ! কথা দিচ্ছি, হোটেল ছেড়ে যদি বাইরে যাই তাহলে তোমাকে জানিয়ে যাব।

— ধন্যবাদ অ্যাগনেস ! তাহলে আর একটা কথাও বলি : বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ঐ কালো গাড়িটার লোক আগেভাগেই জানত যে, তোমার জন্য আমি হোটেল কঁতিনেতাল-এ ঘর ভাড়া করেছি। তাই আমরা যখন বেআইনী বাঁক নিয়ে পাশ কাটলাম তখন ওরা আমাদের অনুসরণ করেনি। সোজা এখানে এসে অপেক্ষা করেছে। ওরা এয়ারোড্রামে গিয়েছিল অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে, বোধ করি কাস্টমস্-এর উপর নির্দেশ দেওয়াই ছিল—তোমার মালপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার। না হলে যে-ভাবে ওরা তোমার মালপত্র তল্ছন করল তা সচরাচর কোন সাংবাদিকের ক্ষেত্রে করা হয় না।

— ঠিক কথা। সাংবাদিক হিসাবে আমারও সেই রকম অভিজ্ঞতা।

— ওরা কি তোমার সুটকেসে বিশেষ কিছু একটা খুঁজছিল ?

— মাপ কর পঁয়কারে, তোমার এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

— ঠিক আছে। আরও একটা প্রশ্নাব : তুমি কি হোটেলটা বদলাতে চাও ?

— লাভ নেই। ওরা টের পাবেই।

— কিন্তু ধর, তুমি যদি আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠ ? আমার অবশ্য এক-কামরার ব্যাচিলার্স অ্যাপার্টমেন্ট; কিন্তু আমি ‘কিচেনেট’-এ শুতে পারি।

এতক্ষণ যে মেয়েটি ক্রমাগত প্রগল্ভতা করছিল এবার সুযোগ পেয়েও সে কোন রসিকতা করল না। বলল, আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। ঠিক আছে চারটের আগে আমি কোথাও যাব না। তুমি এলে এবিষয়ে কথা হবে।

— তোমার লাঞ্ছের কী হবে ?

— খাবার ঘরে আনিয়ে নেব।

পঁয়কারে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অ্যাগনেস তার জিনিসপত্র মোটামুটি গুছিয়ে নিল। টেলিফোনে অর্ডার দিল কিছু খাবার ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। তারপর স্নান করে তৈরী হয়ে নিল। ওর ঘরটা রাস্তার দিকে। উঠে গিয়ে সম্ভরণে এগিয়ে এসে ইতিমধ্যে বারকতক দেখেছে ‘নো পার্কিং জোনে’ গাড়িটা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। নিশ্চয় পঁয়কারে। এ শহরে আর কেউ তো জানে না সে কোন হোটেলে উঠেছে। রিসিভার তুলতেই শুনে শেল রিসেপশন-কাউন্টারের মেয়েটি বলছে, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তাঁকে কি পাঠিয়ে দেব ?

— ভদ্রলোক ? কী নাম ? আচ্ছা টেলিফোনটা তাঁকে দিন প্রথমে। বোঝা গেল ও-প্রান্তে টেলিফোন-রিসিভারটা হাত বদলালো। এবার একটি পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, শুভ-প্রভাত মাদাম শ্যাম্পেন। নাম শুনে তো আমাকে চিনতে পারবেন না। আমার নাম : ইয়ানো নাকামুরা।

নামটি নিঃসন্দেহে জাপানী। তখনো জাপান মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধরত। কিন্তু এসব কথা তো টেলিফোনে বলা যায় না। অ্যাগনেস বললে, না, নাম শুনে চিনতে পারছি না। আমাদের কি কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে ?

— হয়েছে! নয়-বছর আগে। মাত্র পাঁচ-মিনিটের জন্য ব্যাটাভিয়া বন্দরে। আমি কি আপনার পাঁচ-মিনিট সময় নষ্ট করতে পারি ?

অ্যাগনেস রীতিমতো অবাক হল। বললে, প্রয়োজনটা কিসের ? কী চান আপনি ?

— আপনি আমাকে ‘প্লেস’ করতে পেরেছেন তো ? আপনি সেবার আমাকে একটা দশ-ডলারের ভাঙানি দিয়েছিলেন, আর আমি ভুল করে আপনার অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে এসেছিলাম।

অ্যাগনেস বিস্মিত হয়েছে যতটা সতর্ক হয়েছে তার চতুর্ভুজ! বললে, খুব সম্ভবত আপনি অন্য কোন মহিলার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এমন কোন ঘটনার কথা তো আমার মনেই পড়ছে না।

— ঠিক আছে। হয়তো সাক্ষাতে মনে পড়বে। ভুল হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ফিরে আসব। আমি কি পাঁচ-মিনিটের জন্য আপনার ঘরে আসতে পারি ?

মনস্থির করল অ্যাগনেস। বললে, ঠিক আছে। আসুন।

লাইন কেটে দিয়ে আবার জানলার ধারে সরে এল। পর্দার আড়াল থেকে দেখল—না, সেই কালো-রঙের মার্সেডিস্ গাড়িখানা ওখানে নেই। কিন্তু লোকটা কে ? সত্যিই সেই জাপানী ভদ্রলোক ? ব্যাটাভিয়া বন্দরে যার সঙ্গে জীবনে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল, ন-দশ বছর আগে ? যদি তা না হয় ? যদি এইভাবে শত্রুপক্ষ মায়াজাল বিস্তারের প্রচেষ্টা করতে থাকে ? আবদুল মহম্মদের সেই গচ্ছিতসম্পদ—জ্যাকের বকের পাঁজর ক-খানা হাতিয়ে নেবার জন্যই যদি ফাঁদ পেতে থাকে ? দু-চোখ বঁুজে দশ বছর আগে দেখা সেই জাপানী ভদ্রলোকের চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করতে থাকে। মিনিট-পাঁচেক পরে বেজে উঠল কল-বেল। দরজা খুলেই

স্তম্ভিত হয়ে গেল অ্যাগ্নেস !

করিডোরে যে খর্বকায় জাপানী ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পোশাকটায় ।

থ্রে-রঙের সুট, গলায় লাল-রঙের টাই, তাতে শোখরাজ-বসানো টাইপিন ! হাতে একটি ছোট ব্রীফকেস, হুবহু যেমনটি ছিল সেবার । কিন্তু এ ভদ্রলোকের বয়স যেন কিছু বেশি । বাঃ ! তা তো হবেই ! দশ-দশটা বছর কেটে গেছে না ইতিমধ্যে ?

— আসুন, ভিতরে এসে বসুন ।

ভদ্রলোক মাজা ভেঙে জাপানী কায়দায় ‘আরিগাতো’ করলেন । হ্যাট-র্যাকে টুপিটা টাঙিয়ে এসে বসলেন একটি চেয়ারে । হাতের সুটকেসটা খুলে মেলে ধরলেন এবার । বললেন, দেখে নিন । আপনার জিনিস কি না ।

অ্যাগ্নেস বিনাবাক্যব্যয়ে নেড়ে-ছেড়ে দেখল । কিছু কসমেটিক, ব্র্যাসিয়ার, প্যাপ্টি, তোয়ালে, টুথব্রাশ, শেপ্ট । একটা ক্রাইম শিলার ।

বললে, না । একটাও আমার নয় । আমি চিনতে পারছি না ।

— সেটাই স্বাভাবিক । এগুলো তো আপনি কেনেননি, কিনেছিল আবদুল মহম্মদ । আপনি চিনবেন কোথেকে ?

কুণ্ঠিত-ভ্রূত্রে অ্যাগ্নেস বললে, আপনি আদ্যন্ত ভুল করেছেন মসুঁয়ে । আবদুল মহম্মদ নামে কাউকে আমি চিনি না ।

বিচিহ্ন হেসে ভদ্রলোক বললেন, আমাকেও চিনতে পারছেন না ?

— না !

— আমার এই পোশাকটা সত্ত্বেও ?

— পোশাক ! কী পোশাক ?

— এই থ্রে-রঙের থ্রি-পিস্ সুট, লালরঙের টাই, শোখরাজ-বসানো টাইপিন ?

— কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি ! সবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি : আপনার নাম ইয়ানো নাকামুরা । আপনি কি জাপানী ?

— আমার চেহারা দেখলে তাই মনে হয় । আমার বাবা ও মা দুজনেই জাপানী ছিলেন । কিন্তু আমি হল্যান্ডের নাগরিক । বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগে থেকেই । পাসপোর্টটা দেখবেন ?

— ও ! কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন বলুন তো—ব্যাটাভিয়া-বন্দরে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার সুটকেস বদল হয়ে গেছিল সে আজ এই হোটেল আছে ?

— কেন ? আবদুল তো আপনাকে জানিয়ে রেখেছিল । আপনি তো জানেন—আপনি পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তেই যান, আমাদের নজরের বাইরে যেতে পারবেন না । বলেনি ?

— কে ? ঐ আবদুল ? তাকে তো মনেই করতে পারছি না আমি ।

— স্বাভাবিক ! খুবই স্বাভাবিক ! কাউন্টার-এম্পায়োনেজকে রুখতে আপনাকে এভাবেই কথা বলতে হবে । আপনি কি আবদুলের সঙ্গে নিজে একবার কথা বলবেন ?

— সে কি আমস্টার্ডামে ? —সোৎসাহে কথাটা উচ্চারণ করেই মনে মনে জিব কাটল অ্যাগ্নেস ।

যতটা সম্ভব শুধুরে নিতে যোগ করে—আই মীন, আপনার সেই হাইশেখটিক্যাল আবদুল ?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন । তুলে নিলেন টেলিফোন রিসিভারটা । একটা বাইরের নম্বর ডায়াল করে একটু পরে কার সঙ্গে যেন আলাপচারী শুরু করলেন, রহিম ? হ্যাঁ, আমি হোটেল

কঁতিনেতাল থেকে বলছি..হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সাতশ একুশ নম্বর ঘর থেকেই..না, পারছেন না, চিনতে পারছেন না, অন্তত মুখে তো তাই বলছেন...ঠিক আছে, কথা বল...

টেলিফোন রিসিভারটা এবার বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন, কথা বলুন।

— কার সঙ্গে ? রহিম লোকটা কে ?

— আপনি যাকে আবদুল মহম্মদ নামে চেনেন, স্বীকার করছেন না। ও এখানে আন্তার-গ্রাউন্ডে আছে তো। এখানে ওর নাম : রহিম।

অ্যাগ্নেস সাবধানে টেলিফোনের কথা-মুখে বললে, অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন... ইন্ডোনেশিয়ান ভাষায় জবাব ভেসে এল, জিলা! ওঃ! কত যুগ-যুগান্ত পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। মনে হচ্ছে আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট বোনের সঙ্গেই কথা বলছি...

— ছোট বোন ! কে আপনার ছোট বোন ?

— আমার কজিন, জিল-বহিন, যার পাসপোর্টে..যাক ওসব ফালতু কথা। শোন, ভাল করে শোন..বেশি কথা বলা যাবে না..বুঝতেই পারছ, লাইন ট্যাপ হতে পারে।..কিন্তু তুমি বোকার মতো সব কিছু অস্বীকার করছ কেন..না! আমিই ভুল করছি! তুমি বুদ্ধিমতীর মতোই অস্বীকার করেছ। শোন : নাকামুরাকে বল—সেই আখখানা ছেঁড়া ভাউচারটা দেখাতে। সেটাই তো ছিল! অন্তিম সনাক্তিকরণ চিহ্ন! সেই ব্যাটাভিয়া-বন্দরের লাল-ড্রাগন রেস্টোরার বিল ভাউচার। বাকি আখখানা ভাউচার তোমার কাছে আছে নিশ্চয়ই..

— না নেই! —বলেই আবার সামলে নিল, আই মীন, কোন রেস্টোরার আখখানা বিল-ভাউচার আমার কাছে নেই!

— সেটা পারীতে রেখে এসেছ ?

এবার আর ভুল করল না অ্যাগ্নেস। বললে, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না!

— গুড গার্ল! শোন : তোমার কাছে যে অংশটা ছিল, মনে আছে নিশ্চয় তাতে ছিল বিলের ‘রোপেয়া’র অঙ্কটা। আর আমার কাছে ‘লাল ড্রাগন’ রেস্টোরার, ছাপা নাম, বিলের নম্বর আর তারিখ। পাসপোর্টটা নিশ্চয় সঙ্গে আছে— পারীতে রেখে আসতে পার না সেটা। অন্তত তারিখটা মিলিয়ে নিও ফাইলটা হস্তান্তরিত করার আগে। দাও..এবার টেলিফোন রিসিভারটা নাকামুরাকে দাও।

যত্নচালিতের মতো অ্যাগ্নেস যত্নটা বাড়িয়ে ধরল জাপানী ভদ্রলোকের কাছে। নাকামুরা নির্দেশ শুনে নিয়ে টেলিফোনে বললে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছেঁড়া-কাগজটা তো? হ্যাঁ, দেখাচ্ছি ওঁকে। দাইবংসুই জানেন, সেটা দেখলে পরে তাঁর বিশ্বাস হবে কি না—

টেলিফোনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে নাকামুরা তার ওয়ালেট বার করল কোটের বুক-পকেট থেকে। নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল একশও জীর্ণ দ্বিখণ্ডিত কাগজ।

হ্যাঁ, সেটা ব্যাটাভিয়ার কোন এক লাল-ড্রাগন রেস্টোরার নামাঙ্কিত বিল-ভাউচারের অর্থাংশ। ছাপানো কাগজ। তারিখটা পড়া যাচ্ছে, যদিও কালিটা ন্নান হয়ে এসেছে ন-দশ বছরে। পাসপোর্ট-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হল না। ব্যাটাভিয়া-বন্দর ত্যাগ করার চিহ্নিত তারিখটা স্পষ্টই মনে আছে ওর। এতক্ষণে সে নিশ্চিত হল। টেলিফোন-রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, আবদুল!

— শাট আপ!

— সরি! রহিম! তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারে না? সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব? অসম্ভব হয় তো নয়, কিছু খুবই বিপজ্জনক। শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি কেন নিতে যাবে বহিন্?

— একবার, একটি বার তোমার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব।

ও প্রান্তবাসী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললে, ঠিক আছে, টেলিফোনটা নাকামুরাকে দাও।

নাকামুরা ওর নির্দেশ শুনে টেবিলে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে উঁকি মেরে কী যেন খুঁজল। তারপর ফিরে এসে টেলিফোনের কথাগুলো বললে, না, কোন কালো রঙের মাসেডিক্স গাড়ি হোটেলের সামনে নেই।

এরপর সে টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে বললে, ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি আপনাকে আবদুল, মানে রহিমের কাছে নিয়ে যাব। তার আগে বলুন, ফাইলটা কি আপনি পারীতে রেখে এসেছেন?

— হ্যাঁ।

— কোথায়? বাড়িতে না ব্যাঙ্ক-ভল্টে?

— না। আমার অফিসের ড্রয়ারে।

— তার চাবি কি আপনার কাছে?

— হ্যাঁ।

— আপনি তাহলে এক কাজ করুন। চাবিটা দিন। আর আপনার ঐ ‘ফিগারো’ কাগজের লেটার-হেড-এ আমাকে ‘অথরাইজ’ করে একটি চিঠি দিন, যাতে আপনাদের সেক্সানাল ইনচার্জ আমাকে ফাইলটা নিয়ে আসতে দেয়। তাকে বলুন যে, ঐ ড্রয়ারে আপনার কিছু জরুরী কাগজপত্র আছে, সেগুলো ঐ ‘অপারেশন মীগেরে’তে প্রয়োজন, আপনি ভুলে ফেলে রেখে এসেছেন। অ্যাগনেসের সব সন্দেহ, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ততক্ষণে নির্মূল হয়েছে। নিশ্চিত হয়েছে সেও এতদিনে—তারমুত্ত হওয়ায়। জ্যাকের বুকুর পাঁজর-গুঁড়িয়ে বানানো সেই ফাইলটার জগদল বোঝা আর ওকে বয়ে বেড়াতে হবে না। নিশ্চিত মনে সে লেটার-হেড প্যাডের কাগজে ওর সেক্সানাল ইনচার্জকে চিঠিখানা লিখে দিল : পত্রবাহককে সে তার লকারের চাবিটা দিয়ে পারীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে কিছু জরুরী কাগজপত্র নিয়ে আসতে।

চিঠিখানা নাকামুরার হাতে দিয়ে প্রণাম করে, রহিমের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে? বিকাল চারটেয় আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। নাকামুরা ঘড়ি দেখে বললে, তিনটের আগেই আমরা ফিরে আসতে পারব। ঠিক তখনই ডোর-বেলটা বেজে উঠল। নাকামুরা চট করে ঢুকে গেল বাথরুমে। অ্যাগনেস দরজা খুলে দিতেই হোটেল-বয় ঢুকল খাবারের প্লেট হাতে। টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে বিল সহ করিয়ে সে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। বললে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

— না থাক। চলুন, এখনি বেরিয়ে পড়ি। কে জানে, আবার হয়তো সেই কালো গাড়িটা এসে পড়বে।

— ঠিক আছে। তাই চলুন তবে।

মধ্যাহ্ন আহার অস্পর্শিত রেখে যেমন ছিল তেমনই বেরিয়ে এল। কাউন্টারে ঘরের চাবিটা জমা দেবার সময় ওর হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। বব্-এর সেই নির্দেশটা। কিন্তু এটা এমন একটা ব্যাপার যে, বব্কে জানানো চলে না। আর তাছাড়া সে তো তিনটের মধ্যেই ফিরে

আসছে। বব্ টের পাবে কী করে ?

বব্ পঁয়ক্যারে যখন হোটেল কঁতিনেতালে এসে পৌঁছালো তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। অভ্যাসবশেনজর গেল রাস্তার বিপরীতে সেই নো-পার্কিং জোনটায়। না, কালো রঙের মার্বেডিজটা নেই।

রীতিমতো অবাক হল সে, যখন দেখা গেল অ্যাগ্নেস তার ঘরে নেই। নিজের বাড়িতে টেলিফোন করল। না, সেখানে কোন মেসেজ রেখে যায়নি অ্যাগ্নেস।

কাউন্টারে গিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, সাতশ একুশ নম্বর পিজন-হোলটা দেখুন তো, কোনও মেসেজ আছে কি ?

মেয়েটি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বললে, আপনার চাবিটা দেখাবেন কাইন্ডলি ?

— না, আমি আপনাদের বোর্ডার নই। ঐ ঘরটা বুক করেছেন মিসেস্ অ্যাগ্নেস্ শ্যাম্পেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিকাল চারটেয়। অথচ তিনি ঘরে নেই। তাই জানতে চাইছি, আমার নামে কোন মেসেজ রেখে গেছেন কি ?

মেয়েটি পায়রা-খোপটা দেখে নিয়ে বললে, সরি। না, কোন চিঠি নেই।

পঁয়ক্যারে লাউঞ্জে গিয়ে বসল একটি সোফায়। ওর হাতঘড়ি টিক্‌টিক্ করে এগিয়ে চলছে। সাড়ে, চার, পাঁচ, ছয়। অ্যাগ্নেস এখনো ফিরল না। আবার উঠে এল সে। মেয়েটিকে বললে, দেখুন, আমার নাম বব্ পঁয়ক্যারে, অ্যাগ্নেস আর আমি, আমরা দুজনেই পারীর ফিগারো পত্রিকার সংবাদদাতা, আপনি কি চাবিটা আমাকে দেবেন ? ঘরটা আমি দেখে আসতাম তাহলে। কথা শেষ করে সে তার প্রেস-কার্ডটা বাড়িয়ে ধরে।

মেয়ে বললে, দুঃখিত। এটা বেআইনি। বোর্ডারের অনুপস্থিতিতে আপনাকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেওয়া।

পঁয়কারে বললে, আপনার ডিউটি কখন শেষ হচ্ছে ?

— সাড়ে ছয়টায়। অর্থাৎ এখনই।

— সন্ধ্যায় আপনার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?

মেয়েটি হাসল বলল, আছে। আমার বয়-ফ্রেন্ড আমাকে নিতে আসবে। কেন বলুন তো ?

পঁয়কারে পকেট থেকে দুখানি টিকিট বার করে বললে, আমার একটি উপকার করবেন ? অ্যাগ্নেসকে নিয়ে যাব বলে দু'খানা অপেরার টিকিট কেটেছিলাম। আপনারা দুজনে যদি দেখতে যান তাহলে টিকিট-দুটো নষ্ট হয় না। এটা আমার উপহার।

মেয়েটি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে টিকিট দুটো নিল। বললে, ঠিক আছে, আমি একজন 'বয়'কে সঙ্গে দিচ্ছি। তার উপস্থিতিতে ঘর খুলে আপনি দেখে আসুন। সেখানে কোন মেসেজ নিশ্চয় রাখা নেই। যা হোক, আপনি ঘরটা দেখে আসতে পারেন।

হোটেল-বয় ঘরের চাবি খুলে দিল। পঁয়কারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল সব কিছু। দুটো জিনিসে খটকা লাগল তার। টেবিলের উপর নিপুণভাবে সাজানো আছে আহার্য। অস্পর্শিত। অর্থাৎ অ্যাগ্নেস খাবারের অর্ডার দিয়েছিল, খায়নি। দ্বিতীয়ত ওর বিছানায় পড়ে আছে একটা ছোট অ্যাটাচি কেস—যেটা সে পারী থেকে নিয়ে আসেনি। চাবি দেওয়া নেই তাতে। খুলে ভিতরের জিনিস পরীক্ষা করল। প্রসাধনদ্রব্য, টুথব্রাশ, পেস্ট, জামা, ব্র্যাসিয়ার। ব্র্যাসিয়ারটা তুলে পরীক্ষা

করে দেখল—খুব ছোট ছোট অক্ষরে এমব্রয়ডারি করে একটা ট্যাগ লাগানো আছে। আমস্টার্ডামের একটি বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের। অ্যাগ্নেস কখন আমস্টার্ডাম থেকে এটা কিনল? সে নিজেই কিনেছে নিশ্চয়। ব্র্যাসিয়ার কেউ কাউকে উপহার দেয় না। কিন্তু কখন কিনল অ্যাগ্নেস? দ্বিতীয়ত, ঐ বইখানা : ঐ ক্রাইম থ্রিলারখানা? কেমন করে কিনল?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল হোটেলের বয়টা দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। সে নিজে থেকেই বলল, ম্যাডাম না খেয়েই বেরিয়েছেন দেখছি।

— হ্যাঁ, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, সে বেরিয়ে যাবার পরে খাবারটা এসেছে।

— না, মস্যুয়ে। রুম কুড়ি থেকে চল্লিশ আমার এক্সিয়ারে। খাবারটা আমি নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেছি!

— তাই নাকি? কটার সময় বল তো?

— সওয়া বারোটা নাগাদ।

— তখন কি সে ঘরে একা ছিল?

ছেলেটা বিচিত্র হাসল। বলল, আঞ্জে হ্যাঁ। কিন্তু একটা বিসদৃশ জিনিস আমার নজরে পড়েছিল মস্যুয়ে। হ্যাট-র্যাঁকে, ঠিক এইখানটায়, একটা পুরুষের টুপি ঝুলছিল!

— পুরুষের টুপি? তুমি ঠিক দেখেছ?

— ঠিকই দেখেছি। শুধু তাই নয়, ম্যাডাম যখন লিফটে করে নামছেন তখন সেই টুপির মালিককেও দেখেছি। লোকটা নির্ঘাৎ জাপানী।

— জাপানী! কী বলছ তুমি!

যদিও মাত্র একনজর দেখেছে তবু ছোকরা নিখুঁত বর্ণনা দিল লোকটার। ঐ জাপানী শ্রৌঢ় মানুষটার।

— কখন বের হল ওরা?

— ধরুন বারোটা কুড়ি। আমি এ-ঘরে খাবারটা রেখে যাবার পরেই।

পঁয়কারে ওকে ভালরকম টিপ্সু দিল।

নিচে নেলে এসে দেখে কাউন্টারে বসে আছে অন্য একটি মহিলা।

পঁয়কারে পুনরায় লাউঞ্জে গিয়ে বসে। সাতটা, সাড়ে-সাত, আট, নয়! কী হতে পারে? আমস্টার্ডামে কোথা থেকে এসে আবির্ভূত হল একজন জাপানী? কেনই বা এল সে? কেমন করে খোঁজ পেল এই হোটেলের সাতশ একুশ নম্বর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন? আর সবচেয়ে বড় কথা—ঐ অজানা-অচেনা লোকটার সঙ্গে কোন সাহসে অ্যাগ্নেস বেরিয়ে গেল অপরিচিত আমস্টার্ডাম শহরের পথে? ওকে কোনও খবর না দিয়েই?

হঠাৎ যেন টের পেল বব পঁয়কারে—ঐ মেয়েটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। একই অফিসে কাজ করে ওরা। চেনা-জানা অনেকদিনের। অনেক মিটিং এ দুজনে একসঙ্গে উপস্থিত থেকেছে। মেয়েটার চোখে-মুখে কথা। ‘লেগ-পুলিং’ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। মেয়েটির প্রতি ওর মনের কোণায় যে অন্তর্লীন অনুভূতি তিল তিল করে জমে উঠেছিল আজ তার স্বরূপটা বোঝা গেল মেয়েটিকে হারিয়ে। অ্যাগ্নেস নিজের দায়িত্ব নিজেই বইতে পারে—সে ‘জিল’ কি না তা জানা নেই, কিন্তু তার বিগত জীবনের নৈপথ্যে আছে কিছু দুর্জয় রহস্য, যাতে আমস্টার্ডাম পুলিশ তাঁর উপর নজর রেখেছে। পঁয়কারে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল।

সেখানে ঘা খেয়েই ওর পৌরুষ আহত হয়েছে। কিন্তু সে কী করতে পারে? অ্যাগ্নেস যদি ওর কথা না শোনে..

একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে সে সরাসরি টেলিফোন করল আমস্টার্ডাম পুলিশের খোদ বড় কর্তাকে, কমিশনার ডি-ভেল্ডিকে। আত্ম-পরিচয় দিয়ে সে জানালো—কমিশনারের অনুমতি পেয়ে ফিগারো সম্পাদক একজন মহিলা সাংবাদিককে এই শহরে পাঠিয়েছিলেন : মাদাম অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেন। আর সেই মেয়েটি তার হোটেল থেকে আজ দুপুরে বেমকা হারিয়ে গেছে।

ডি-ভেল্ডি ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। তারপর বললেন, কিছু মনে করবেন না মঁস্যিয়ে পঁয়ক্যারে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে তিনি তাঁর কোনও বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে...

— না পারে না! আমি অ্যাগ্নেসকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমস্টার্ডামে তার পরিচিত কোন বন্ধু নেই। আমি প্রায় নিশ্চিত—এটা একটা ‘অ্যাবডাকশান’ এর কেস। নারী অপহরণ।

— তা কেমন করে সম্ভব? হোটেল কঁতিনেতাল একটা খাননানী হোটেল। সেখান থেকে দিন-দুপুরে কোনও মহিলাকে অপহরণ করা সম্ভবপর নয়, যদি না মহিলাটি স্বেচ্ছায় পথে নামেন!

— অ্যাগ্নেস শ্যাম্পেনকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেনি নিশ্চয়?

— মঁস্যিয়ে পঁয়ক্যারে! আপনি একটি দায়িত্বশীল পত্রিকার সাংবাদিক। আপনার জানা থাকে উচিত যে, হোটেলের ঘর থেকে কোন বোর্ডারকে গ্রেপ্তার করলে সেটা হোটেলের ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে করতে হয়। তাছাড়া মিসেস্ শ্যাম্পেন ফরাসী নাগরিক—ব্যাপারটা ফ্রেঞ্চ এম্বাসীকেও জানাতে হয়।

— আপনি আমাকে তাহলে কী পরামর্শ দিচ্ছেন?

— দুটি বিকল্প পরামর্শ। বেছে নবেন আপনিই। প্রথম কথা, আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করুন। কাল সকালেও তিনি যদি ফিরে না আসেন তবে বুঝতে হবে যে, তিনি কোনও নাইট-ক্লাবে গিয়ে বেএজিয়ার হয়ে পড়েননি।

দ্বিতীয়ত, যদি আপনি সন্দেহ করেন যে, এটা একটা ‘অ্যাবডাকশান’ কেস, তাহলে লোকাল পুলিশ-স্টেশনে একটা প্রাথমিক এজাহার দিয়ে রাখুন এবং ফ্রেঞ্চ এম্বাসীকে জানিয়ে রাখুন। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন—পুলিস-কমিশনারের পক্ষে প্রতিটি রমণীর রাত্রিবাসের হক-হদিঙ্গ জানা সম্ভব নয়।

টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে পঁয়ক্যারে যে পদক্ষেপটা করল সেটা কমিশনার সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক নয়। সে থানা অথবা ফ্রেঞ্চ-এম্বাসীতে ফোন করল না। একটা ট্রান্সকল ‘বুক’ করল পারীতে। রাত তখন এগারোটো। তবু বৃদ্ধ সম্পাদকমশাইকে তাঁর দপ্তরেই পাওয়া গেল। আদ্যোপান্ত সবটা শুনে লে লোরেন বললেন, এ ওষ্ঠাহী কিস্তিটা আমার নজরে পড়েনি!

— আজ্ঞে?

— ও-পক্ষ যে এমন একটা চাল দিতে পারে তা আমি আন্দাজ করিনি।

— আমি স্যার, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। কোন পক্ষের কথা বলছেন?

— ‘পক্ষ’ তো একটাই। কৃষ্ণপক্ষ এখন জাপানী অকুপেশনে। শুক্রপক্ষের কথাই বলছি। ‘অ্যারেস্ট’ করলে নানান জবাবদিহি, তার চেয়ে ‘অ্যাবডাকশান’টার আয়োজন করা সহজ! সাপও মরল, লাঠিটাও ভাঙল না। কিন্তু কুইন অফ্ হাটস্ নিয়ে ওরা করবেটা কী? ট্রাম্পের

টেকাটোতো আমার আস্তিনের তলায় !

পঁয়কারে দ্বিতীয়বার বলল না যে, কথোপকথন তার মগজে ঢুকছে না। বলে, আমি কী করব ?

— শোন ! কাল সকালের ফ্লাইটে একজন স্পেশাল মেসেঞ্জার যাচ্ছে। সীলবদ্ধ খামটা খুলে চিঠিখানা পড়বে। দ্বিতীয় একখানা খামে চিঠিটা সীলবদ্ধ করে প্রাপককে হস্তান্তরিত করবে। পার্সোনালি। এনি কোশেন ?

— লোকাল পুলিশ স্টেশন জানাব না ?

— বোকার মত প্রশ্ন এটা, আর কিছু ?

— ফ্রেন্স এম্বাসীকে ?

— প্রয়োজন হবে না। ওঠুশাহী কিস্তিটা চাপা দিতে আমি যে পাগলা ঘোড়াটাকে ঠেলে দেব তাতেই মাং হবে ওরা। মাং না হলেও কাং হবে !

— ঠিক আছে স্যার, কালকে আপনাকে টেলিফোন করে জানাব, কী ডেভেলপমেন্ট হল।

— কাল আমাকে পারীতে পাবে খোড়াই। কাল সকালের ফ্লাইটেই আমি লন্ডন যাচ্ছি। তবে অ্যাগনেস সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা ‘পিতা-পিতা’ ডাকতে ডাকতে ফিগারোর সাংবাদিককে তার হোটেলের পৌঁছে দেবে !

তাই দিল। ঠিক সন্ধ্যার মধ্যেই অবশ্য নয়। এবং ‘পিতা-পিতা’ বলতে বলতে কিনা তাও জানি না।

রাত দশটায় টেলিফোনটা বেজে উঠল পঁয়কারের ঘরে। সেটা তুলে নিতেই শোনা গেল অ্যাগনেসের আতঙ্কতাড়িত কণ্ঠস্বর : বব্ ! তুমি একবার আসতে পারবে ?

— অ্যাগনেস ! তুমি ? কোথা থেকে কথা বলছ ?

— হোটেল কঁতিনেতাল থেকেই। এইমাত্র ওরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

— ওরা ! ওরা কারা ?

— আমার আমার ভীষণ ভয় করছে ! তুমি একবার আসতে পারবে ?

— শ্যিওর ! তুমি ভাল আছ তো ?

— শারীরিক আছি। এলে কথা হবে।

হোটেল কঁতিনেতালে অ্যাগনেসের মুখোমুখি বসে পঁয়কারে জানতে চায়, এবার খুলে বল তো, কোথায় ছিলে সারাটা দিনরাত ? আমাকে না বলে পালিয়েই বা গেলে কেন ?

অ্যাগনেস অধোবদনে বললে, কিছু মনে কর না বব্, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। বাধা আছে—

— হ্যাং য়োর বাধা ! আগে বল : ঐ জাপানী লোকটা কে ? ওকে আগে থেকেই চিনতে ?

অ্যাগনেস অবাক হল। বব্ কেমন করে জানল যে, সে একজন জাপানীর সঙ্গে হোটেল ছেড়ে বার হয়েছে ? কিন্তু সে-প্রশ্ন করল না। প্রাক্তন-গোয়েন্দা বব্ জেনেছে নিশ্চয় কোন সূত্রে। তাই বললে, চিনতাম। উনি বিশ্বস্ত ব্যক্তি !

— হ্যাং য়োর বিশ্বস্ত-ব্যক্তি ! একটা হাড়-হাভাতে বজ্জাং জ্যাপ্ !

— অমন করে ব’লনা বব্ ! ভদ্রলোক শহীদ হয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যে !

— মারা গেছে ? তুমি নিশ্চিত ?

— স্বচক্ষে দেখেছি। কুলেটটা লেগেছিল বুকে! ইন্টারনাল হেমারেজ হচ্ছিল! মুখ দিয়ে গল্গল্ করে...

পঁয়কারে বললে, ওভাবে উল্টোপাল্টা নয়, সব-কথা শুখিয়ে বল দিকনি।

অ্যাগনেস সংক্ষেপে জানালো—এ জাপানী ভদ্রলোকটি তার পূর্বপরিচিত। মানে বছর-দশেক আগে মিনিট-পাঁচেকের জন্য দেখেছে। চেহারাটা মনে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু সে সন্দেহাতীত প্রমাণ দিয়েছিল। টেলিফোন সে অ্যাগনেসের সুপরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেয় ...

পঁয়কারে বাধা দিয়ে বলে, সেই সুপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গেও বোধ করি তোমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। মানে ডাচ ঈস্ট-ইন্ডিজ থেকে ইয়োরোপে ফেরার পরে? ধর বছর-দশেক?

অ্যাগনেস একবার চোখ তুলে তাকালো। তারপর নতনেত্রি বললে, সে কথা ঠিক।

— তাহলে টেলিফোনে শুনেই কেমন করে চিনলে তাকে? কঠস্বরে?

— শুধু কঠস্বরে নয়, সে লোকটা ইন্দোনেশিয়ান ভাষাতেই...

— হ্যাং য়োর ইন্দোনেশিয়ান ভাষা! কয়েক কোটি লোক সে ভাষাটা জানে!

— তুমি বারে বারে ধমক দিচ্ছ কেন আমাকে? ও যে আমাকে বিশেষ একটা ‘ডাকনামে’ ডাকল...

— আই সী! বিশেষ ‘ডাকনাম’! যা দুনিয়ায় কেউ জানে না! যেমন : ‘জিল’! কেমন?

অ্যাগনেস যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, কী? কী বললে?

— ‘জিল’! তা-রী, একটা কানে-কানে ডাকা আদরের ডাক—যা কেউ জানে না!

অ্যাগনেস বললে, জানি না, তুমি তা কেমন করে জানলে—

— তোমার জেনে কাজ নেই। বুঝলাম! এ আদরের ডাক-নামটা শুনেই তুমি মাখনের মত গলে গেলে। তারপর?

অ্যাগনেস তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা সবিস্তারে শোনায। অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে : সেই জাপানী ভদ্রলোক তাকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন শহরের অপর প্রান্তে—বিশেষ একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। সেদিকটায় জনমানব নেই। বোধহয় যুদ্ধ চলাকালে কাপেটি-বস্ত্রিং হয়েছিল! তারপর একটা বড় ভাঙা বাড়ির কাছে ওরা গাড়ি থেকে নামল। কংক্রিটের বড় বড় চাংক ডিঙিয়ে, কাঁটাতারের উপড়েপড়া বেড়া টপকিয়ে ওরা সেই ভাঙা বাড়ির এক জনশূন্য অংশে এসে উপস্থিত হল। ঠিক তখনি ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন গুপ্তা! একেবারে অতর্কিতে! কিছুটা হাতহাতি, মারামারি। কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে থ্রৌড নাকামুরা পারবেন কেন? কোথাও কিছু নেই গুপ্তাদলের একজন রিভলভার বার করে পর পর দুটো শট করল জাপানী ভদ্রলোকের বুকে। উল্টে পড়লেন তিনি। মুখ দিয়ে গল্গল্ করে রক্ত.. দু-হাতে মুখ ঢেকে অ্যাগনেস কঁদে ফেলল।

পঁয়কারে উঠে বসে ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললে, বুঝেছি! তার ঘড়ি, আংটি, মানিব্যাগ নিয়ে ওরা পালিয়ে গেল। আর নিয়ে গেল সেই ‘অথরাইজড লেটার’খানা! এই তো?

অ্যাগনেস তার অশ্রুআর্দ্র দুটি বিহুল চোখ মেলে বললে, তুমি তা-ও জান?

— জানি বইকি, জিল! চিঠিখানায় তুমি এ জাপানী শয়তানটাকে লিখে দিয়েছিলে ‘ফিয়ারো’ অফিস থেকে ফাইলটা নিয়ে আসার অনুমতি! তুমি... তুমি ছেলেমানুষ!

অ্যাগনেস ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। পঁয়কারে তাগাদা দেয়, তারপর কী হল বল?

তুমি কী করলে ?

— আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। জ্ঞান হবার পর দেখি, একটা কারাগারে আমি বন্দী। কারাগার ঠিক নয়, নির্জন একটা ঘর। ঘরে একটা বিছানা ছিল, আমি তাতে শুয়ে। পাশেই টেবিল, তাতে কিছু আহার্য-পানীয়। ঘরটায় সংলগ্ন একটা বাথরুমও ছিল। জানলা ছিল, কিছু বন্ধ। দরজাটাও। একটু শারীরিক বল ফিরে আসার পর বহু ডাকাডাকি করেছে। কেউ সাড়া দেয়নি। হাতে ঘড়ি ছিল, তাই জানি, এভাবেই প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা বন্দিনী হয়ে পড়েছিলাম সেই নির্জন কারাগারে। তারপর রাত আটটার সময় দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এল দুজন যুনিফর্মধারী পুলিশ। তারা কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না। ওরাই পৌঁছে দিল হোটেল।

— ওরা কোথা থেকে খবর পেল তা তুমি জানতে চাওনি ?

— চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বরং জানতে চাইল, আমি ওখানে কীভাবে এলাম। আমি কোন জবানবন্দি দিইনি, ওরা আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে বলেছে যে, আমি যেন ওদের জবানবন্দি না দিয়ে হোটেল ছেড়ে না যাই। মানে হোটেল ছাড়ার আগে যেন থানাকে জানাই।

পাঁয়কারে নিঃশব্দে ঘরে বার-কয়েক পায়চারি করল। তারপর বললে, নাও, মালপত্র গুছিয়ে নাও ! এখনি তুমি হোটেল ছাড়বে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকবে চল।

— কিন্তু ওরা যে বারণ করে গেল। ঐ পুলিশ-অফিসার দুজন।

— সে আমি বুঝব। নাও, ওঠ।

— কিন্তু ঐ নাকামুরার, আই মীন জাপানী ভ্রমলোকটি খুন হওয়ার কথা আমি যে এখনো পুলিশকে বলিনি। সেটা না জানানো আইনভঙ্গ অপরাধ হবে না ?

— না, হবে না। প্রথম কথা, নাকামুরা আদৌ খুন হয়নি। দ্বিতীয় কথা, পুলিশ সব কিছু জানে।

বিহ্বলভাবে অ্যাগনেস বলে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বব।

— এখনো পারছ না ? আশ্চর্য ! ‘ফাইল’টা মমান্তিকভাবে প্রয়োজন কার ? সুকর্ণো বা হান্তার নয় ! তারা এখন জাপানী ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে মরণশপ যুঝছে ! ফলে ফাইলটা হাতাতে চাইছে একজনই—ডাচ ইম্পিরিয়ালিজম-এর তরফে কমিশনার ডি-ভেল্ডি ! জাপান যে হেরে গেছে এটা দু-তিন সপ্তাহেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে। তখন মিত্রপক্ষ বসবে তৃতীয় বিশ্বকে বাঁটোয়ারা করতে। ডাচ গভর্নমেন্ট চাইবে তার ইন্দোনেশিয়ান কলোনিতে নতুন করে জাঁকিয়ে বসতে। তাই তার আগেই ‘ফাইল’টা ওদের চাই। দুনিয়া না জানতে পারে, ওরা এতদিন সেখানে কী জাতের শাসন চালিয়েছে। তাই ঐ জাপানীটাকে ওরাই পাঠিয়েছিল—

— কিঞ্চি তাকে হত্যা করল কে ?

— কেউই হত্যা করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো। হাতাহাতি মারামারি যারা করেছিল—ঐ গুস্তাদল আর নাকামুরা—ওরা সবাই পুলিশের এজেন্ট। চোখের সামনে যে গুলিতে নাকামুরাকে খুন হতে দেখেছ সেটা ব্ল্যাক-কার্ডিজ, যে রক্ত দেখেছ সেটা নাকামুরার যুগ্মের ভিতরে পিষে যাওয়া রঙিন ক্যাপসুল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো—প্রথম কথা, তোমাকে আটকে রাখা; যতক্ষণ না দলের লোক পারী গিয়ে ফিগারো দপ্তর থেকে ফাইলটা উদ্ধার করে আনে। যাতে ইতিমধ্যে তুমি ওদের সন্দেহ করে ট্রাঙ্ককে তোমার সেক্ষানাল ইন্সপেক্টর অন্য রকম নির্দেশ না দিতে

পার। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে জানানো, যে, ফাইলটা হাতিয়ে নিয়ে গেল শুণ্ডার দল!

— কিন্তু সেই আখানা ভাউচার?

— কিসের ভাউচার?

অ্যাগনেস সব কথা খুলে বলতে দ্বিধা করল না এখন। বব্ তো সব কিছুই জানে। আর কী লুকাবে তার কাছে? সব কিছু শুনে বব্ বললে, তোমার উচিত ছিল সেই ছেঁড়া ভাউচারখানা সব সময় নিজের কাছে রাখা। রেস্টোরারঁর একটা ছেঁড়া বিল-ভাউচার কোনক্রমেই তোমার বিরুদ্ধে জোরালো এভিডেন্স হতে পারে না। সেটা যদি সঙ্গে থাকত তাহলে মুহূর্ত মধ্যে তুমি বুকে ফেলতে, ঐ নাকামুরার দাখিল-করা আখানা ভাউচার জাল! তোমার আখানা ভাউচারের সঙ্গে সেটা কিছুতেই খাঁজে মিলত না। ডাচ-ইন্টেলিজেন্স সম্ভবত জানে, ঐ আখানা ভাউচারই হচ্ছে চরম আইডেন্টিফিকেশন। তাই আমস্টার্ডামে ঐ ভাউচারখানা ছাপিয়ে একটা টোপ তৈরী করেছে। ওরা এ চাল নিতে বাধ্য হয়েছে এই আশায় যে, তোমার কাছে এখন এখানে বাকি আখানা ভাউচার নেই।

অ্যাগনেস মাথা নেড়ে বললে, আমার এখনো কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না।

— জানি, হবে না। এস, আমি প্রমাণ দিচ্ছি—

এগিয়ে এসে সে নাকামুরার ফেল যাওয়া অ্যাটাচি-কেসটা খুলে বার করে আনল একটা ব্র্যাসিয়ার। বললে, এই ট্যাগটা দেখ। এটা আমস্টার্ডামের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা। ব্যাটাভিয়ায় এ জিনিস কেনন করে পেল তোমার সেই বন্ধু?

অ্যাগনেস বলে, ব্যাটাভিয়াতেও এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।

— আর এই ক্রাইম-থ্রিলার বইখানা?

— কী ওখানা?

— লক্ষ্য করে দেখ, বইটার প্রথম প্রকাশ 1940 তুমি ব্যাটাভিয়া ছেড়ে আসার দু-বছর পরে। স্বীকার করতে বাধ্য হল অ্যাগনেস, হ্যাঁ, এত খুঁটিয়ে আমি পরীক্ষা করে দেখিনি বটে।

— ন্যাচারালি। যেহেতু তুমি প্রাক্তন-গোয়েন্দা নও!

অ্যাগনেস অধোবদনে বসেই রইল!

বব্ বলে, কী হল, ওঠ! কী অত ভাবছ?

— ভাবছি, এরপর যখন সেই সত্যিকারের লোকটা এসে ফাইলটা চাইবে, আমি তাকে কী বলব? কী কৈফিয়ৎ দেব?

— কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, বরং তার হাতে ফেরত দেবে তোমার গচ্ছিত ধন! ভয় নেই, সেটা খোয়া যায়নি।

উৎসাহে দাঁড়িয়ে ওঠে অ্যাগনেস : যায়নি? যায়নি! তুমি নিশ্চিত জানো?

— জানি! এবার শোন, ঐ দুজন পুলিশ কেন তোমাকে উদ্ধার করল।

পঁয়কারের কাছে সকালের ফ্লাইটে এসে পৌঁছায় ফিগারো অফিসের একজন স্পেশাল-কুরিয়ার। নির্দেশমতো সীলবদ্ধ খামটা খুলে পঁয়কারে দেখে চিঠিখানা ফিগারো-সম্পাদক ডক্টর লে লোরেন লিখেছেন আমস্টার্ডাম পুলিশ কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে:

“প্রিয় কমিশনার-সাহেব,

আপনার মৌখিক প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমার একজন রিপোর্টারকে আমস্টার্ডামে

পাঠিয়েছিলাম মীগেরের কেসটা কভার করতে। পত্রবাহক বব্ পঁয়কারে আমাকে জানাচ্ছে যে, মেয়েটি কোনও নাইট-ক্লাবে গিয়ে বেইস হয়ে পড়ে আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকালকার এইসব ছোঁড়াছুঁড়ি রিপোর্টারদের বিশ্বাস করা চলে না, কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই! কাগজের পাতা ভরাবো কীভাবে এটাই এখন মুখ্য চিন্তা!

অবশ্য ঘটনাচক্রে একটি ফাইল আমার হাতে এসেছে। ডাচ ইম্পিরিয়ালিজম সংক্রান্ত। জাপানীরা তো আর এক পক্ষকালের মধ্যেই নতজানু হবে। খুব সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ায় পুনরায় ডাচ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। না হবে কেন? আপনারা কয়েক শতাব্দী ধরে দেশটাকে ‘সুশাসনে’ রেখেছেন! ফাইলের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার ‘স্বলভু’ প্রমাণ! ‘অ্যাগনেস শ্যাম্পেনকে যদি নিতান্তই খুঁজে না পাওয়া যায়, অর্থাৎ তার নিয়মিত ‘ডেসপ্যাচ’ যদি না পাই, তাহলে ঐ ফাইলের ফটোস্ট্যাট-কপি সমেত আমার স্থলস্থিত একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রবন্ধই ছাপাতে বাধ্য হব : ‘ইন্দোনেশিয়ায় প্রাকযুদ্ধ ডাচ-কলোনিয়াল শাসনের ইতিকথা।’ উপায় কী? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা তো আর খালি রাখা যাবে না, কে কোথায় মদ খেয়ে পড়ে আছে বলে!

“আপনি আমার কাগজের একজন গুণগ্রাহী। অনুগ্রহ করে আমাকে একটা পরামর্শ দেবেন? আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক-ভাবে কোনটা ছাপানো যুক্তিযুক্ত হবে?

তাঁ মীগেরের ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’ সংক্রান্ত আর্ট-প্রবন্ধ, না কি জ্যাক মীগেরের ‘অরিজিনাল গবেষণার’ উপর রাজনৈতিক প্রবন্ধ?

প্রতীক্ষারত একান্ত গুণমুগ্ধ আপনার : লে লোরেন।”

অ্যাগনেস চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। বলে, তার মানে, স্যার ওটা আগে-ভাগে সরিয়ে রেখেছেন?

— ন্যাচারালি! তুমি আমস্টার্ডাম রওনা হওয়াযাত্র। সেটা এখন তাঁর ব্যক্তিগত লকারে সুরক্ষিত। তোমার নিজের টেবুল-লকার শূন্যগর্ভ! ফাইলটা সেক্ষানাল ইনচার্জের নাগালের বাইরে! ফলে, ওদেরও!

অ্যাগনেস ঝাঁপিয়ে পড়ল বব্-এর উপর। বব্ টাল সামলাতে পারল না। কোথাও কিছু নেই চুমায়-চুমায় উত্তেজিত মেয়েটা ভরিয়ে দিল ববের মুখখানা!

॥ আর্ট ॥

264 নং প্রিন্সেসনগ্রাচ। অর্থাৎ পঁয়কারের অ্যাপার্টমেন্ট। দিন-তিনেক পরের কথা। অ্যাগনেস এখন এখানেই আছে। পঁয়কারেকে কিচেনেতে শুতে হয়নি। মেঝেতেই ম্যাট্রেস পেতে শোয়। প্রথম রাত্রে ওর ল্যান্ডলেডি তো স্কেপে আগুন। পঁয়কারে যখন মধ্যরাত্রে সবাঙ্কবী ঘিরে এল। ল্যান্ডলেডি বৃদ্ধা, নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। দরজা খুলে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ভেলেবেগুনে স্বলে উঠেছিল, তোমাকে আমি প্রথম দিনই তো বলে রেখেছিলাম পঁয়কারে—এ সব বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না!

পঁয়কারে হাত দুটি কচলে বলেছিল, মাদাম তা-বুর্গ, আজ তিন বছর তোমার বাড়িতে আছি।

কোনদিন কোন বেচাল দেখেছ? এ মেয়েটি ফ্রেন্স—আমস্টারডামে এসে ভীষণ বিপদে পড়েছে। ওর শিছনে গুপ্তা লেগেছে। আমার অফিসের সহকর্মী—বিশ্বাস না হয় ওর প্রেস-আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটা পরীক্ষা করে দেখ! ওর এই দারুণ বিপদ দেখে আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি! আমি জানি, তোমার দয়া হবেই! ও আমার ঘরে শোবে, আমি শোব কিচেনেতে। কেমন ?

বুড়ি অ্যাগ্নেসের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। অ্যাগ্নেস্ শুধু বললে : প্রীজ !

বুড়ির বিশ্বাস হল। বললে, তা হবে না। মেয়েটা আমার ঘরে শোবে। কাল সকালে হোটেল-মোটেল খুঁজে নিও। আমার ডেরায় ওসব চলবে না !

প্রথম রাত্রি সেভাবেই কেটেছিল। পরদিন বুড়ি প্রশ্ন করে জেনে নিল— অ্যাগ্নেস রোমান ক্যাথলিক নয়। প্রোটেষ্টান্ট। সহজ সমাধান দাখিল করেছিল : শোন ভালমানুষের মেয়ে! মাস-খানেক থাকবে বলছ, তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ। আমাকেও বামেলায় ফেলেছ, আর ঐ বব্টাকেও ফেলেছ আতান্তরিতে। হোটেল গিয়ে উঠলে যদি গুপ্তার ভয় তাহলে সামনের ঐ প্রোটেষ্টান্ট চার্চে চল যাও — বে-করে ফিরে এস। তোমার কর্তা তো মৌত হয়েছে, অসুবিধা কিছুই নেই। পারীতে যাবার সময় না হয় ডিভোর্স নিয়ে নিও! কেমন? অবশ্য বব্ খুব ভাল ছেলে, রোজগারও ভাল। তোমরা দুজনে মিলে-মিশেও চিরটাকাল থাকতে পারবে মনে লাগে। তবে তোমরা তো আমাদের মত রোমান ক্যাথলিক নও! দেখ যা ভাল বোঝ কর!

শুনে বব্ বলেছিল, বুড়ি বুদ্ধিটা মন্দ দেয়নি। না হয়, পারী ফিরে যাবার আগে ডিভোর্স নিয়ে নিও! তুমি কী বল?

— আমি রাজী। তবে যে-কোন চার্চ হলে চলবে না। বিশেষ একটি চার্চে আমাদের বিয়েটা হবে। সেই শর্তে যদি তুমি রাজী থাক তবেই সম্মতি দেব!

— বিশেষ একটি চার্চ? সেটা কোথায়?

— রটার্ডামে। সেস্ট লরেন্স চার্চ!

— হঠাৎ ঐ গীজটি কেন?

— ওখানে আমার বাবা আর মায়ের বিবাহ হয়েছিল।

পঁয়কারে অবাক হয়ে যায়। বলে, এটা তো জানা ছিল না। আমার ধারণা ...

— সে ধারণাটা ভুল। আমি ‘বাস্টার্ড’ নই! একদিন সব কথা খুলে বলব তোমাকে।

সে সুযোগ আর হয়নি। সময় কোথা? প্রতিদিন সকালে চল যায় কাইজারগাচ। না, ভাঁ মীগেরেঁ নিজের বাড়িতে নেই। পাশেই একখানা স্টুডিও ভাড়া করা হয়েছে—যেখানে বসে মীগেরেঁ পুলিশ-প্রহরায় ছবিখানা আঁকছে। উপায় কী? মহমান্য আদালত মীগেরেঁকে জামিন দেননি, ফলে নিজের ডেরায় সে ফিরতে পারে না। এদিকে জেলখানায় বসে ছবি আঁকতে মীগেরেঁ গররাজী। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা। ওর প্রাসাদোপম বাড়ির পাশেই একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তাকে বলতে পার বিকল্প কারাগার, অথবা বিকল্প স্টুডিও। বৃদ্ধ সেখানেই বসে বিরাট একখানা ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’ আঁকছেন।

এমনিতে বুড়ো বদমেজাজী; খিটখিটে; কিন্তু অ্যাগ্নেসের প্রতি প্রথম দিন থেকেই কী জানি কেন উনি সদয়। বলেছিলেন, আমাকে নিয়ে পশুশ্রম করছ মা, আমার উপর লেখা বই বাজারে কাটবে না, শোকায কাটবে।

অ্যাগ্‌নেস বলেছিল, কেন? আমস্টাডার্মে আজ কোন্ জীবিত শিল্পী আছেন যাঁর ছবি লুভ্‌ বা রাইখ্‌স্‌ ম্যুজিয়ামে আছে?

বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, কিন্তু সে সব ছবিতে তো আমার স্বাক্ষর নেই?

— ছবির মূল্য কি চিত্রকরের স্বাক্ষরে?

মীগেরেঁ বলেছিলেন, ঠিক আছে। কী চাও তুমি, বল?

— আপনার সব কথা, স-ব কথা আমাকে অকপটে জানাতে হবে। কিছুই রেখে ঢেকে বলতে পারবেন না। আমি প্রতিদিন এসে শুনব। টেপ-রেকর্ড করে যাব। রাজী?

— রাজী। কিন্তু তাহলে আমাকে কী মজুরী দেবে?

— মজুরী! কী চান বলুন?

— আমাকে সিটিং দিতে হবে। আমি তোর একখানা শোট্রেট আঁকব!

— আমার? কেন? আমার চেহারা আপনি কী দেখলেন?

— তোর মধ্যে আমি...না, এ একটা কথা আমি বলব না। বলতে পারব না। ধরে নে তোর মুখে আমি একটি প্রিয়জনের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। যে মেয়েটা আমার জীবন থেকে বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে...

— আপনি কি মাদাম অ্যানা মীগেরেঁর কথা বলছেন, মসূর্যে?

— কেমন করে আন্দাজ করলি তুই?

— বেশ, আপনি মুক্ত হলে আমি সিটিং দেব, আপনি আমার শোট্রেট আঁকবেন। তাহলে সব কথা খুলে বলবেন তো?

— বলব। তুই প্রতিদিন আসবি তো?

— আসব।

প্রতিদিনই সে যায়। বৃদ্ধ ছবি আঁকতে আঁকতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন বলেন, আয়, তোর যন্ত্রটা নিয়ে বস। আমি বলতে শুরু করি। কাল কতদূর যেন বলেছিলাম?

জো লক্ষ্য করেছিল শিল্পীর ভাবান্তরটুকু।

সেই 1937 সালে, অর্থাৎ রোমের চিত্রশালা থেকে কারাভাগগোর ছবিখানা দেখবার পর থেকেই। কেন, কী বৃত্তান্ত তা আন্দাজ করতে পারেনি—তবে ওর আর্টিস্ট স্বামী যে নিতান্ত ‘মুড়ী’ এটুকু জোহানার ভাল রকম জানা।

ঘটনাটা ঘটল যখন মধুচন্দ্রিমার পরিক্রমা-পথে ওরা এসে উপনীত হল বোকেব্রুন-এ। বোকেব্রুন দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী একটা গণ্ডগ্রাম। মেষ্টন আর মোনাকোর মাঝামাঝি। ইতালীর সীমান্ত থেকে মাইল-দশেক ফ্রান্সের ভিতর। সমুদ্রবেলায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছবির মতো একখানি গ্রাম। একটি মাত্র বাক্যে মীগেরেঁ গ্রামটার স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাগ্‌নেসকে : বুঝলি, যেন কম্পেটেন্স-এর আঁকা একখানা দিল্‌তোড্‌ ক্যানভাস্‌!

এখানে পৌঁছে ঘটনাচক্রে গাড়িটা গেল বিগড়ে। সেই যে থার্ডহ্যান্ড গাড়িখানায় চড়ে মীগেরেঁ সদ্যপরিণীতাকে নিয়ে বার হয়েছে দক্ষিণ ইয়োরোপ ভ্রমণে। বাধ্য হয়ে এক মটোর-মেকানিকের শরণাপন্ন হতে হল। সে গাড়িটা পরীক্ষা করে জানালো দিন-দুই লাগবে গাড়িটা মেরামত করতে। অগত্যা রাত্রিবাস করতে হল স্থানীয় একটি সরাইখানায় : লা ম্যাগনিফিক!

পরদিন গ্রামটা ঘুরে দেখতে গিয়ে টিলার-মাথায় একটা দ্বিতলবাড়ির প্রেমে পড়ে গেল মীগেরেঁ। বাড়িটার নাম: ‘প্রিমাভেরা’ বা ‘বসন্ত’। হান কেন আকৃষ্ট হল? বাড়িটার নির্জনতায়? অথবা নামে? বস্তিচেল্লির জীবনের মোড়-ফেরানো বিশ্ববন্দিত ছবিখানার কথা কি তার মনে পড়ে গিয়েছিল? সেটা আজ তার মনে নেই। শৌঁজ নিয়ে জানতে পারল— স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ওটা ভূতের-বাড়ি। কয়েক বছর আগে সেখানে নাকি জোড়া খুন হয়। তারপর থেকে বাড়িটা আর ভাড়া হয়নি। হান মালিকের সঙ্গে দেখা করল। হুগুয় মাত্র আঠারে শিলিং ভাড়ায় ঐ প্রকাশু প্রাসাদটা ভাড়া নিল। জো তো অবাক।

বলে, কী হবে ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়ে?

— আমার মাথায় গ্র্যান্ড একটা আইডিয়া এসেছে। এখানে বসে আমি একখানা প্রকাশু ছবি আঁকব। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্যানভাস! আমি এখানেই থাকব মাস-কয়েক। তুমি কী করবে? হল্যান্ডে ফিরে যাবে?

জো বুঝতে পেরেছে পাগলটাকে টলানো যাবে না। তাই বলে, না আমি পারীতে থাকব। আমার এক বান্ধবীর অ্যাপার্টমেন্টে। সে ক্যাবারে-গার্ল। একাই থাকে। তাহলে সম্ভ্রাহন্তে তুমি পারীতে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, অথবা আমিই চল আসব এখানে—

— না! তুমি আসবে না। কিছুতেই না! আমি সম্পূর্ণ নির্জন-সাধনা করতে চাই। বরং আমিই মাঝে মাঝে পারী যাব। তুমি হঠাৎ যেন এসে আমার তপস্যাতঙ্ক কর না।

জো প্রতিবাদ করল না। মেনে নিল। ওরা দুজনে প্রথমে ফিরে গেল হল্যান্ডে। মালপত্র বাঁধাছাদা করে চল এল দক্ষিণ ফ্রান্সে। হান এসে উঠল ‘প্রিমাভেরা’য়; জো পারীতে।

হান কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন হল তার সাধনায়—তান্ত্রিক পদ্ধতিতে!

দুনিয়ার উপর প্রতিশোধ নেওয়াটা যে বাকি!

সবার আগে বধ করতে হবে জীবনের পয়লা-নম্বর শত্রু : ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্-কে!

তিনি তখন তদানীন্তন হল্যান্ডে সবচেয়ে বিখ্যাত আর্ট-হিস্টোরিয়ান তথা চিত্রশিল্প বিশারদ! তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র : ডেরমেয়ার।

জীবনে দ-দুবার হান আঘাত পেয়েছে ঐ বুড়োটার কাছ থেকে। প্রত্যাঘাত করার সুযোগ সে পায়নি! পাওয়ার কথাও নয়। কোথায় প্রতিষ্ঠাকামী নগণ্য শিল্পযশপ্রার্থী ভাঁ মীগেরেঁ আর কোথায় সমগ্র নেদারল্যান্ডস্-এর শ্রেষ্ঠ আর্ট-কনৌশার ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্! দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে প্রতিহিংসার আগুন মীগেরেঁর বুকে ঝিকিঝিকি ঝলছে। এতদিনে এসেছে প্রত্যাঘাতের চরম সুযোগ!

প্রথমবার আঘাতটা পেয়েছিল ওর একক প্রদর্শনীতে। ঘড়ি-আংটি বন্ধক দিয়ে সাতাশ বছরের উদীয়মান শিল্পীর সেদিন কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা! উদ্দীপনা যত না তার নিজের, তার চেয়েও বেশি তার সুন্দরী স্ত্রী অ্যানার। ‘হল’-ভাড়া মিটিয়েছে, নিমন্ত্রণপত্র ছেপেছে, পায়ে-হেঁটে বড় বড় শিল্পী, শিল্প-বোদ্ধা, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে। অথচ উদ্বোধনের দিনে বিশেষ কেউই আসেননি। প্রদর্শনীর শেষ দিনে মরিয়া হয়ে সে দেখা করেছিল ডক্টর ব্রেডিউস্-এর সঙ্গে। প্রায় হাতে-পায়ে ধরে তাকে রাজী করায়। শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ব্যয় করে গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে আসে প্রদর্শনীতে। অথচ সর্বসমক্ষেই তিনি অটুহাস্য করে বললেন, এই ছবি দেখাতে তুমি আমাকে ধরে এনেছ হে? শোন বাপু, খোলা কথা বলি—তোমার দ্বারা ছবি আঁকা কোনদিন

হবে না। অন্য কোনও প্রক্ষেপানে নেমে পড় বরং; এখনো সময় আছে!

চরম অপমানিত বোধ করেছিল সেদিন!

দ্বিতীয় আঘাতও শেষেছে এই ব্রেডিউস্-এর কাছেই। ঐ ঘটনার একযুগ পরে, 1928-এ।

হানের বন্ধু ভাঁ উইজগাঁটেন কোন্ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আনল একখানা প্রাচীন তৈলচিত্র : 'ক্যাভেলিয়র' (অভিজাত অশ্বারোহী)। দুই বন্ধুরই মনে হল সেখানি প্রখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ফ্রান্স হাল্জ-এর (1580-1666) অরিজিনাল। তা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা একটা ছয়পু-ফোঁড় সৌভাগ্য! মীগেরেঁ এতদিন 'রেস্টোরেশন'-বিদ্যায় (প্রাচীন-চিত্রের মেরামতির কাজে) বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। দুই বন্ধু মিলে ক্যানভাসখানা প্রথমে সাফা করল। তেলরঙের ছবিখানা এখানে-ওখানে ফেটে-ফুটে গিয়েছিল। নিশুণ দক্ষতায় সেগুলি মেরামত করা হল। ফ্রেমের কাঠখানাও ফেটে গেছে—দর্শনধারী নয় তা। অগত্যা নতুন ফ্রেমে ছবিটা সাঁটল, যাতে নিলামে সেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব শেষে ক্যানভাসের উপর মীগেরেঁ খুব আলতোভাবে একটা অনচ্ছ ভার্ণিশের প্রলেপ দিল। তারপর ছবিখানা বগলদাবা করে আর বুকে অনেক আশা নিয়ে দুই বন্ধু উপস্থিত হল ডক্টর ডি.গ্রুট্-এর কাছে।

ডক্টর গ্রুট আমস্টার্ডামের একজন প্রখ্যাত শিল্প-সমজদার তথা হিস্টোরিয়ান। তিনি পরীক্ষা করে রায় দিলেন :

— হ্যাঁ, এই অনবদ্য চিত্রটি অরিজিনাল হাল্জ-ই বটে! তিনি শুধু সার্টিফিকেট লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সেটিকে নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করলেন। আশাতিরিক্ত দর উঠল—প্রায় আড়াই লক্ষ গিল্ডার্স! তার মানে ছবিটি বিক্রয় হলেই ওরা দুই বন্ধু এই খাষ্টামোর ব্যবসায় ছাড়বে—এ মৃতব্যক্তির ফটো দেখে পোট্রেট আঁকা আর রেস্টোরেশনের ক্লাস্তিকর কাজ। এবার দুজনেই মনের সুখে ছবি আঁকবে ইচ্ছা মতো। কিন্তু ক্রেতা একটি শর্ত করলেন—তিনি ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে ছবিটি একবার যাচাই করিয়ে নিতে চান। ডক্টর ব্রেডিউস যদি বলেন, 'এটা জাল', তাহলে দামটা ফেরত দিতে হবে, ছবিখানি তাহলে তিনি কিনবেন না।

ডক্টর গ্রুট বললেন, ভয় নেই, আমি নিঃসন্দেহ—ডক্টর ব্রেডিউস আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। প্রফেশনাল এখিভের জন্য নয়, এখানা সত্যই অরিজিনাল হাল্জ:

ব্রেডিউস তখন সন্তরের কোঠায়। নেন্দারল্যান্ডস্-এর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমাজদার। ওরা তিনজনে তাঁর দ্বারস্থ হল—দুই বিক্রেতা আর একজন ক্রেতা। ব্রেডিউস মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিলেন ওদের সাতমহলা প্রাসাদ। ফতোয়া জারী করলেন : এটা নকল!

হেতু? ওঁর যুক্তি—ছবিতে কিছু রঙ আছে যা যথেষ্ট পুরাতন নয়! মীগেরেঁ আর তার বন্ধু বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করল—এইটুকু নতুন রঙ তারাই লাগিয়েছে মেরামতির সময়। বৃদ্ধ সেকথা মানতে রাজী নন। বলেন, তাছাড়া ফ্রেমটা দেখ! কাঠগুলো সদ্য চেরাই-করা। পেরেকগুলোয় মরচে লাগেনি।

মীগেরেঁ আত্ননাদ করে উঠেছিল, কী আশ্চর্য! ফ্রেমটা তো মাসখানেক আগে আমিই বানিয়েছি স্যার!

বৃদ্ধ বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন, বাপু হে! অত সহজে ধোঁকাবাজি দেওয়া যায়না, বুঝেছ? নতুন করে না বাঁধিয়ে পুরানো কাঠ, মরচে-ধরা পেরেকও তোমরা ব্যবহার করতে পারতে। সাধারণ মানুষ তাতে ধোঁকা খেত! সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা : শিল্পশৈলী! গ্রান্ড

মাস্টার্সদের তুলির টান দেখলেই বোঝা যায়। অবশ্য দেখবার চোখ চাই! অভিজ্ঞতা চাই! ইন্টুইশান চাই! ইশ্বরদত্ত ক্ষমতাও চাই। বুঝলে? আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে বলতে পারি : মহান শিল্পী ফ্রাঙ্ক হাল্‌ড্‌-এর তুলি এ ক্যানভাসকে কোনদিন চুমু খায়নি! টাকাটা ফেরত দিতে হল। জলের দরে ছবিখানা পরে বিক্রি হয়ে যায়। অথচ সেটা সত্যই ছিল ফ্রাঙ্ক হাল্‌ড্‌-এর অরিজিনাল!

রোম চিত্রশালায় কারাভাগগোর ছবিখানা দেখতে দেখতে এইসব কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল হান মীগেরের। চকিতে ওর স্মরণ হয়েছিল আর একটি চিত্র-ইতিহাস প্রসঙ্গ : ‘ভেরমেয়ারের সুবিখ্যাত ক্যানভাস : “মাখা ও মেরীর আবাসে যীশু।” সেটি হংস মধ্যে একমাত্র মরাল! অর্থাৎ বাইবেল-অবলম্বনে ভেরমেয়ার ঐ একখানা মাত্র ছবি আঁকেছেন। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু সমকালীন ডাচ সমাজ-জীবন থেকে চয়িত। ঐ একটিমাত্র ধর্মীয় চিত্র। আর সেই অনবদ্য ক্যানভাসটির আবিষ্কার স্বয়ং ডক্টর ব্রেডিউস!

লন্ডনে একজন ফুটপাথ-ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিনি জলের দরে সেখানা কেনেন। বেচারি ফেরিওয়াল! সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—ওখানা ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’! কয়েক শিলিং-এ কিনে ব্রেডিউস সেটি কয়েক লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেন! একটি আর্ট-জার্নালে তিনি প্রসঙ্গত যা লিখেছিলেন তার আশ্চর্যক অনুবাদ—“ভেরমিয়ারের ধর্মীয় বিষয়ে আঁকা কোন ছবি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তার মানে এ নয় যে, বাইবেল-অবলম্বনে মহান শিল্পী ভেরমেয়ার কোনও ছবি আঁকেননি। আলোচ্য ছবিখানাই তো একটি জাজ্জল্য প্রমাণ! আমার অনুমান—এই চিত্রের শিঙ্খনে কারাভাগগোর প্রভাব আছে। ভেরমেয়ার ইতালী ভ্রমণ করেছিলেন এ-কথা অনুমান করা চলে। রোম-ভেনিস-ফ্লোরেন্স-মিলান ছিল তাঁর আমলে শিল্পীতীর্থ। মুসলমানের কাছে মক্কা, রোমান-ক্যাথলিকের কাছে ভ্যাটিকান সিটি! আমার ধারণা কারাভাগগোর কোন একখানা (সুধীজন মাত্রেই জানেন, একই বিষয়ে কারাভাগগো তিন-তিনখানি ছবি আঁকেন) ‘ইন্সয়েন্স্ পাঙ্কশালায় যীশু’ তিনি দর্শন করেন ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে। হল্যান্ডে ফিরে এসে তিনি আঁকেছিলেন এই ছবিখানা: “মেরী ও মাখার আবাসে যীশু।” আমার দৃঢ় বিশ্বাস : বাইবেল-অবলম্বনে-আঁকা ভেরমেয়ারের আরও দু-একটি তৈলচিত্র ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে! এ বৃদ্ধ হয়তো তখন থাকবে না, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণীটুকু তখনো থাকবে।”

ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে কারাভাগগোর ঐ ছবিখানা দেখতে দেখতে এই কথাটাই মনে পড়ে গিয়েছিল মীগেরের। ওর মনে পড়ে গিয়েছিল—ডক্টর ব্রেডিউস জীবিত, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখনো ফলেনি! মনশ্চক্ষে ও দেখতে পেল একটি নবাবিষ্কৃত অরিজিনাল ভেরমেয়ার—যীশুর জীবন থেকে বেছে নেওয়া। যে ছবি পয়দা হবে মীগেরের তুলির টানে। ছবি তো নয়—একটা কেঁচো! ও মনশ্চক্ষে এটাও দেখতে পেল যে, বৃদ্ধ ব্রেডিউস হাঁ-করে কেঁচোটো গিলতে আসছেন! ঠিক মতো সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে পারলেই রাঘব-বোয়াল কাং! ডাঙায় উঠে শাবি খাবে কুড়োটা!

ছয় মাসের নির্জন সাধনায় মীগেরের যে ‘অরিজিনাল’ ভেরমেয়ারটি পয়দা করলো তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে ‘আর্ট’ আর ‘ক্রাফট’কে সমান মর্যাদা দিতে হবে। শিল্পকলার সময়-বিশেষে ছাপিয়ে উঠেছে রসায়ন। প্রথমে ‘আর্ট’-প্রসঙ্গটা আলোচনা করি :

হবে না। অন্য কোনও প্রক্ষেপানে নেমে পড় বরং; এখনো সময় আছে!

চরম অপমানিত বোধ করেছিল সেদিন!

দ্বিতীয় আঘাতও শেষেছে ঐ ব্রেডিউস্-এর কাছেই। ঐ ঘটনার একযুগ পরে, 1928-এ।

হানের বন্ধু তাঁ উইজগাঁটেন কোন্ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আনল একখানা প্রাচীন তৈলচিত্র : 'ক্যাভেলিয়র' (অভিজাত অশ্বারোহী)। দুই বন্ধুরই মনে হল সেখানি প্রখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ফ্রান্স হাল্জ-এর (1580-1666) অরিজিনাল। তা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা একটা ছয়ড-ফোঁড় সৌভাগ্য! মীগেরেঁ এতদিন 'রেস্টোরেশন'-বিদ্যায় (প্রাচীন-চিত্রের মেরামতির কাজে) বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। দুই বন্ধু মিলে ক্যানভাসখানা প্রথমে সাফা করল। তেলরঙের ছবিখানা এখানে-ওখানে ফেটে-ফুটে গিয়েছিল। নিশুণ দক্ষতায় সেগুলি মেরামত করা হল। ফ্রেমের কাঠখানাও ফেটে গেছে—দর্শনধারী নয় তা। অগত্যা নতুন ফ্রেমে ছবিটা সাঁটল, যাতে নিলামে সেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব শেষে ক্যানভাসের উপর মীগেরেঁ খুব আলতোভাবে একটা অনচ্ছ ভানিশের প্রলেপ দিল। তারপর ছবিখানা বগলদাবা করে আর বুকে অনেক আশা নিয়ে দুই বন্ধু উপস্থিত হল ডক্টর ডি.গ্রুট্-এর কাছে।

ডক্টর গ্রুট আমস্টার্ডামের একজন প্রখ্যাত শিল্প-সমজদার তথা হিস্টোরিয়ান। তিনি পরীক্ষা করে রায় দিলেন :

— হ্যাঁ, এই অনবদ্য চিত্রটি অরিজিনাল হাল্জ্-ই বটে! তিনি শুধু সার্টিফিকেট লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সেটিকে নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করলেন। আশ্যাতিরিঙ্ক দর উঠল-প্রায় আড়াই লক্ষ গিল্ডার্স! তার মানে ছবিটি বিক্রয় হলেই ওরা দুই বন্ধু এই খাষ্টামোর ব্যবসায় ছাড়বে—ঐ মৃতব্যক্তির ফটো দেখে পোট্রেট আঁকা আর রেস্টোরেশনের ক্লাস্তিকর কাজ। এবার দুজনেই মনের সুখে ছবি আঁকবে ইচ্ছা মতো। কিন্তু ক্রেতা একটি শর্ত করলেন—তিনি ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে ছবিটি একবার যাচাই করিয়ে নিতে চান। ডক্টর ব্রেডিউস যদি বলেন, 'এটা জাল', তাহলে দামটা ফেরত দিতে হবে, ছবিখানি তাহলে তিনি কিনবেন না।

ডক্টর গ্রুট বললেন, ভয় নেই, আমি নিঃসন্দেহ—ডক্টর ব্রেডিউস আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। প্রফেশনাল এথিক্সের জন্য নয়, এখানা সত্যই অরিজিনাল হাল্জ্:

ব্রেডিউস তখন সত্তরের কোঠায়। নেন্দারল্যান্ডস্-এর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমাজদার। ওরা তিনজনে তাঁর দ্বারস্থ হল—দুই বিক্রেতা আর একজন ক্রেতা। ব্রেডিউস মুহূর্তে ধুলিসাং করে দিলেন ওদের সাতমহলা প্রাসাদ। ফতোয়া জারী করলেন : এটা নকল!

হেতু? ওঁর যুক্তি—ছবিতে কিছু রঙ আছে যা যথেষ্ট পুরাতন নয়! মীগেরেঁ আর তার বন্ধু বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করল—এইটুকু নতুন রঙ তারাই লাগিয়েছে মেরামতির সময়। বৃদ্ধ সেকথা মানতে রাজী নন। বলেন, তাছাড়া ফ্রেমটা দেখ! কাঠগুলো সদ্য চেরাই-করা। পেরেকগুলোয় মরচে লাগেনি।

মীগেরেঁ আত্ননাদ করে উঠেছিল, কী আশ্চর্য! ফ্রেমটা তো মাসখানেক আগে আমিই বানিয়েছি স্যার!

বৃদ্ধ বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন, বাপু হে! অত সহজে ধোঁকাবাজি দেওয়া যায়না, বুঝেছ? নতুন করে না বাঁধিয়ে পুরানো কাঠ, মরচে-ধরা পেরেকও তোমরা ব্যবহার করতে পারতে। সাধারণ মানুষ তাতে ধোঁকা খেত! সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা : শিল্পশৈলী! গ্রান্ড

মাস্টারদের তুলির টান দেখলেই বোঝা যায়। অবশ্য দেখবার চোখ চাই! অভিজ্ঞতা চাই! ইন্টুইশান চাই! ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাও চাই। বুঝলে? আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে বলতে পারি : মহান শিল্পী ফ্রান্স হাল্জ্-এর তুলি এ ক্যানভাসকে কোনদিন চুমু খায়নি! টাকাটা ফেরত দিতে হল। জলের দরে ছবিখানা পরে বিক্রি হয়ে যায়। অথচ সেটা সত্যই ছিল ফ্রান্স হাল্জ্-এর অরিজিনাল!

রোম চিত্রশালায় কারাভাগগোর ছবিখানা দেখতে দেখতে এইসব কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল হান মীগেরের। চকিতে ওর স্মরণ হয়েছিল আর একটি চিত্র-ইতিহাস প্রসঙ্গ : ‘ভেরমেয়ারের সুবিখ্যাত ক্যানভাস : “মাথা ও মেরীর আবাসে যীশু।” সেটি হংস মধ্যে একমাত্র মরাল! অর্থাৎ বাইবেল-অবলম্বনে ভেরমেয়ার ঐ একখানা মাত্র ছবি আঁকেছেন। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু সমকালীন ডাচ সমাজ-জীবন থেকে চয়িত। ঐ একটিমাত্র ধর্মীয় চিত্র। আর সেই অনবদ্য ক্যানভাসটির আবিষ্কার স্বয়ং ডক্টর ব্রেডিউস!

লন্ডনে একজন ফুটপাথ-ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিনি জলের দরে সেখানা কেনেন। বেচারি ফেরিওয়াল! সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—ওখানা ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’! কয়েক শিলিং-এ কিনে ব্রেডিউস সেটি কয়েক লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেন! একটি আর্ট-জার্নালে তিনি প্রসঙ্গত যা লিখেছিলেন তার আক্ষরিক অনুবাদ—“ভেরমিয়ারের ধর্মীয় বিষয়ে আঁকা কোন ছবি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তার মানে এ নয় যে, বাইবেল-অবলম্বনে মহান শিল্পী ভেরমেয়ার কোনও ছবি আঁকেননি। আলোচ্য ছবিখানিই তো একটি জাজ্জল্য প্রমাণ! আমার অনুমান—এই চিত্রের পিছনে কারাভাগগোর প্রভাব আছে। ভেরমেয়ার ইতালী ভ্রমণ করেছিলেন এ-কথা অনুমান করা চলে। রোম-ভেনিস-ফ্লোরেন্স-মিলান ছিল তাঁর আমলে শিল্পীতীর্থ। মুসলমানের কাছে মক্কা, রোমান-ক্যাথলিকের কাছে ভ্যাটিকান সিটি! আমার ধারণা কারাভাগগোর কোন একখানা (সুধীজন মাঝেই জানেন, একই বিষয়ে কারাভাগগো তিন-তিনখানি ছবি আঁকেন) ‘ইন্সম্মুস্ পাঙ্কশালায় যীশু’ তিনি দর্শন করেন ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে। হল্যান্ডে ফিরে এসে তিনি আঁকেছিলেন এই ছবিখানা: “মেরী ও মাথার আবাসে যীশু।” আমার দৃঢ় বিশ্বাস : বাইবেল-অবলম্বনে-আঁকা ভেরমেয়ারের আরও দু-একটি তৈলচিত্র ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে! এ বৃদ্ধ হয়তো তখন থাকবে না, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণীটুকু তখনো থাকবে।”

ইতালীর শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকালে কারাভাগগোর ঐ ছবিখানা দেখতে দেখতে এই কথাটাই মনে পড়ে গিয়েছিল মীগেরের। ওর মনে পড়ে গিয়েছিল—ডক্টর ব্রেডিউস জীবিত, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখনো ফলেনি! মনশ্চক্ষে ও দেখতে পেল একটি নবাবিষ্কৃত অরিজিনাল ভেরমেয়ার—যীশুর জীবন থেকে বেছে নেওয়া। যে ছবি পয়দা হবে মীগেরের তুলির টানে। ছবি তো নয়—একটা কৈঁচো! ও মনশ্চক্ষে এটাও দেখতে পেল যে, বৃদ্ধ ব্রেডিউস হাঁ-করে কৈঁচোটো গিলতে আসছেন! ঠিক মতো সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে পারলেই রাঘব-বোয়াল কাং! ডাঙায় উঠে খাবি খাবে কুড়োটা!

ছয় মাসের নির্জন সাধনায় মীগেরের যে ‘অরিজিনাল’ ভেরমেয়ারটি পয়দা করলো তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে ‘আর্ট’ আর ‘ক্রাফট’কে সমান মর্যাদা দিতে হবে। শিল্পকলা-সময়-বিশেষে ছাপিয়ে উঠেছে রসায়ন। প্রথমে ‘আর্ট’-প্রসঙ্গটা আলোচনা করি :

বিষয়বস্তুটা: ইন্সায়ন্স-এ যীশু! ছবির মাশ, সাড়ে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বাই সওয়া পঞ্চাশ ইঞ্চি! কম্পোজিশন : বলা যায় কারাভাগগো অনুসরণে। কারাভাগগোর চিত্রে ছিল পাঁচটি চরিত্র, এখানে একটি কমিয়ে করা হল চারটি। পরিচরিত্রটিকে যীশুর আরও কাছে আনা হয়েছে, যেহেতু চরিত্রটি এখানে অপসারিত। দুই, সহ-ভোজীর চিত্র রূপায়ণে কারাভাগগো যে নাটকীয়তা দেখিয়েছেন— বামপ্রান্তবাসীর বামহস্তের ব্যঞ্জনায় এবং দক্ষিণপ্রান্তের সহভোজীর দুইহাতে টেবিলের কাঁঠানা চেষ্টা ধরায়—সেই নাটকীয়তা কিছু নেই মীগেরের কম্পোজিশনে। কারাভাগগো-যীশুর দক্ষিণ তর্জনা বামায়, তিনি তরুণতর ও সজীব; অপরদিকে মীগেরের যীশু যেন সদ্য কবিন থেকে উঠে এসেছেন! তাঁর করুণাঘন নতনয়ন সজ্জ্ব ও কোথায় যেন একটা মৃত্যুহায়া তাঁকে ঘিরে আছে! দুটি ক্ষেত্রেই পানীয় আধারটির একই অবস্থান। বৈশরীত্যের ব্যঞ্জনায় এটুকুই—কারাভাগগো ‘টিপিক্যাল পিরামিডাল কম্পোজিশন’ বেছে নিয়ে রমণী মূর্তিকে রেখেছেন ত্রিকোণভূমির বাহিরে, আর মীগেরের কম্পোজিশন তরঙ্গভঙ্গের কোরামতিতে। রঙ দিয়ে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন!

কেন এই নাটকীয়তার অভাব? যেহেতু চিত্রশৈলী ভেরমেয়ার অনুসরণে! যেহেতু ওটিকে ভেরমেয়ারের আঁকা বলে চালাতে হবে। তাহলে জেনে নিতে হয়—কী ছিল ভেরমেয়ারের শৈলীবৈশিষ্ট্য?

ভেরমেয়ারের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—নাটকীয়তার অভাব। ঘরোয়া পরিবেশের। তাঁর দৃশ্যপট প্রায় সর্বদাই চার-দেওয়ালের ভিতর—গার্হস্থ্যচিত্র। যাকে বলে: ‘জেন্রি পিকচার’! সীবনরতা, সঙ্গীতময়্যা, লিপিরচয়িতা, তাসের আড্ডা বা জগে দুখ ঢালা হচ্ছে!

ওঁর চিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : বাস্তবতা! শিল্পীর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ —কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না।

একটা উদাহরণ দিই : তাঁর অতিবিখ্যাত ছোট ছবি Maid servant Pouring Milk (পরিচারিকা পাড়ে দুধ ঢালছে) ছবিটি লক্ষ্য করে দেখুন— দেখবেন, শিল্পনের দেওয়ালে অহেতুক একটা শেরেক পৌঁতা আছে। শেরেকের মাথাটা দেওয়াল থেকে আধ-ইঞ্চি পরিমাণ বেরিয়ে আছে। তাঁর ফলে দেওয়ালে এক-চিলতে একটু ছায়াও পড়েছে! শুধু তাই নয়—আরও লক্ষ্য করলে দেখবেন —যে লোকটা অতীত কালে দেওয়ালে ঐ শেরেকটা পুঁতেছিল সে পাথরের দেওয়ালে আরও কয়েকস্থানে শেরেকটা পুঁতবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সেই অকথিত ঘটনার চিহ্ন রয়েছে দেওয়ালে। ভেরমেয়ারের দৃষ্টিতে সেটুকুও এড়িয়ে যায়নি, তিনি সযত্নে সেই শেরেক-পৌঁতার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সাক্ষীগুলি এঁকে গেছেন! বস্তুত ইয়োরোপে অরিজিনালটি দেখার আগে তা আমার নজরে পড়েনি!

ভেরমেয়ারের-চিত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আলো আসবে বাঁ দিক থেকে। সেদিকে থাকবে একটা বাতায়ন-আভাস। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ সচরাচর সান-বাঁধানো মেঝে থেকে ফুট-চারেক উঁচুতে। লক্ষণীয়, ভেরমেয়ারের এসব বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে মীগেরের নকল ছবিতে। অবশ্য ভেরমেয়ারের-শৈলীর যেটি তুরুপের টেকা সেটার বিষয়ে আলোচনা করা বৃথা। কারণ সেটি অনুভব করতে হলে আপনাকে অরিজিনাল ভেরমেয়ার দেখতে হবে—রঙিন ফটোব্লকে নয়! সেটা হল : তুলির উপর তাঁর অদ্বিতীয় দক্ষতা! খুব হালকা টানে তিনি যে ‘টোনাল এফেক্ট’ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তা অননুক্রমণীয়। সেখানে মীগেরের কতটা সাফল্য লাভ করেছিল, জানি না। তার নকল ছবির অরিজিনাল তো আপনার-আমার নাগালের বাইরে। কিছু

আর্ট-কনোশারদের যে সে কাৎ করেছিল-আর্ট-ইতিহাস তার সাক্ষী!

‘আর্ট’ ছেড়ে এবার ‘ক্রাফ্ট’। ‘শিল্প’ ছেড়ে ‘প্রয়োগবিদ্যায়’।

সবার আগে পারী থেকে কিনে আনল সপ্তদশ-শতাব্দীতে আঁকা একখানা মামুলী ক্যানভাস। সম্ভা নামে। অতি সযত্নে খুলে ফেলল তার ফ্রেম। কাঠগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখল, আর মরচে ধরা প্রত্যেকটি পেরেক, তুলোয় মুড়ে।

এরপর গেল রঙ কিনতে। বাজার থেকে রঙ কিনলে হবে না—প্রবঞ্চনা হতে হবে নীরঙ্ক, নিশ্চিন্দ, অভ্যেদ! ছবির দোকানে যেসব রঙ—কেক অথবা টিউব—কিনতে পাওয়া যায় তা চলবে না। সেগুলি সিঙ্গেটিক। ভেরমেয়ারের আমলে তা বাজারে পাওয়া যেত না! তাহলে সপ্তদশ-শতাব্দীর চিত্রকর রঙ পেত কোথায়? কেন? সহজ উত্তর : রাজারা যেখানে মানিক পায়। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে হাত পেতে। গবেষণা করে জানল, সে-আমলে প্রতিটি শিল্পী নিজের রঙ নিজে বানাতে। তাই সই! হান মীগেরেও তাই বানাবে।
ডামিলিয়ান? যোগাড় করল ‘সিনবার’—মারকিউরিক সালফাইড।

বার্ট সিয়েনা চাও? কেমিস্টের কাছ থেকে কিনে আন হাইড্রোটেড ফেরিক অক্সাইড আর ম্যাগ্নানিজ ডায়োক্সাইড। এবার ওজন-দাঁড়িতে ওজন করে মেশাও। দাঁড়াও, মেশাবার আগে দুটোই আলাদা ভাবে খল-নুড়িতে ভালো কবে মিহি করে নাও। নাহলে রঙটা খোলতাই হবে না। এবার আন্দাজ মতন যোগ কর দিকিন বিশুদ্ধ পলিমাটি! ব্যস্! হয়ে গেল ফার্স্ট-ক্লাস বার্ট-সিয়েনা! উইন্ডসর নিউটনও লজ্জা পাবে!

গাঢ় নীল রঙ চাই? না বাশু, ‘আলট্রামেরিন’ চলবে না। ওটা সিঙ্গেটিক। ভেরমেয়ার ওটা ব্যবহার করেননি। এক কাজ কর : যোগাড় কর কিছুটা বিশুদ্ধ ‘ইন্ডিগো’! ‘নীল’ গো! ঐ যে এশিয়াতে একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ আছে না—ইন্ডিয়া, না কী-য়েন-নাম, সেখানকার নিগারগুলো এককালে বানাতো। বাজারে খোঁজ করে দেখ, এখনো পাবে।

হলুদের জন্য চাই গাছোগ আর ইয়োলো অকার। নির্ভেজাল খনিজ রঙ। প্রকৃতিদত্ত।

হাল্ফ নীল রঙের দরকার হলে ভালো করে গুঁড়িয়ে নিও ‘লাপিস্ লাজুলি’।

আর চাই নানান কেমিক্যাল — ফ্ল্যাভিন্ডাইড, লাইলাকের তেল, তিশির তেল, ল্যাভেন্ডার—এছাড়া খল-নুড়ি, ব্যালেন্স, স্প্যাচুলা, গ্রাভস্!

আর্টিস্টের স্টুডিও তো নয়, ডিসপেনসিং কেমিস্টের ল্যাবরেটরি!

মাসখানেকের সাধনায় তৈরী হল একসেট রঙ—যা খোদ প্রকৃতিদত্ত—যা ব্যবহৃত হয়েছে দশ-পনের হাজার বছর আগে আল্টামেরিয়ার গুহায়, পরে অজন্তার প্রাচীরে, এই তো সেদিন চিমাবুয়ে থেকে ভেরমেয়ারের স্টুডিওতে।

পুরাতন ক্যানভাসের তেলরঙা ছবিটা মুছে ফেলাও বড় সহজ নয়। নিচেকার ক্যানভাসে আঘাত লাগবে না, আঁশ উঠে আসবে না, অথচ উপরের ছবিখানা বেয়ালুম উপে যাবে। গেল।

কিছু ঐ নক্সই বছরের বুড়ির গালের চুল-ফাটগুলো? যেগুলো মহাকাল তাঁর তুলিতে একে চলেন শতাব্দীর অধ্যবসয়ে? ছবি মুছে ফেললোও সেই চুল-ফাট দাগগুলো যে চাই! থাকল!

মীগেরেঁ ইতিমধ্যে প্রকাশ পিজবোর্ডের *কার্টুনে -এঁকে ফেলেছে তার—মানে ভেরমেয়ারের—ছবিখানার আউটলাইন : ইন্সম্যুস পাত্শালায় যীশু !

সরাইখানার টেবিলে প্লেটের উপর খাদ্যদ্রব্যাদি আঁকবার সময় আপনমনেই হেসে উঠল মীগেরেঁ। নিজের মনেই বলল : বান্ধুটি তো নয়, যেন বঁড়শির টোপ! যেন ডক্টর ব্রেডিউসকে এখান থেকেই ডাকছে : আয়! ফলার পেকেছে; খাবিনে? এবার কার্টুনটা ট্রান্সফার করল প্রাচীন ক্যানভাসে। শুরু হল তেল রঙের ছবি। ছয়মাস পরে শেষও হল একদিন।

এর ভিতর দু-দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে! দুবারই কান ঘেষে বেঁচে গেছে।

এক নম্বর : কোন খবর না দিয়েই মাঝরাত্তে একবার জো এসে হাজির। তার বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল—হান কোন নতুন সুন্দরীর প্রেমে পড়েছে। এই নির্জন সাধনা একটা ডেক! ওকে তো চিনতে বাকি নেই জো-র। অ্যানার চোখের আড়ালে যে কায়দায় জো-র সঙ্গে প্রেম করেছে, এখন যে সেই কায়দায় জো-য়ের চোখের আড়ালে নতুন ডলপুতুল নিয়ে খেলতে বসেনি তারই বা নিশ্চয়তা কী? জো সেবার সারাটা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজছিল। না-কোনও ‘ক্লু’ পেল না। কোন কসমেটিক, চুলের কাঁটা, রিবন-ডোনেট-ব্র্যাসিয়ার, প্যাণ্টি—কোন কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। এই ব্যর্থতায় সে অবশ্য খুশিই হল। রাতটা হানের বাত্ববন্ধে কাটিয়ে পর দিন ফিরে গেল পারীতে। আপনারা প্রশ্ন করবেন—আর্ট-ডীলারের প্রাক্তন এবং আর্টিস্টের বর্তমান ঘরপাী কি লক্ষ্য করেনি ওর স্টুডিওর ঐসব অপ্রত্যাশিত সাজ-সরঞ্জাম? খল-নুড়ি খনিজ রঙ? রঙের টিউব-এর অনুপস্থিতি? এমনকি ঘর-জোড়া অতবড় ক্যানভাসখানা? না হয় চাপা দেওয়াই আছে। জানি মা। ইতিহাস নীরব। জো-এর সঙ্গে মীগেরেঁর ডিভোর্স হয় 1943-এ। না তার আগে, না তার পরে দুজনের একজনও সে বিষয়ে কিছু বলে যায়নি। দু-নম্বরের দুর্ঘটনা আরও মারাত্মক!

ঐ সমুদ্রতীরের টুরিস্ট-স্পটে হঠাৎ একটি তরুণী নিখোঁজ হয়ে যায়।

হয়তো সমুদ্রস্নান করতে গিয়েছিল একলা-একলা। তার জলমগ্ন মৃতদেহ কিছু ভেসে আসেনি। এ ঘটনা ঘটে, যখন নাকি হান ছবিটা প্রায় শেষ করেছে। হানের প্রতিবেশী কোন সন্দ্বিদ্ধচিত্ত ব্যক্তি থানায় গিয়ে জানায় ‘প্রিমেভেরা’র ঐ বিদেশী লোকটাকে সে সন্দেহ করে। লোকটা কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না। কী করে সে ওখানে? নোটজাল? ওর বাড়ির চিমনি দিয়ে অনর্গল অত ধোঁয়াই বা বার হয় কেন? ধোঁয়া নানান রঙের, নানান গন্ধের। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, ধোঁয়া দিবারাত্রি নির্গত হয়। ব্যাপারটা কী? মাঝরাত্তেও কি ঐ একলা মানুষটা রান্না করে? নিঃসন্দেহে সে কিছু পুড়িয়ে ফেলেছে, পুতিগন্ধময় কোন কিছু। কী সেটা?

পুলিসের সন্দেহ হল—ঐ বিদেশী ডাচ শিল্পী যে-কোন কারণেই হোক সেই নিখোঁজ ইতালিয়ান মেয়েটিকে গুম খুন করেছে। এখন তার দেহটা খণ্ড-খণ্ড করে বাড়ির ভিতরেই পুড়িয়ে ফেলেছে।

* এখানে কার্টুন মানে ব্যঙ্গচিত্র নয়। চিত্রশিল্পে cartoon শব্দটি দ্বিতীয় এক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোন বড় মাপের ছবি আঁকতে হলে চিত্রশিল্পী অন্য একটা কাগজে সমমাপের একখানি আউট-লাইন আঁকেন। তাকেও বলে ‘কার্টুন’। মূল ছবিতে যাতে বেশি রবার ঘষতে না হয় তাই এ আয়োজন। ‘কার্টুন’ থেকে মূল ক্যানভাসে (প্রাচীরচিত্রের ক্ষেত্রে দেওয়ালে) ঐ আউটলাইন কপি করে নেওয়া হয়।

সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ওরা প্রিমাভেরা'তল্লাসী করল। দেখল, আর্টিস্ট নানান জাতের রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কী-এক অদ্ভুত গবেষণা করছে। নানান-রকম নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল পুলিশ। ল্যাবরেটরি-বিশ্লেষণে জানা গেল, প্রত্যেকটিই ইনজার্ম্যানিক সস্ট—জানুভ পদার্থ নয়। কান ঘেঁষে বেঁচে গিয়েছিল সেবারও—।

এবার নতুন জাতের সমস্যা।

তেলরঙ পুরোপুরি শুকিয়ে উঠতে সময় নেয় বিশ-পঞ্চাশ বছর। মীগেরেঁ আবিষ্কার করল—হ্যাঁ আবিষ্কার বইকি—তেলরঙ আঁকা ছবির উপর যদি হাল্কা করে এক কোট পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রলেপ দেওয়া যায়, আর তারপর ঘণ্টা-ছয়েক একশ পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ঝলসে নেওয়া যায়, তাহলে সব-জাতের তেলরঙই সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আর এভাবে দ্রুতগতিতে শুকিয়ে ওঠার ফলে উর্ণাভ-চিহ্নের মতো ছবিতে দেখা দেবে কিছু চুলফাটের দাগ—যা নাকি দু-তিন শ বছরের পুরানো ছবির একটি আবশ্যিক সনাক্তিকরণ চিহ্ন।

সব কাজ যেদিন শেষ হল সেদিন ও বসল নিজের দুর্গা নিজেই বিচূর্ণ করতে। এখন তার দ্বৈতসত্তা ! একাধারে চিত্র-বিক্রেতা এবং আর্টকনৌশর !

এমন কোনও হাতিয়ার আছে কি— ললিতকলা অথবা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের এজিয়ারে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, এটি ‘অরিজিনাল ডেরমেয়ার’ নয়? ডেরমেয়ারের কম্পোজিশান, আলো-ছায়ার লুকোচুরি, তুলির টান, ম্যানারিজম, কোথাও কোন ফাঁক আছে কি? ডেরমেয়ার দেওয়ালে পেরেক-পোঁতার অকথিত কাহিনী এঁকেছিলেন—মীগেরেঁ তেমনি এঁকেছেন জামার হাতায় সীবনশিল্পীর সুনিপুণ ছুঁচের ফোঁড়! আলো বামপ্রান্ত থেকে, আলো-ছায়ার মিতালী নিখুঁত, চিত্রের বামপ্রান্তে একটি বাতায়নের আভাস। ছবি তো নয়, যেন ডেরমেয়ার-রসে টাইটনুর এক খোকা আঙুর। ললিতকলা মেনে নেবে তা।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যাও হার মানবে। ফ্রেমের কাঠের এক-চিলতে ভেঙে নিয়ে পরীক্ষা করাও, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রায় দেবেন— যে গাছের ডাল থেকে ঐ ফ্রেমের কাঠ তৈরী হয়েছে সেই বৃক্ষের মৃত্যু হয়েছে দু-তিন শতাব্দী আগে। ব্যবহৃত পেরেকগুলোর গায়ে জমে-ওঠা মরচেও তাই বলবে। রঙের কাঠিন্য, গভীরতা, চুলফাটের দাগ দেখেও কেউ বলতে পারবে না এটা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আঁকা।

না! নিজের দুর্গা নিজেই ভেদ করতে পারল না মীগেরেঁ।

হেসে উঠল আপন মনে।

তৎক্ষণাৎ ধমক দিল নিজেকে : বোকার মত দাঁত বার করে হেস না! *সুদৃঢ়জয় এখনো হয়নি। সামনেই তোমার শেষ পরীক্ষা! ডক্টর আব্রাহাম ব্রেডিউস-এর অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এখনো ফাঁকি দেওয়া বাকি। এমন কায়দায় বঁড়িশিতে-গাঁথা টোপটা বুড়োর নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরতে হবে যাতে লোভী বুড়োটা টপ্ করে গিলে ফেলে। অমনি হ্যাঁচকা টান : খ্যাঁ - চ !

অতি ধুরন্ধর সে। সরাসরি হাজির হল না ডক্টর ব্রেডিউস-এর কাছে। সে বরং এসে হাজির হল ডক্টর বুন-এর চেম্বারে। তারিখটা ত্রিশে আগস্ট, 1937। ডক্টর জি. এ. বুন আমস্টারডামের একটি বিখ্যাত সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়র পার্টনার। অত্যন্ত মানী ব্যক্তি। অগাধ সম্পত্তির

মালিক, ততোধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী। সে-সময়ে একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা পাল্‌মেটোরিয়ান। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আর্ট-ল্যাবার : চিত্রশ্রেণিক। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি দেখবার মতো। মীগেরেঁ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। এবং অচিরে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেল।

সেই সন্ধ্যায় হান মীগেরেঁ বুনকে শুনিয়ে দিল একটা অদ্ভুত আঘাতে গল্প :

হল্যান্ডের ওয়েস্টল্যান্ড অঞ্চলে তিন-চার শ বছর আগে ছিল একটি দুর্গ।

রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপ্লব দুগাধীপ সপরিবারে পালিয়ে যান ইতালীতে। সঙ্গে নিয়ে যান যা পারেন।

তাঁর সংগ্রহে নাকি অনেক-অনেক দুর্লভ চিত্র ছিল ওল্ড মাস্টার্সদের : হলবেন, এল গ্রেকো,

রেমব্রাণ্ট, ফ্রান্স হাল্জ প্রভৃতি। ঐ রাজবংশের অধস্তন এক অষ্টাদশী— তার নাম

‘মার্ভোরাক্স’—বর্তমানে মীগেরেঁর গোপন প্রণয়িনী। মেয়েটি বিবাহিতা, তার স্বামী ও একটি

সন্তান আছে ইতালীর মিলানে। বংশের আদিপুরুষ হল্যান্ড থেকে যে সম্পত্তি ইতালীতে নিয়ে

এসেছিলেন তার ভিতর ছিল প্রায় দেড়শ মাস্টারপিস্। মীগেরেঁ নিখুঁত হতে চাইল; নোটবই

দেখে বললে—খাতাপত্রের হিসাব মতো তিনি নিয়ে এসেছিলেন একশ বাষট্টিখানি ছবি, কিন্তু

বাস্তবে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে একশ সাঁইট্রিশটির। ভাগ হতে হতে মার্ভোরাক্সের হেপাজাতে এসেছে

খান-সাতেক প্রাচীন চিত্র। কোনটা কার আঁকা সে জানে না। তার ভিতর খান-তিনেক লুকিয়ে

নিয়ে মেয়েটি সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসেছে। জানাজানি হলে ফ্যাসিস্ট সমর-নায়কেরা ওকে

গুলি করে মারত। কারণ বেনিতো মুসোলিনি ফতোয়া জারী করে রেখেছে যে, জাতীয় সম্পদ

বিদেশে পাচার করার চেষ্টা করলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে! সেই তিনখানি ছবির ভিতর একখানি

নিয়ে মেয়েটি এসেছিল মীগেরেঁর কাছে। কার আঁকা ছবি, কত দাম হতে পারে সে কিছুই

জানে না। মীগেরেঁ ছবিখানি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়; কারণ তার মনে হয়, এটি ‘ভেরমেয়ারের

অরিজিনাল’! মেয়েটি এখনো সে-কথা জানে না। তবে সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে মীগেরেঁ

তার প্রণয়িনীকে বঞ্চিতা করবে না। ন্যায্য কমিশন কেটে নিয়ে সব অর্থই সে মার্ভোরাক্সকে

দেবে। মীগেরেঁ দীর্ঘ কাহিনীর অন্তে বলে, আপনি, স্যার একবার কাইন্ডলি দেখবেন ?

বুন নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, আমি ছবি ভালবাসি। অনেক বিখ্যাত ছবি আছে আমার

সংগ্রহে। তবে খোলা কথাই বলছি বাপু, আমি শিল্পবিশারদ নই, চিত্রশ্রেণিক মাত্র। যাহোক,

তোমার গল্পে আমি উৎসাহিত হয়েছি। ছবিখানা দেখাতে পার ?

পরদিনই মীগেরেঁ তার সদ্যসমাপ্ত ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’খানা বগলদাবা করে হাজির হল

ডক্টর বুন-এর চেম্বারে। বুন মুগ্ধ হয়ে গেলেন ছবিটি দেখে। অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ সেটির

দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার!

মীগেরেঁ ন্যাকা সেজে বললে, ছবিটা দেখে প্রথমটা আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা

বিরাট খটকা আছে, স্যার !

— কী খটকা ? কোথায় সন্দেহ হচ্ছে তোমার ?

— আমি স্যার যতদূর জানি, ভেরমেয়ারের ছবিতে দু-জাতের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। হয় M

অক্ষরের মাথায় I-অক্ষরটা অথবা ‘আই’-এর পরে ফুটকি দিয়ে ‘এম’ অক্ষরের সম্মুখে একটা

অহেতুকী আঁকড়ি। কোন ছবিতেই ওঁর স্বাক্ষরে শেষ ‘F’ অক্ষরে এমন ঢেউখেলানো লেজুড়

নেই। আপনি কাগজ-পেন্সিল দিন, আমি এঁকে দেখাই।

ডক্টর বুন কাগজ-পেন্সিল এগিয়ে দিলেন। মীগেরেঁ দুটি স্বাক্ষর আঁকল পাশাপাশি :

I Meerv অথবা I. Meerv

ডক্টর বুন উঠে গেলেন। বইয়ের আলমারি থেকে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বার করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, না হে মীগেরেঁ। তোমার ধারণাটা ভুল। ভেরমেয়ার তিন জাতের স্বাক্ষর করেছেন তাঁর ছবিতে। শেষ 'আর' অক্ষরে ঢেউ খেলানো লেজুড় সমেত স্বাক্ষরও পাওয়া গেছে। এই দেখ :

প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা গেল ছবিটা :

I Meerv

মীগেরেঁ চূপ করে গেল। বুন বললেন, স্বাক্ষরটা বড় কথা নয়, মীগেরেঁ! সেই-জাল অনেকেই নিখুঁতভাবে করতে পারে। কিন্তু ভেরমেয়ারের তুলির টান—টোনাল এফেক্ট অননুক্রমীয়। আমি প্রায় নিঃসন্দেহ, এটি সেই মহাশিল্পীরই স্পর্শধন্য। তা সত্য হোক না হোক, এ ছবিখানি আমি কিনব—আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার জন্য। এটি একটি অসামান্য ক্যানভাস! কিন্তু কাকে দিয়ে পরীক্ষা করাই?

মীগেরেঁ তিন-চারজন শিল্প-বিশারদের নাম করল, আসল ব্যক্তিটির নাম এড়িয়ে। বুনর পছন্দ হল না। বললেন, ভেরমেয়ার-বিষয়ে অবিসংবাদিত অথরিটি হচ্ছেন ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্। কিন্তু তিনি এখানে নেই। আছেন মোনাকোতে।

- সে তো অনেক দূরের পথ, স্যার। তার চেয়ে বরং...

বুন হাসলেন। বললেন, আমি বুঝতে পারছি মীগেরেঁ, তুমি কেন ডক্টর ব্রেডিউস্কে এড়িয়ে যেতে চাইছ। পথটা দূর বলে নয়। অন্য একটা কারণে! তাই নয়?

— কী কারণ স্যার?

— ব্যাপারটা আমি জানি। সেই তোমার রেস্টোর-করা ফ্রান্স হাল্জ্-এর ক্যাভেলিয়ারখানার কথা তুমি ভুলতে পারনি বলেই। সেখানা সত্যিই হয়তো ছিল হাল্জ্-এর অরিজিনাল। কিন্তু উপায় নেই, মীগেরেঁ। আজকের দুনিয়ায় কোন 'ভেরমেয়ার' আবিষ্কৃত হলে তা ডক্টর ব্রেডিউস্কে দিয়ে পরীক্ষা করাতেই হবে। তিনি যতক্ষণ না সার্টিফাই করছেন, পৃথিবী সেটাকে মেনে নেবে না।

মীগেরেঁ অসহায়ের ভঙ্গিতে 'শ্রাগ' করল শুধু।

— না! আমি কোন রিস্ক নিতে পারি না। এটা বিস্ম-অলিভক্সার ব্যাপার! নতুন একখানা ভেরমেয়ার আবিষ্কৃত হওয়া মানে 'ওয়ার্ল্ড-নিউজ'! বিশেষ, এটি বাইবেল-অবলম্বনে তাঁর দ্বিতীয় চিত্র। আমি নিজেই যাব ফ্রান্সে, মোনাকোতে। ছবিখানা নিয়ে। তুমিও চল। সব খরচ

আমার।

যীগেরেঁ বেঁকে বসল, না স্যার, আমি নেশথ্যে থাকতে চাই। মার্ভরোখ্-এর স্বামী আমাকে সন্দেহ করে। সে জানে, মেয়েটি ছবিখানা নিয়ে ইতালী থেকে ফ্রান্সে এসেছে। কোথায় আছে তা সে জানে না। এ ছবির প্রসঙ্গে আমার নামটা কিছুতেই যেন না উঠে পড়ে!

— তবে মার্ভরোখ্-কেই আমার কাছে নিয়ে এস।

— সে তো আরও অসম্ভব, স্যার! সে যে ইতালীর সীমান্ত থেকে ওটা লুকিয়ে এনেছে। এই নতুন ভেরমেয়ার প্রসঙ্গে যদি মার্ভরোখের নামটা উঠে পড়ে, তাহলে ফ্যাসিস্ট-ইতালীতে ওর স্বামী আর সম্ভানের উপর অকথ্য অত্যাচার হবে।

বুন চিন্তায় পড়লেন। বলেন, কিন্তু আমি তাহলে ডক্টর ব্রেডিউসকে কী বলব? কোথায় এখানা পেয়েছি?

— বলবেন, আপনার একজন মক্কেল অর্থনৈতিক বিশাকে পড়ে তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দিতে চাইছে, স্থাবর সম্পত্তি বাঁচাতে। ঐ অস্থাবর-সম্পত্তির মধ্যে আছে এই ছবিখানি—যেটি দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছে এটি ‘অরিজিনাল ভেরমেয়ার’ হলেও হতে পারে। তা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এই একখানি মাত্র ছবি বিক্রি করেই মক্কেল তার সব দেনার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। আপনি ডক্টর ব্রেডিউস্-এর সাহায্যপ্রার্থী। প্রফেশনাল এথিক্স অনুযায়ী মক্কেলের নাম আপনি ডক্টর ব্রেডিউসকে জানাতে পারছেন না। তা উনি জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না। তাই নয় কি?

ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস-এর বয়স তখন আশীর উপর। বুনের কাহিনীটি তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ছবিখানি দেখতে চাইলেন। ক্রেট খোলা হল। সামনের দেওয়ালে, আলোর সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ছবিটা। বৃদ্ধ শিল্প-বিশারদ নির্নিমেষ-নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন বহুক্ষণ! তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজ্জল হয়ে ওঠে। ক্রমে বলিরেখাঙ্কিত দুগালে নেমে এল জলের ধারা!

পুরো দশ-মিনিট পরে বাক্য-নিঃসরণ হল তাঁর সিক্ত কণ্ঠ থেকে : ডক্টর বুন! আমি নিঃসন্দেহ : এটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার!

— আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।

— সন্দেহ-টন্দেহ নয়, ডক্টর বুন। এ আমার স্থির-সিদ্ধান্ত! দেখছেন না— যীসাস্-এর মুখখানা! আর কারও তুলিতে ও জিনিস ধরা দিতে পারে? যীসাস্ জীবিত, অথচ মৃত! তাঁর করুণাঘন আনত নয়নে স্নিগ্ধ শান্তি; কিন্তু তাঁর রুক্ষ-চুলে, বিশীর্ণ অধরে, রক্তশূন্য গাত্রবর্ণে কফিনের স্বাক্ষর! যেন মৃত্যু মহাভীর্ণ অতিক্রমণে ‘রেজারেক্শান’ হয়েছে মানবত্বাতার! এটি ভেরমেয়ার-এর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির অন্যতম।

— আপনি তাহলে সার্টিফাই করে দেবেন?

উজ্জ্বল উপে গেল। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছলেন প্রফেশনাল আর্ট-কনৌশার। বলেন, আপনি যদি লিখিত সার্টিফিকেট চান, তাহলে ছবিখানা আমার কাছে রেখে যেতে হবে। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ল্যাবরেটোরিতে পরীক্ষা না করে লিখিত সার্টিফিকেট দিতে পারি না; আর আমার প্রফেশনাল ‘ফি’টা—

— জানি স্যার। রেটটা আমার জানা। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি বর্তমান এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুর আছে। ‘রিটেইনার ফি’টা আপনার সেক্রেটারিকে দিয়ে যাচ্ছি। বলুন কবে আসব?

— আটক্লিশ ঘণ্টা পরে। বেশি সময় নিতে সাহস পাই না। ‘আশী’ পার করেছি তো!

— সেকি কথা, স্যার! আপনি শতায়ু হবেন। তাহলে পশু?

— হ্যাঁ, তাই!

তাই এলেন উনি। এসে দেখলেন, ডক্টর ব্রেডিউস ইতিমধ্যে স্থানীয় ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ঐ ছবির একটি আলোকচিত্র বানিয়েছেন—দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি। তার পিছনে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন :

“ভেরমেয়ারের এই অনবদ্য চিত্রটি—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ডেফ্‌-এর অনুকরণীয় জাঁ ভেরমেয়ার-এর (1632-75), শিল্পজগতে যাঁর অভিধা : ‘The Sphinx of Delft’—আঁকা ‘ইস্মেয়ুস্ সরাইখানায় প্রভু’ যে আমার জীবদ্দশায় আবিষ্কৃত হল, এতে আমি ধন্য। ঈশ্বকে ধন্যবাদ! তিন শতাব্দী পরে রেজারেক্টেড যীসাস্-এর আবার রেজারেক্শান হল! তৈলচিত্রটি অসূর্যস্পশ্য (ইংরাজী অনুবাদে বলা হয়েছে undeified ; ডঃ ব্রেডিউস্ যে মূল ডাচ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে ‘ongerept’ -ভাষাবিদ পণ্ডিত বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন যে, তার অর্থ : অস্পর্শিত, virgin। বোধহয় ডক্টর ব্রেডিউস্ বলতে চেয়েছিলেন যে, বিগত তিনশ বছরে কোনও রেস্টোরেটরের তুলিস্পর্শে মূল ছবিখানির সতীত্বহানি হয়নি।) ভেরমেয়ারের এ জাতীয় অনবদ্য ছবি আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। ছবিখানা প্রথম দর্শে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার দু-চোখ অশ্রুসজ্জল হয়ে উঠেছিল। কারণ মানবদ্বাতার এই দ্বিতীয় আবির্ভাব আমার প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত, এবং ইতিপূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীতে ঘোষিত। আমি ধন্য যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী আমার জীবদ্দশাতেই সত্য প্রমাণিত হল। কম্পোজিশন, ভাবের অনুরণন, রঙের ব্যবহার, টোনাল এফেক্ট—সব কিছু মিলিয়ে ভেরমেয়ারের এই তৈলচিত্রটি বিশ্বললিতকলার এক অনবদ্য দুর্লভ সংযোজন।—

অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস, সেপ্টেম্বর, 1937”।

বুন নিজেই ছবিখানা কিনে নিলেন।

পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার গিল্ডার্সে!

অনতিবিলম্বে বিশ্বের যাবতীয় বিখ্যাত আর্ট-জার্নালে সংবাদটি পরিবেশিত হল। ডক্টর ব্রেডিউস ও বুনর উৎসাহে দর্শক-সাধারণকে সেই অনবদ্য চিত্রটি দেখানোর জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হল। রটাডার্মের প্রখ্যাত বয়ম্যানস্ সংগ্রহশালার প্রদর্শনী-কক্ষে। সেদিন আমস্টারডাম, হার্নেম, উদ্রেচ, দ্য হেগ, আর ডেলফ্‌ থেকে হাজার হাজার উৎসাহী দর্শক আর চিত্রসম্বাদারেরা ভীড় করে এসে উপস্থিত হলেন রটাডার্মের ঐ চিত্রশালায়। এমনকি বিদেশ থেকেও উড়ে এলেন বিভ্রাণী উৎসাহীর দল। আর্ট-মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করলেন। সমবেত দর্শকদল নতজানু হল ‘রেজারেক্টেড’ যীসাসকে দেখে। ডক্টর অ্যাব্রাহাম ব্রেডিউস্ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। কোন্ কোন্ সূত্র ধরে প্রমাণ করা যায়—এ চিত্রটি ভেরমেয়ার ছাড়া আর কারও তুলিস্পর্শে মূর্ত হতে পারে না! চিত্রটির এক শৈল্পিক বিশ্লেষণ করলেন তার গুণকীর্তন করতে, যাকে বলে ‘ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান।’ মুহূর্তে করতালিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সভাগৃহ।

সব শেষ হলে ব্রেডিউস যখন মন্ত্রীমহোদয়কে ছবির মর্মার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তখন কে-একটা ফালতু লোক তীড়ের শিছন থেকে বলে উঠেছিল : যীসাস্-এর মুণ্ডটা কিন্তু ক্যাডাভারাস, মরা মানুষের! আদৌ জীবন্ত মনে হয় না! বিশ্বাস হয় না— ভেরমেয়ার এমন নির্জীব মুণ্ড একেছেন ?

ডক্টর ব্রেডিউস স্বলভ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। মন্ত্রীমহোদয়ের দেহরক্ষী তা দেখে ভীড়টা হটিয়ে দিল। ব্রেডিউস্ জনান্তিকে ডক্টর বুনকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ লোকটা কে বলুন তো ? শিছন থেকে ফোড়ন কাটছিল ? মুখটা চেনা-চেনা—

— ও স্যার একজন সামান্য রেস্টোরেটর, ওর নাম হান ভাঁ মীগেরেঁ !

— ও ! চিনতে পেরেছি। ঐ ছোকরাই একদিন একখানা জাল-হাল্জ্ এনে সাচ্চা বলে চালাতে চেয়েছিল। এইসব ফালতু চ্যাঙড়াদের এজাতীয় প্রদর্শনীতে ঢুকতে দেন কেন ?

॥ নয় ॥

পুরো দুটি মাস লাগল জেলখানায় বসে ছবিখানি শেষ করতে। এক মাসে পারল না। কারণ ছিল। দুঃসাহসী শিল্পী নিজেই বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছিল। এই তার জীবনের শেষ ভেরমিয়ার : “যুবক যীশু চিকিৎসকদের মাঝখানে”। ছবিখানার মাপ 38 ইঞ্চি × 75 ইঞ্চি। বেশ কয়েকজন শিল্পবিশারদকে সরকার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন ছবিখানি দেখাতে। প্রেসকে কাছে ভিড়তে দেওয়া হল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফিগারো পত্রিকার একজন মহিলা সাংবাদিক। তাকে নিয়ে পুলিশ কমিশনার-সাহেব ‘সাপের-ছুঁচো-গেলা’ অবস্থায় আছেন।

কাইজারগচ সড়কের সেই সুঁড়িওটির সামনে সেদিন সারি সারি ঘটোর গাড়ি এসে পার্ক করেছে। পুলিশ ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। বৈঠকখানা ঘরে আলোর সামনে রাখা আছে প্রকাশ তৈলচিত্রটি। একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। আগন্তুকেরা জানেন যে, ছবিখানা বন্দী মীগেরেঁ এই কারাগারে বসে একেছে ভেরমেয়ার শৈলীতে। সে-খবরটা এখন লুকানোর চেষ্টা বৃথা। সকলে সমবেত হলে কাপড়ের আবরণটি সরিয়ে দেওয়া হল। একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠল ঘরের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে। শিল্পবিশারদের দল এগিয়ে এলেন। কাছ থেকে দূর থেকে, কখনও বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করলেন ছবিখানা। চিত্রপটের মাঝখানে যুবক যীশু — তাঁর সমুখে একটি পাতা-খোলা প্রকাশ গ্রন্থ। তাঁর বামে চারজন, দক্ষিণে চারজন পুরোহিত-চিকিৎসক। যথারীতি বাঁ-দিক থেকে আলো এসে পড়েছে; সেদিকে একটা বাতায়নের আভাস। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ স্বাভাবিক ভেরমেয়ারী। মেঝে থেকে হাত দুয়েক উঁচুতে।

ক্লাস্ত পলিতকেশ শিল্পী বসে আছেন কক্ষের একান্তে একটি সোফায়। ওঁর বয়স মাত্র আটান্ন; কিন্তু বার্বক্যে জীর্ণ, দেখলে মনে হয় সত্তর! কিছুটা মার্ক্সিয়ার অভাবে, কিছুটা সাম্প্রতিক ঝড়ের প্রভাবে।

আর্ট-কনৌশার-এর দল ওঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবার।

ওঁদের মুখপাত্র হিসাবে পলিককেশ এক বৃদ্ধ বললেন, মস্যুয়েঁ মীগেরেঁ। আমার কাছে যদি কোনও মক্কেল এই ছবিখানা খরিদ করার আগেই যাচাই করাতে নিয়ে আসত, তাহলে স্বর্গত ডক্টর ব্রেডিউস্-এর মতো আমিও লিখে দিতাম : এটি একটি অরিজিনাল ভেরমেয়ার! স্বীকার করি

: ভেরমেয়ারের ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্সট্রাস’-এর তুলনায় এখানে নিকট, তবু...

কোথাও কিছু নেই অটোহাস্যে ফেটে পড়ল মীগেরেঁ।

বাও করে বলেন, অনারেবল্ জাস্টিস অটি-কনৌশার, স্যার। অবজেক্শান! ভেরমেয়ার আদৌ কোনও ‘ক্রাইস্ট অ্যাট ইন্সট্রাস’ আঁকেননি! আপনি এখনো অবসেশনে ভুগছেন...

বৃদ্ধ হেসে বলেন, আয়াম সরি! তা ঠিক! আমি এখনো আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না!

মীগেরেঁ পুনরায় বাও করে বলেন, এক্সকিউজ মি সার্স! এবার আপনারা দয়া করে আসুন। ঘরখানা খালি করে দিন। এই একখানা ঘরই আমার স্টুডিও-কাম-প্রিজন সেল! আপনারা বিদায় হলে আমি একটু ঘুমাব। আমি বড় ক্লান্ত! আমার ঘুম পাচ্ছে!

সরকার নিয়োজিত এক্সপার্ট-এর দল মার্জনা ভিক্ষা করে বিদায় হলেন।

গেল না শুধু একজন। পুলিশ-সুপার।

ঘুম জড়ানো চোখে মীগেরেঁ তাঁকে বললেন, আপনি গেস্ট নন, হোস্ট! তবু আপনাকেও বিদায় হতে বলছি। কিছু কি বলবেন?

— বলব! নাৎসী সমর-নায়কদের কাছে জাতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করে দেবার অভিযোগ আমরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি...

— আসাতে! আ’য়াম এক্ষটেড। আমি অত্যন্ত আনন্দিত! তাহলে কি আমি মুক্ত? ঐ মেয়েটাকে নিয়ে নিজের বাড়ি যেতে পারি? ওর একখানা শোফ্রেট...

— আঞ্জে না! আপনাকে এই মুহূর্তে নতুন করে ত্রেপ্তার করা হচ্ছে মসুরেঁ মীগেরেঁ। প্রবঞ্চনার অপরাধে। জাল ছবিকে আসল বলে চালিয়েছেন আপনি। ভেরমেয়ারের সইটাও জাল করেছেন। এগুলি জালিয়াতি—আন্ডার সেক্শান 326B.

মীগেরেঁ বজ্রাহত!

আবার পুলিশ-ড্যান। আবার জেল হাজত!

॥ দশ ॥

তিনিট মাস পার হয়ে গেছে তারপর।

ইতিমধ্যে অ্যাগনেস বার-কতক পারী গেছে এবং আমস্টারডামে ফিরে এসেছে। মীগেরেঁ কারাগারে পুনরায় নিষ্কিপ্ত হবার পর অ্যাগনেসের পক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়া আর সম্ভবপর হচ্ছিল না। অবশ্য পুলিশ-কমিশনার-সাহেবের অনুমতি মোতাবেক প্রায় প্রতিদিনই বন্দীদের সাক্ষাৎ-সময়ে সে জেলখানায় দেখা করতে আসে। কমিনার-সাহেব এজন্য একটি বিশেষ ‘পাস’ দিয়েছেন তাকে দু-তরফা চাপে পড়ে। প্রথমত ভ্যালেরিয়াম ক্লিনিকের চিকিৎসকের নির্দেশে। বন্দীর স্বাস্থ্য অতি দ্রুত ভেঙে পড়েছে। হয়তো বিচার শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হবে, যদি না সাবধান হওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার লক্ষ্য করে দেখেছেন— ঐ বিশেষ সাক্ষাৎকারিণীর সান্নিধ্যে বন্দীর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা প্রবলতর হয়। দ্বিতীয়ত ফিগারো-সম্পাদক লে লোরেনের সনির্বন্ধ-অনুরোধ কী জানি-কেন তিনি এড়াতে পারছিলেন না। তাই অ্যাগনেস মাঝে-মাঝে পারী অফিসে যেতে বাধ্য হলেও মোটামুটি ঐ 264নং প্রিন্সেনগ্রাচ-এই ডেরা-ডান্ডা গেড়েছে।

পঁয়কারেকে সে জন্য মেঝেতে শুতে হয় না আজকাল, ল্যান্ডলেডি তাবুর্গও কোন ‘আতান্তরি’তে পড়েননি। এক-কামরার ঘরে ওরা দুজনে দিব্যি সংসার পেতেছে—বব্ আর অ্যাগনেস পঁয়কারে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাগনেসের পদবীটার বদল হয়েছে। শ্যাম্পেন থেকে পঁয়কারে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের রাত্তার ধারের ঘরখানায় বসে অ্যাগনেস পঁয়কারে তার দিনপঞ্জিকা লিখছে। বব্ গেছে পারী, আগামী কাল তার ফেরার কথা। ল্যান্ডলেডিও বাড়ি নেই, গেছে মার্কেটিঙ-এ। বে-উইন্ডোর আলোর নিচে টেবিলে দিনপঞ্জিকা লিখতে বসেছে অ্যাগনেস।

বে-উইন্ডোর উপরে গোটা-কয়েক ফুলের টব। একটাতেও কোন ফুলের চারাগাছ নেই—ফুল দূর-অন্ত! অথচ এটা অক্টোবর মাস। আমস্টার্ডামের বাতায়নপথে এখন ফুলে-ফুলে রঙ-বেরঙের হাতছানি দেখা পাবার কথা। গত চার-পাঁচ বছর গেছে শতাব্দীর ব্যতিক্রম। সমস্ত পাড়াটা যেন এখনও শ্মশান—এই প্রিন্সেনগ্রাচ রাজপথটা। কারণ আছে। এটা ছিল ইহুদীদের এলাকা। জার্মান অধিকারের আগেই কিছু লোক পালিয়ে গেছে ইংল্যান্ডে — আমেরিকায়, অধিকাংশই গেছে কনসেন্টেশন ক্যাম্পে। তারা এখনো ফিরে আসেনি। দু-তিন বছর ধরে জনমানবশূন্য দু-তিনতলা বাড়ি তাদের অতীতের কলরবমুখরিত দিনগুলির স্বপ্নে আজও মৌন। কোন বাড়ির জানলার ছিটকানি হয়তো খুলে গেছে। উইল্ডমিল-দেশের ঝোড়ো হাওয়ায় সেই পাল্লাগুলি আজও অতীত বাসিন্দাদের দুঃখে বুকচাপড়ে কাঁদে। জানলার সামনেই যে তিনতলা বাড়িটা আছে, এই ব-মাসে সেখানে একদিনও আলো স্ফলিতে দেখেনি।

অ্যাগনেসের দৃষ্টি জানলা থেকে নেমে এল ওর লেখার টেবিলে। সেখানে পাশাপাশি দুটি ছবি ফটো-স্ট্যান্ডে বাঁধানো। একটি তেলরঙের ছবি, একটি আলোকচিত্র। দুটির কম্পোজিশনই কিন্তু একই রকম। কারাভাগগো আর মীগেরের ‘ইয়েয়ুস’ ক্যানভাসে কম্পোজিশনের যে সাদৃশ্য তার চেয়েও বেশি। দুটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে পশ্চাদশটে একটি গীর্জা আর তার সামনের সিঁড়িতে বসে আছে একটি রমণী। তেলরঙের ছবিতায় মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ সাদামাটা; ফটোখানায় সে ওয়েডিং-গাউন পরে! প্রথমখানি অ্যাগনেসের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া, দ্বিতীয়খানি অ্যাগনেসের অনুরোধে বব্ তুলে দিয়েছিল রটার্ডাম সেট মেরী চার্চে—ওর বিয়ের দিন! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অ্যাগনেসের।

সেই কথা দিয়েই শুরু করল আজকের রচনা :

264, প্রিন্সেনগ্রাচ/আমস্টার্ডাম

দেশের অক্টোবর’ পঁয়তাল্লিশ

“রঙের যে টেক্সানার দৌলতে শেষ-শিঠ তুলব বলে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখন দেখছি তার কোনও দামই নেই। যেন ভেরমেয়ারের স্বাক্ষরিত ছবি, প্রমাণিত হয়ে গেল প্রবঞ্চকের আঁকা বলে! ইতিমধ্যে রঙ বদলে গেছে। দামটাও! আমার সত্যিকারের পরিচয় ওঁকে আর কোনদিনই জানানো যাবে না। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, আপনি যা বলছেন, তাতে ‘মার্ভোরাক্স’ নামে কেউ কোনদিন ছিল না—ওটা আপনার মনগড়া একটা নাম। অথচ শুনেছি, আমস্টার্ডাম-পুলিস বলছে ফ্রেঞ্চ-পুলিসের সূত্র থেকে ওরা জেনেছে যে, ‘লা ম্যাগনিফিক’ থেকে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল, হোটেলের খাতায় তার নাম লেখা আছে ‘মার্ভোরাক্স’। এটা কেমন করে হল ?

‘উনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, জানি না!

“—আমি কিছু জানি।—বলেছিলাম আমি।

“আমি নিশ্চিত, ছয়মাস আগে হলে উনি লাফিয়ে উঠতেন। বলতেন— তুমি! তুমি কী করে জানলে? কী জান তুমি?

“তার বদলে উনি শুধু বললেন, ও!

“কোনও কৌতূহল নেই এ বিষয়ে! বন্দীজীবনে ওঁর বিরাট একটা মানসিক পরিবর্তন হয়ে গেছে এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দুনিয়ার উপর উনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কোন কিছুতেই উৎসাহ বোধ করছেন না। বাঁচবার ইচ্ছাটাই যেন আর নেই।

“অথচ বকে সেদিন ঐ-কথাটা বলতে সে লাম্বিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, মীগেরেঁ-এপিসোডের ঐ একটা সমস্যার সমাধানই আমি খুঁজে পাইনি। তুমি পেয়েছ? কী করে পেলেন?

“আমি বলি, কী করে পেলাম, তা বলছি, কিছু সমস্যাটা কী, বুঝিয়ে বল তো?

“—মসুয়েঁ মীগেরেঁ বলছেন, ‘মাতুরোথ’ নামটা তিনি বানিয়েছেন অথচ ডাচ-ইন্টেলিজেন্স-এর খবর ‘লা-ম্যাগনিফিক’ থেকে যে মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছিল তার নাম ‘মাতুরোথ’। এমন কাকতালীয় ঘটনা কেমন করে ঘটল? সমস্যা তো এটাই।

“—শোন, বুঝিয়ে বলি। মসুয়েঁ মীগেরেঁ মিথ্যা বলেননি। ভুলটা হয়েছে ডাচ-ইন্টেলিজেন্স-এর। ‘লা-ম্যাগনিফিক’ থেকে মাতুরোথ নামের মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়েছিল অনেক পরে। মসুয়েঁ মীগেরেঁ রোকেব্রনে ছিলেন 1936 থেকে 1938। উনি নাইস্-শহরে চলে যান পরের বছর, 1939-এর জুন মাসে। যে ইতালিয়ান-মেয়েটি ওঁর রোকেব্রন অবস্থানকালে জলে ডুবে মারা যায়, তার নাম ‘মাতুরোথ’ ছিল না। ‘লা-ম্যাগনিফিক’ থেকে যে-মেয়েটি চেক্-আউট না করে পালিয়ে যায়—যে রেজিস্টারে ‘মাতুরোথ’ নামটা লিখেছিল, সে রোকেব্রন-এ এসেছিল 1939-এর অক্টোবর-এ।

“—সে মেয়েটিই বা কে? সে কেন এসেছিল রোকেব্রনে? আর রাতারাতি পালিয়েই বা গেল কেন? তুমি জানো?

“—জানি। সে রোকেব্রনে গেছিল তার বাপের খোঁজে। তিন চার বছর বয়সে সে বাপকে হারিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে চলে গেছিল পৃথিবীর অপরপ্রান্তে, ডাচ-ইন্ডিজের ব্যাটাভিয়ায়। তাই ইউরোপে ফিরে এসে দুরন্ত কৌতূহলে সে খুঁজছে তার হারানো বাপকে। তার মা নেই, দাদা শহীদ হয়েছে, এ দুনিয়ায় আত্মীয় বলতে একমাত্র তার বাবা। প্রথমে গিয়েছিল হল্যান্ড। সেখানে গিয়ে শোনে, তার বাবা সজীব চলে গেছেন ফ্রান্সে। আছেন সেখানকার রোকেব্রন শহরের ‘প্রিমেভরায়’। ইতিমধ্যে ডাচ-পুলিস তার পিছনে লেগেছে। মেয়েটি লুকিয়ে হল্যান্ড থেকে পালিয়ে গেল ফ্রান্সে। ডাচ-পুলিসের খারশা, ও হচ্ছে ‘জিগ’—জ্যাক মীগেরেঁর প্রণয়িনী। প্রণয়িনী কেন? যেহেতু ওরা খবর পেয়েছে জ্যাক আর জিল বারে বারে একই হোটেলে উঠেছে, একই ঘরে রাত্রিবাস করেছে। ওরা সন্দেহ করেনি—তার হেতু, ওরা আপন ভাইবোন। হল্যান্ডে ডাচ-পুলিসের তাড়া খেয়ে ঈনেভ পালিয়ে গেল ফ্রান্সে। তখন সে ডাচ-পেইটাসর্সদের নিয়ে রিসার্চ করে। মীগেরেঁর বিষয়ে তার বিশেষ কৌতূহল। মাতুরোথ নামটা পর্যন্ত জানে। রোকেব্রন-এ এসে সে জানতে পারল ওর বাবা কয়েক মাস আগে ‘প্রিমেভেরা’ ছেড়ে চলে গেছেন ইতালীতে নাইস্-শহরে। যেখানে যাওয়ার সাহস কায়নি, কারণ ততদিনে বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছে। ইতালী নিশ্চিত থাকবে মিত্রপক্ষের বিপরীত ক্যাম্পে!

“বব্ব বুঝেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল তার।

“সেই ছোট্ট ইনেভ এতদিন পরে তার হারানো বাপিকে খুঁজে পেয়েছে! কিন্তু তার সেই তুরঙ্গের টেকাটা আজ আর কোন কাজে লাগবে না। হান ভাঁ ঘীগেরঁকে জানানো যাবে না, কেন প্রথম দিন অ্যাগনেসকে দেখে তাঁর মনে পড়ে গেছিল অ্যানার কথা!

ইতিমধ্যে পুলিশে তাঁর স্বাবর-অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করেছে। দেনার দায়ে। নকল ছবি বেচে তিনি যা উপার্জন করেছেন তার মূল্য প্রত্যর্পণ করতে বলা হয়েছে! তাঁর ঐ অতুল বৈভব দিয়েও সেই দামটা আজ মেটানো সম্ভবপর নয়। বৃদ্ধ তাই দেউলিয়া হবার জন্য দরখাস্ত করেছেন। সেজন্য কিন্তু উনি আদৌ ক্ষুব্ধ নন। বললেন, কার জন্য বিষয়সম্পত্তি রেখে যাব, মা? তিনকুলে আমার কে আছে যে যথের ধন আগলে রাখব? এ ভালই হল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আমার কেউ নেই, যার জন্য এই দেউলিয়া মানুষটা আজ লজ্জা পাবে।

“বলেছিলাম, আপনার স্ত্রী জোহানা...

“— না, না, তার কথা বলছি না। সে তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে! তাকে যা দেবার তা তো দিয়েছি। পুলিশ সে সম্পত্তির নাগাল পাবে না। আমি বলছি, অ্যানার কথা, জ্যাক আর ইনেভের কথা।

“— অ্যানা আর জ্যাক মারা গেছেন শুনেছি; কিন্তু আপনার ছোট মেয়ে ইনেভ তো একদিন এসে হাজির হতে পারে?

“— ঈশ্বরের কাছে এখন আমার ঐ একটিই প্রার্থনা—দেউলিয়া বাপকে লজ্জা দিতে সে হতভাগী না শেষ সময়ে এসে উপস্থিত হয়!

“— সে হতভাগী আজ আর তাই এসে উপস্থিত হতে পারছে না তার দেউলিয়া বাপের কাছে।”

হঠাৎ বাইরের ঘরে কলিং বেলটা বেজে উঠল।

ল্যান্ডলেডি বোধহয় মার্কেটিং সেরে ফিরে এলেন। ইনেভ ডায়েরীটা বন্ধ করে চলে এল বাইরের ঘরে। এতক্ষণে অঙ্ককার ঘনিয়ে এসেছে। প্রবেশপথের সুইচটা ছেলে সে সদর-দরজা খুলে দিল। ২, ল্যান্ডলেডি মিসেস্ তেবুর্গ নন। একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কঙ্কালসার, দুর্বল। গায়ের কোট-প্যান্ট নিতান্ত বেচপ। ভিক্ষুক নাকি?

— মসুঁয়ে তেবুর্গ কি বাড়িতে আছেন?

— মসুঁয়ে তেবুর্গ। না, নেই। তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন।

— ও! মারা গেছেন? কী হয়েছিল তাঁর?

— আমি তাঁকে দেখিনি। শুনেছি বন্ধিঙে। ঠিক জানি না।

— আর মাদাম তেবুর্গ?

— তিনি এখানেই থাকেন। এখন বাড়ি নেই। আপনি কি ভিতরে এসে বসবেন?

— না। মানে, আমি জানতে এসেছিলাম, ঐ সামনের বাড়িটায় কে তালা দিয়েছে? ওর চাবিটা কোথায় পাওয়া যাবে? ঐ যে, ঐ 263 নম্বর বাড়িটা।

বিশীর্ণ তক্তনী তুলে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা অঙ্ককার বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন, প্রেতের মতো কঙ্কালসার মানুষটি।

— ও বাড়িতে কেউ তো থাকে না এখন। চাবি কে দিয়েছে জানি না। কেন বলুন তো?

— আমরা ওখানেই থাকতাম...ইয়ে, আপনার কাছে টর্চ আছে?

নেভ বুঝতে পারে, ভদ্রলোক ইহুদী। নাৎসী অধিকারের সময়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন খুদ্বাস্তে ফিরে এসেছেন। সে একটি টর্চ নিয়ে এগিয়ে এল। সদর-দরজা বন্ধ করে পথে নামল। বলল, চলুন, আমি আলো নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছি।

দরজায় তাল দেওয়া। কিছু বাড়িতে ঢুকতে অসুবিধা হল না। বোমা-বর্ষণে একটা বড়-জানলা ভেঙে গেছে। ভদ্রলোক ঈনেভকে সাহায্য করলেন জানলা টপকিয়ে ভিতরে ঢুকতে। বাইরের ঘরে সব কিছুই অবিন্যস্ত অগোছালো। চেয়ার-টেবিল বোমাবর্ষণের সময়ে ছিটকে পড়েছিল হয়তো—কেউ সেগুলি স্বস্থানে টেনে আনেনি আর। পিছনের দেওয়ালে একটা বুক কেস। তার পিছনে দ্বিতলে ওঠার চোরা কাঠের-সিঁড়ি। সহজে নজরে পড়ে না। প্রৌঢ় লোকটি নিশ্চয় তার অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ধ্বংসস্থল এড়িয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দ্বিতলে। টর্চের আলো ঝেলে পিছন পিছন ঈনেভও উঠল। দ্বিতলে ‘সেলার’—ঘরটার নিচু ছাদ। সেখানেও একটি টেবিল—উস্টে পড়ে আছে। দু-চারখানা চেয়ার, আর টুল, বেশি ইতস্তত ছড়ানো। ভদ্রলোক সেই জনশূন্য চোরা-কুঠুরির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী যেন খুঁজছেন তিনি।

ঈনেভ বুঝতে পারে—উনি খুঁজছেন অতীত-স্মৃতি। পার্থিব কোনও সম্পদ নয়।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে উনি বললেন, চলুন, নিচে যাওয়া যাক।

নাশবার পথে কিসে যেন হেঁচট খেলেন ভদ্রলোক। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন জিনিসটা। ঈনেভ টর্চের আলো ফেলল তাঁর উপর। একটা বাঁধানো বই। না, বই নয়, একটা ডায়েরি মতন যেন হল। ওর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ভদ্রলোক সেটা দেখতে থাকেন।

ঈনেভ বলে, কী ওটা?

— একটা ডায়েরি। আমার মেয়ের লেখা। ওর দ্বাদশ জন্মদিনে ওকে আমিই উপহার দিয়েছিলাম। ও যে ডায়েরি লিখত, সেটাই জানা ছিল না। যাক, চলুন।

ওরা আবার জানলা গলিয়ে নেমে এল পথে।

ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে চললেন ওয়েস্টারকার্কের দিকে। হঠাৎ থমকে পড়ে বললেন, মাদাম তেবুর্গকে বলবেন, আমি একাই বৈঁচে ফিরে এসেছি। আমার নাম অটো ফ্রাঙ্ক। উনি না চিনতে পারলে বলবেন, Anne Frank-এর বাবা।

॥ এগারো ॥

ভাঁ মীগেরেঁ সম্বন্ধে যতগুলি বই পড়েছি, তাতে একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনি।

কেন তিনি প্রথম দিনই বলে দেননি, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ‘যীশু ও পতিতা’ ছবিখানা আমি অমুককে এত সালে বিক্রি করেছিলাম।”—তাহলেই তো তিনি সেদিন বিপদমুক্ত হতে পারতেন। কারণ, তাঁর কাছে তো সেইটুকুই জানতে এসেছিল দুজ্ঞ আর দুমা। বড় জোর তিনি আগ্ বাড়িয়ে বলতে পারতেন, ‘আপনারা অহেতুক ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করছেন মশাই! — ঐ ‘যীশু ও পতিতা’ ছবিখানা আদৌ অরিজিনাল ভেরমেয়ার’ নয়। সে-কথা আমি বুঝতেও পেরেছিলাম। এখনো ‘রেডিওগ্রাফ’ করলে দেখতে পারেন, ঐ ছবিটার নিচে একটা প্রাচীন যুদ্ধদৃশ্য আছে! ওটা ব্রহ্মা নকল ছবি ! নাৎসী-চোরদের উপর কেউ যদি বাটপাড়ি করে থাকে, তবে তাকে

জাতীয়-সম্পদ বিক্রয়ের দায়ে ফেলা যায় না!’

তাহলেই সব লেঠা চুকে যেত। ওঁকে থেপ্তার করার কোন প্রয়োজনই হত না। ঐ প্যারামিলিটারী ফোর্স-এর কাজ জাতীয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা। যে মুহূর্তে ওরা জানতে পারত যে, অস্ট-ওসী অঞ্চলে উদ্ধার পাওয়া ‘যীশু ও পতিতা’ খানা ভেরমেয়ারের আঁকা নয়, সেই মুহূর্তেই ওরা তদন্তে ক্ষান্ত হত। কোথায় কে জাল ছবি আঁকছে তা ধরা ওদের কাজ নয়।

কিন্তু তার বদলে হান মীগেরেঁ যে কাণ্ডটা করলেন তা অবিশ্বাস্য!

ছয়-সপ্তাহ অহেতুক সলিটারি-প্রিজন্-এ আটক থেকে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। ভেঙে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। সুখী মানুষ তিনি, অতুল বৈভবে অভ্যস্ত। নির্জন কারাগারের যন্ত্রণা, জেলের আহাৰ্য-পানীয়, বিশেষ করে মর্ষিয়ার অভাব তাঁকে ভূতলশায়ী করেছে। কিন্তু এই সহজ পথটা, উদ্ধারের সরল উপায়টা কেন তাঁর নজরে পড়ল না?

সত্যি কথা বলতে কি, এটা যদি সত্য ঘটনা না হত, ইতিহাস না হত—অর্থাৎ মীগেরেঁ যদি উপন্যাসিকের একটা মনগড়া চরিত্র হত, তাহলে আমি সাহস করে ঘটনাটা লিখতে পারতাম না। ঐ রকম একজন ধুরন্ধর প্রবন্ধকের পক্ষে মুক্তির এমন একটা সহজপথ খুঁজে না পাওয়া স্বাভাবিক নয়! যে কায়দায় তির্যকপথে ডক্টর ব্রেডিউসকে দিয়ে ‘ইস্মেয়ূস পাশ্চালায় যীশু’ ছবিটির সাটিফিকেট আদায় করেছিলেন তাতে তাঁকে পাকা প্রবন্ধক বলতেই হবে—সেটা ইতিহাস। আবার যেভাবে তিনি ধরা দিলেন তা নিরুদ্ভিতার চরম পরিচয়। বিশ্বাসের কথা—সেটাও ইতিহাস! উপন্যাসের চরিত্রে এই আপাত-অসঙ্গতি কেউ মেনে নিত না।

এই আপাত-অসঙ্গতির কথা ওঁর জীবনীকারেরা কিন্তু কোন আলোচনা করেননি। আমার যা মনে হয়েছে সেটা লিপিবদ্ধ করার আগে বরং বলি ভাঁ মীগেরেঁ সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ নাড়াচাড়া করেছি তাতে লক্ষ্য হয়েছে ওঁর প্রবন্ধকের ভূমিকাটুকুই সবাই দেখেছেন ও দেখিয়েছেন! যদিও তাঁর আঁকা ছবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশালায় প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর জীবিতকালে, লক্ষ লক্ষ ডলারে তা কেনা-বেচা হয়েছে, তবু চিত্রকর হিসাবে তাঁকে কোন সম্মান দিতে আর্ট-ইতিহাস অসম্মত। তাঁর শেষ চিত্র — যেটি জেলখানায় বসে তিনি আঁকেছিলেন — ‘যুবক যীশু’, সেটি নিলামে বিক্রি হয়েছিল মাত্র তিনশত পাউন্ডে! নিলামে সেখানা কিনে নেন স্যার আর্নেস্ট ওপেনহাইমার—না, অ্যাটম-বোমা-খ্যাত সেই ব্যক্তিটি নন, ইনি ছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার এক কোটিপতি হীরক ব্যবসায়ী, উদারচেতা সমাজসেবী। অপ্রয়োজন হলেও উল্লেখ করি, তাঁর পুত্র প্যারী ফ্রেডারিক এ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন।

যাক, যে-কথা বলছিলাম—আর্ট-ইতিহাসে হান ভাঁ মীগেরেঁর পরিচয় শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধক হিসাবে। তাঁর প্রামাণ্য জীবনীকার লর্ড কিলব্রাথেন গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “Han van Meegeren, beyond doubt, had been the most successful known forger of all time. He still is. That, for what it’s worth, is his claim for immortal glory. His entire edifice had been constructed on a completely false value judgement. A man of integrity would have known this in his heart and it may be that van Meegeren knew it. He himself had been a fake, just as his Vermeers had been.” [নিঃসন্দেহে হান ভাঁ মীগেরেঁ শিল্প-ইতিহাসের সর্বকালের

সর্বাপেক্ষা সাক্ষ্যমণ্ডিত প্রবন্ধক। আজও তিনি তাই। তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার দাবীর এটুকুই মূল্যায়ন করা চলে। সে দাবী ধূলিসাৎ হয়েছে। তাই হয়। তাঁর প্রাসাদের বনিয়াদে আছে ভ্রান্ত মূল্যায়নের ধারণা। যেকোন সংলোক এ তত্ত্বটা অন্তরের অন্তঃস্থল জানে; সম্ভবত তাঁ মীগেরেরও সোটা জানতেন। তাঁর আঁকা ভেরমেয়ারের মতো সেই মানুষটিও ছিলেন নকল।]

মীগেরের উপর দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থটি ডেকোয়েন-এর লেখা (Back to the Truth, 1951 by M. Jean Decoen)। তিনি ছিলেন মীগেরের অভিমুখিকারে নিযুক্ত শিল্পবিশারদ দলের দলপতি। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই ভ্রান্ত পথিকের জন্য করুণা করেছেন, অশ্রুপাত করেছেন, কিন্তু মীগেরে যে কখনো কোন সার্থক ক্যানভাস একেছেন এ-কথা মানতে গররাজি! এঁদের দুজনের একজনও কিন্তু মীগেরের আঁকা কোন ছবিকে আসল বলে সার্টিফাই করেননি— অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিদ্রোহপ্রসূত নয় তাঁদের বক্তব্য। অথচ মজার কথা, এ ডেকোয়েন 1946 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—যখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি, যে, ‘ইন্সম্মুস পাহাশালায় যীশু’ মীগেরের আঁকা—একটি প্রখ্যাত আর্ট-জার্নাল La Lanterne-তে লিখেছিলেন, “The least that can be said of this affair is that we are here dealing with a sinister hoax. The picture in the Boyman’s [i.e., The Emmaus], is a genuine work of the 17th century and is by Jan Vermeer of Delft. By painting the young Christ, van Meegeren proved decisively that it was not he who had executed the Emmaus.” [এ ব্যাপারে অন্তত এটুকু বলা চলে যে, আমরা একটা শয়তান প্রবন্ধকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। বয়ম্যান সংগ্রহশালার চিত্রটি (অর্থাৎ মীগেরের আঁকা ‘ইন্সম্মুস পাহাশালায় যীশু’) সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত। ডেলফৎ-এর জাঁ ভেরমেয়ারের তুলির স্পর্শধন্য। জেলখানায় বসে জাঁ মীগেরে যে ‘যুবক যীশু’ ছবিখানা একেছে তাতেই সন্দেহাতীতভাবে আজ প্রমাণ হয়ে গেল ‘ইন্সম্মুস’ তাঁর আঁকা নয়।]

ছেচরিশ সালে, মীগেরে জেলখানায় বসে ‘যুবক যীশু’ শেষ করার পরেও যিনি এ-কথা লিখে আর্ট জার্নালে ছাপিয়ে দিতে পারেন, তিনিই ছিলেন আদালত নিযুক্ত আর্ট-কনৌশারদের মুখপাত্র! অবশ্য জাঁ মীগেরের সব কয়জন জীবনীকারই আহা-উহ করেছেন। প্রতিভার মৃত্যুতে, এই ভ্রান্তপথিকের জন্য চোখের জল ফেলেছেন। সহানুভূতি জানিয়েছেন!

কিন্তু শিল্পী কি সহানুভূতির কাঙাল? সে চায় স্বীকৃতি। চোখের জল ফেলা এক জিনিস, আর ‘মাথার টুপি খোলা’ অন্য জিনিস! শিল্পী— তা সে যে-কোন মাধ্যমের হোক—মঞ্চ, সিনেমা, যন্ত্র-কণ্ঠ সঙ্গীত, সাহিত্য—দ্বিতীয়টা চায়, প্রথমটা নয়। দেবদাস যদি শিল্পী হত, তাহলে শরৎবাবু তাঁর উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদটা অন্যভাবে লিখতেন! দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে শিল্পী জানতে চায় না—কারও চোখ অশ্রুসজ্জল হয়ে উঠেছে কি না। বরং সে জানতে চায় : কেউ মাথার টুপিটা খুলেছে কিনা। মৃত্যুপথযাত্রীর উদ্দেশ্যে, তার সৃষ্ট শিল্পের উদ্দেশ্যে। অন্তত আমি তো তাই বুঝি! নিজের অনুভূতি দিয়ে। আমি যদি খ্রীষ্টান হতাম, আর মাইকেলের মতো নিজের ‘এপিট্যাফ’ নিজেই লিখে যাবার সুযোগ আমার থাকত, তাহলে আমার কবরে এই কয়টি পংক্তি উৎকীর্ণ করার নির্দেশ রেখে যেতাম :

“When I am dead,
Let this may be said :

The man was but naught,
But his books were read!"

তাই অনুমান করতে পারি : কেন মীগেরেঁ-চরিত্রের ঐ আপাত-অসঙ্গতি ! দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে সে বলে যেতে চেয়েছিল : তোমরা যে শিল্পীকে স্বীকৃতি দাওনি, তুচ্ছ করেছ, —হে মহান আর্ট-কনোশারদল ! সেই নিগ্ৰহীত শিল্পীর ছবিই কিন্তু তোমরা কেনা-বেচা করেছ লক্ষ-লক্ষ ডলারে ! সাজিয়ে রেখেছ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালায় ! তোমার স্বৈচ্ছায় দাওনি—আমি নিজেই স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছি।

এই কথাটা বলে বুকটা হাল্কা করতে চেয়েছিল ! স্বৈচ্ছায় তাই ছয়-সপ্তাহকাল বন্দীদশায় নির্যাতন সয়েছে, মফিয়ার অভাবে দেওয়ালে মাথা ঝুঁড়েছে, তবু মুক্তির সহজপথটা বেছে নেয়নি ! জানত—সত্য কথা স্বীকার করলেই তার সম্পত্তি ক্রোক করা হবে, সে দেউলিয়া হয়ে যাবে, হয়তো বাকি জীবন জেলে পচে মরতে হবে। হয় হোক, তবু সে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সব কিছু খুইয়েও সে শিল্পী-হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চেয়েছিল !

মানছি, তার আঁকা মৌলিক চিত্র স্বীকৃতি পায়নি। সবই অনুকরণ।

কিন্তু অনুকরণ মাত্রের কি অপাংক্লেয় ? ফিডিয়াস, প্র্যাক্সিটেলিজ-এর শিষ্যরা গুরুর কাজের যেসব অনবদ্য অনুকরণগুলি করেছিলেন তা তো আমরা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছি পারীর লুত-এ, আমসটাডার্মের রাইখ্ সংগ্রহশালায় ? ‘ভানুসিংহের পদাবলী’ তো একটি বিশেষ যুগের শৈলীর অনুকরণ ? সেখানেও তো কবি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন ?

স্বীকার : অনুকরণ তখনই সার্থক যখন শিল্পী সে-বিষয়ে পূর্ব-স্বীকৃতি দিয়ে রাখেন। ক্ষেত্রবিশেষে তা পরেও দেওয়া চলে—যেমন দিয়েছিলেন ভানুসিংহ। ললিতকলার যে কোন বিভাগে অনুকরণ রসোদীর্ণ হবার সেটাই ছাড়পত্র —অ্যাসিড-টেস্ট। কিন্তু তাতেও কি প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের কাছে নবীন শিল্পযশপ্রার্থী স্বীকৃতি পায় ?

পায় না। অন্তত চ্যাটার্ণ পায়নি।

টমাস চ্যাটার্ণ-এর (1752-70) জন্ম ব্রিস্টলে, ইংলন্ডে। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার দেহান্ত ঘটেছিল। মা সেলাই করে গ্রাসাচ্ছাদন নিবাহি করতেন। অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সেই বস্তীর ছেলেটা বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিল। সাত বছর বয়স থেকেই সে কবিতা লেখে ! ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের ফাদার ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শৈল্প-বয়। ঝাড়-পোঁছ করে, বাগানে ফুলগাছে জল দেয়। আর লাইব্রেরী-ঘরের আলমারিগুলো সাফা রাখে। ফাদারের কল্যাণেই অক্ষর-পরিচয়। পড়ত বাইবেল ! কিন্তু দুদান্ত উৎসাহ ছেলেটার। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সে গ্রন্থাগারে সহজ বই থেকে ক্রমশ শক্ত বইগুলো পড়তে শুরু করল ! শিশু বিদ্যাসাগরের মত রাত জেগে, রাস্তার আলোয় ! দশ বছর যখন তার বয়স, তখন লিখে ফেলল একখানা চম্পূকাব্য : On the last Epiphany ; পাণ্ডুলিপি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দশবছরের চ্যাণ্ডাকে কে পাতা দেবে ? প্রকাশকেরা হাঁকিয়ে দেয়, কাগজের সম্পাদকেরা ঘরেই ঢুকতে দেয় না। কিন্তু সে হার মানবে না কিছুতেই ! পড়তে শুরু করল চার্চ-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রাচীন কবিদের গাথা। অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি, স্বর্গত পাদরীদের অপ্রকাশিত রচনা। তারপর একদিন ! দারুণ এক দুষ্টিবুদ্ধি চাপল তার মাথায়। দুঃসাহসী কিশোর এক বিপদজনক ছলনার আশ্রয় নিল। তিনশ বছর পূর্বকার ইংরেজী সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ অনুকরণ

করে তদানীন্তন রচনা-শৈলীতে সে লিখে ফেলল একখানি অনবদ্য দীর্ঘ গীতিকবিতা: “The Ryse of Peyncteyne in Englande”, Wroten by T. Rowlie, 1469, for Master Canynge.”

আজ্ঞে হ্যাঁ, ‘Englande’-এর এক প্রাচীন কবি কর্তৃক ‘Wroten by’! পঞ্চদশ শতকে ঐ বানানেই লেখা হত England অথবা written by!

প্রাচীন তুলট-কাগজে ওল্ড-ইংলিশ হস্তাক্ষরে কবিতাটি আদ্যন্ত পুনর্লিখন করল সযত্নে। কিছুটা জলে ভিজিয়ে, রোদে শুকিয়ে যায় ফায়ার-প্রেসের আগুনে পৃষ্ঠার না-লেখা অংশটা ঝলসে নিল। রগড়ে নিল চার্চের পবিত্র ধূলিতে। তারপর পুরানো দড়িতে পুঁথির আকারে বেঁধে ফেলল। সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানি কিশোর কবি পাঠিয়ে দিল স্বনামধন্য আর্ল হোরেস্ ওয়ালপোলকে। মহাপণ্ডিত তিনি—কবি গ্রে এবং স্যার হোরেস্ মান-এর বন্ধু। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ‘বানানভুলে ভরা’ একখানা ছোট্ট চিঠি। তাতে ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের এক অজ্ঞাতনামা পেজবয় মহামহিম আর্লকে জানাচ্ছে যে, সে গীজার এক ভূগর্ভস্থ ‘ক্যাটাকুম্’ থেকে ঐ পুঁথিটি উদ্ধার করেছে। পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। তাই স্যার ওয়ালপোলকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক যে ভঙ্গিতে হান ভাঁ মীগেরেঁ একখানা ছবি নিয়ে ডক্টর বুন তথা ব্রেডিউস এর দ্বারস্থ হয়েছিল!

স্যার হোরেস ওয়ালপোল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, যেমন হয়েছিলেন ব্রেডিউস! ওয়ালপোল সেই প্রায়-নিরক্ষর পেজবয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পত্র দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটি সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হল ওয়ালপোলের প্রবন্ধ : নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্রিস্টলের সেন্ট মেরী চার্চের এক অশিক্ষিত খিদমদগারের মাধ্যমে তিনি একটি অত্যশ্চর্য পুঁথি উদ্ধার করেছেন। পঞ্চদশ শতকের এক প্রতিভাময় মহাকবির পাণ্ডুলিপি! অনতিবিলম্বে সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। ওয়ালপোলের মতে ঐ কবি কালের নিরিখে ইংরাজ কবি জিওফ্রি চশার এবং উইলিয়ম শেক্সপীয়ারের মধ্যবর্তী অবস্থানে। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : দীর্ঘ দুইশত বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর এই অপরিচিত কবি ‘রোলী’ হতে চলেছেন ইংরাজী কাব্য-ইতিহাসের এক স্থায়ী দিকচিহ্ন! প্রবন্ধে তিনি কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিও দিলেন, উৎসাহটা উদ্দীপিত করতে!

হে-হে পড়ে গেল পণ্ডিত মহলে! শুরু হয়ে গেল নানান আলোচনা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ। সবাই উৎসাহে হয়ে প্রতীক্ষা করছে, কবে প্রকাশিত হবে সেই বইটি।

মীগেরেঁর ‘ইন্মায়ুস পাস্থশালায় যীশু’ প্রদর্শিত হয়েছিল বয়ম্যান্‌স্ সংগ্রহশালায়। মন্ত্রীমহোদয় সে প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেছিলেন। কিন্তু কিশোর-কবি চ্যাটার্টনের সেই চম্পু-কাব্য কোনদিন ছাপাখানার মুখ দেখল না। কেন জানেন? কারণ সাহিত্যপত্রিকার উচ্ছ্বাস দেখে, ওয়ালপোলের প্রশংসা শুনে উৎসাহিত কিশোর আদ্যন্ত সত্যকথা এবার জানিয়ে দিল। ওয়ালপোলকে চিঠি দিয়ে জানালো—এবার কিন্তু একটাও বর্ণাশুদ্ধি নেই সে পত্রে—জানালো, —কীভাবে দোরে দোরে সে খুরেছে তার কাব্যখানি নিয়ে। কোনও প্রকাশক বা সম্পাদককে তার পাণ্ডুলিপি পড়াতেই পারেনি, এবং কীভাবে একক সাধনায় সে ঐ কাব্যখানি রচনা করেছে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে স্যার ওয়ালপোলকে পাঠিয়েছে।

ফল কী হল?

খিকার, অশ্মান, তিরস্কার! ছি-ছি-ছি! এ কী অন্যায় কথা! চ্যাটার্ণ চিহ্নিত হল অষ্টাদশ-শতাব্দীর সর্বকথ্য প্রবঞ্চক রূপে!

হবেই! ইতিপূর্বে যেসব সাহিত্য মহারথী কবি রোলীর ছিটে-ফোঁটা উদ্ধৃতি-পাঠে মুগ্ধকচ্ছ হয়েছিলেন, তাঁরা মমাস্তিক চটে গেলেন! অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদল! আত্মাভিমান আঘাত লাগলো সবার। এক-ফোঁটা একটা চার্চের শেজবয় এভাবে ডি.লিট., ডি. ফিল, ডন-দের নাকে ঝামা ঘষে দেবে! ইয়ার্কি নাকি! ওঁরা সমবেতভাবে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেন!

এ আঘাত সহ্য করতে পারল না কিশোর-কবি। বার্থ মর্মান্বিত চ্যাটার্ণ মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুকালীন জ্বানবন্দিতে নাকি তিনি লিখেছিলেন—“আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী ইংরাজী-সাহিত্যের বর্তমান যুগের তথাকথিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা!”

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি।

এবার যেমন পণ্ডিতপ্রবর ডোকোয়েন বললেন, মীগেরের পক্ষে এ ‘ইন্সমুয়ুস্ পাশুশালায় যীশু’ ছবিখানি আঁকা সম্ভবপর নয়, সেটা এতই উচ্চমানের—সেবারও একদল পণ্ডিত বলেছিলেন—এ চ্যাটার্ণ-ছোকরার পক্ষে ‘রোলীর’ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করা সম্ভবপর নয়,—সেটা এতই উচ্চমানের! তাঁদের মত : রোলী নামের এক শক্তিশালী কবি সত্যই ছিলেন পঞ্চদশ শতকে। তাঁর এ কাব্যখানি সত্যসত্যই পড়েছিল সেন্ট-মেরী চার্চের ডুগর্ডহ ‘ক্যাটাক্যুথ’-এ! ও ছোকরা পদ্য-টদ্য লিখত—সে পাণ্ডুলিপিখানি খুঁজে পায়। পড়ে মাথামুগ্ধ কিছুই বুঝতে পারে না। পারবে কোথেকে? স্থুলে-কলেজে পড়েনি তো? অথচ লোভটুকু যোলআনা! যেই শুনল—কাব্যটি ইংরাজী সাহিত্য-ইতিহাসে এক অনবদ্য সংযোজন হতে চলেছে, অমনি ফস্ করে বলে বসল, আজ্ঞে, ওগুলি এই অথমেরই রচনা!

চ্যাটার্ণের আত্মহত্যার পর দীর্ঘ একশ বছর ধরে এ বিতর্কের সমাধান হয়নি। একদলের বিশ্বাস—কবির মৃত্যুকালীন জ্বানবন্দি মিথ্যা হতে পারে না, অপর দলের বক্তব্য—সেটিমেন্টালিটির স্থান নেই নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যে-বিচারে। এ মহান সাহিত্য একটি অকালপক্ক অশিক্ষিত কিশোরের কলম থেকে জন্মতে পারে না!

সব বিতর্কের যবনিকাপাত ঘটল 1871 সালে। পণ্ডিতপ্রবর স্ফীট দীর্ঘদিন গবেষণা করে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করলেন : পঞ্চদশ শতাব্দীতে ‘রোলী’ নামে কোন কবি বাস্তবে ছিলেন না। এ পাণ্ডুলিপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত, রচনাটি এ অনাদৃত, অশ্মানিত কবির—যে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল! এই একশ বছরে কিশোর কবির ভরতাজা দেহটা কবরের নিচে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তবু স্ফীট-এর গবেষণা-গ্রন্থটি যেদিন প্রকাশিত হল—দুনিয়া যেদিন নতমস্তকে মেনে নিল—মহা-মহা রথীরাই ভুল করেছেন, চ্যাটার্ণ প্রবঞ্চক নয়—সেদিন কবির ভিতর এ ‘মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার’ সে বোধ করি মৃদঙ্গের তেহাই তুলে দ্রিমিদ্ৰিমি বোলে অটুহাস্য করে উঠেছিল।

বলতে ভুলেছি—কবি চ্যাটার্ণের মৃতদেহ এই একশ বছর ধরে শায়িত ছিল যে কবরখানায়, তার নাম : ‘শ্যু-লেন ওয়্যারহৌস্ পপার্স পিট’! সাদা বাঙলায় ‘মুচিপাড়ায় গুদামঘর-সংলগ্ন নিঃশব্দ ভবঘুরেদের বেওয়ারিশ কবরখানা’।

তফাৎ আছে। মানছি। হস্তলাঘবতা সাফল্যমণ্ডিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্ণ আত্মঘোষণা করেছিল

ভাঁ মীগেরেঁ করেনি। চ্যাটার্ণ তার প্রবন্ধনার ফসল ভাড়াঁরে তুলতে পারেনি, মীগেরেঁ পেরেছিল। কিছু সাদৃশ্যগুলিও অনস্বীকার্য : চ্যাটার্ণ দুনিয়ার কাছে চেয়েছিল একটু স্বীকৃতি, কবি হিসাবে। পায়নি। মীগেরেঁও চেয়েছিল সহজ সরল পথে একটু স্বীকৃতি, চিত্রশিল্পী হিসাবে। আর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে দুই প্রবন্ধকেরই এক হাল : কপর্দকহীন, দেউলিয়া!

হবে না ? পাপের ফল বাতাসে নড়ে! মাথার উপর ভগবান আছেন না ? হুঁ হুঁ বাবা!

॥ বারো ॥

হান ভাঁ মীগেরেঁর শেষ-বিচারটি অনবদ্য!

যেন লুই ক্যারল বা সুকুমার রায়ের পরিকল্পনা।

আসামী সেখানে প্রাণপণ চাইছে : তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হক!

প্রসিকিউশন চাইছে : ওকে বেকসুর খালাস দেওয়া হক!

যেন আসামী বলতে চায় : হজুর! জেল দিন, ফাঁসি দিন—কিন্তু ‘রায়’ দেবার সময় লিখে দেবেন—ঐ চৌদ্দখানি ছবির একখানাও হাল্জু-তেবুর্গ-ভেরমেয়ার আঁকেনি! স-ব, সবই অধমেরই আঁকা!

আর প্রসিকিউশন যেন বলতে চাইছে : অমন কাজটি করবেন না ধর্মাবতার! বেটাকে জেল দিন, ফাঁসি দিন, যা ইচ্ছে করুন—কিন্তু ট্যাক্স-পেয়ারের অর্থে সদাশয় সরকার বাহাদুর ঐ যে ছবিগুলি কিনেছিলেন, ওগুলি সাচ্চা বলে রায় দিন। না হলে বড় বে-ইজ্জতে পড়ে যাব যে আমরা, হজুর!

ইতিমধ্যে ইনকাম-ট্যাক্স বিভাগ এক বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আসামীর ঘাড়ে। মীগেরেঁ বে-আইনীভাবে যে অর্থোপার্জন করেছে কয় বছরে তার উপর। আর আর্ট-মন্ত্রক তাকে বলেছে, মীগেরেঁ যেন নকল-ছবি বাবদ অনায়্যভাবে উপার্জনের অর্থটা ফেরত দেয়! আর্ট-মন্ত্রককে অর্থটা প্রত্যর্পণ করলে কেন তাকে ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হবে, প্রশ্নটা কেউ ভেবে দেখছে না। দেউলিয়া মানুষটা তো কাউকেই কোন অর্থ দিতে পারবে না!

মিনিস্টার অব জাস্টিস্ বললেন—একটা কমিশন গঠন করা হক। সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ দল বিচার করে প্রথমে বলুন, ঐ ছবিগুলি মীগেরেঁর আঁকা নকল ছবি কিনা!

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। তেমন-তেমন সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে কোথায়?

সকলেই যে কোন-না-কোন সময়ে বলে বসে আছেন, সেগুলি ‘অরিজিনাল’! এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন, মায় তাঁদের সার্টিফিকেট-মোতাবেক সরকার এবং বিভিন্ন সংগ্রহশালা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সেগুলি খরিদ করেছে! এখন কোন লজ্জায় তাঁরা বলেন—এগুলি জাল! মীগেরেঁর উকিল তো আদালতে ছেড়ে কথা বলবে না। অনায়াসে সে প্রমাণ করে দেবে এক্সপার্ট হিসাবে সাক্ষী দিতে তারা অনুপযুক্ত! একই ছবিকে আজ বলে ‘অরিজিনাল’, কাল বলে ‘নকল’!

তাই কমিশন গঠন করতেই লেগে গেল সাত-আট মাস!

বন্দী ইতিমধ্যে বারে বারে দরখাস্ত করেছে : হজুর! আমি দোষী! আমাকে শাস্তি দিন।

যা হোক, অবশেষে জাস্টিস্ উইয়ার্দের চেয়ারম্যানশিপে একটি এক্সপার্ট-কমিশন গঠিত হক

ছেচল্লিশ সালের এগারোই জুন। তার মুখপাত্র কোরম্যান-সাহেব।

মজার কথা—হল্যান্ডের সাধারণ মানুষ কিন্তু এতদিনে আসামীর পক্ষে চলে গেছে! প্রথমে তারা চেয়েছিল—আসামীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। এখন সে ওদের ‘হিরো’! এটাও সরকারকে ভাবনায় ফেলেছে।

জনমানসের এ পরিবর্তনটা কিন্তু প্রত্যাশিত। পুলিশ প্রথমে বলেছিল—মীগেরেঁ একজন নাৎসী চর! সে জাতীয়-সম্পদ নাৎসীদের বিক্রয় করে দেবার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের নাম তাই গোপন রাখতে চাইছে। পুলিশ ইতিমধ্যে একটি অত্যন্ত জোরালো প্রমাণও খুঁজে পেয়েছে—যে কথা সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেওয়াও হয়েছে। হান ভাঁ মীগেরেঁর একটি স্কেচ-বই, শেন-অ্যান্ড-ইস্কে ঠাশা! তার প্রথম পাতায় লেখা আছে: “Dem gelieten Fuerher in dankbarer Auerkennwng— Han van Meegeren।”

ঘটনা বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। তখন হল্যান্ডের মানুষ নাৎসী-জামিনীর বিষজ্জরিত। ফলে প্রথম দিকে সংবাদপত্রে লেখা-পত্রে আমস্টার্ডামের সাধারণ মানুষ বিমোদগার করেছিল আসামীর বিরুদ্ধে! জেল নয়, লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত।

তারপর তিল তিল করে প্রমাণিত হয়ে গেল—মীগেরেঁ ঐ দুটচক্রের ধারে-কাছেও ছিল না। পুলিশ সে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—স্কেচ-বইয়ের প্রথম পাতায় হস্তাক্ষরটি মীগেরেঁর নয়। খাতাখানা বাজার থেকে কিনে কোনও নাৎসী সমরনায়ক মীগেরেঁর স্বাক্ষরের সামনে ঐ কয়টা কথা লিখে তার ফুরারকে উপহার পাঠিয়েছিল। এতদিনে মীগেরেঁ হয়ে গেছে অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রত্যাখ্যাত শিল্পযশপ্রার্থীদের ‘হিরো’। প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী হাতে গোনা যায়, প্রত্যাখ্যাতরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ! তারা ওর মধ্যে খুঁজে শেল তাদের নিজেদের পুঞ্জীভূত অপমানের, অভিমানের মূর্ত প্রতীক! ওরা যা পারেনি ওদের ‘হিরো’ তাই পেরেছে—ঐ তথাকথিত আর্ট-কনৌশারদের নাকে ঝামা ঘষে দেওয়া।

দীর্ঘ নয় মাসে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। দাখিল করলেন তাঁদের রিপোর্ট : হ্যাঁ, ঐ ছবিগুলি হান ভাঁ মীগেরেঁরই আঁকা! এতদিন বিচারের আশায় আসামী জেল-হাজতে পচছে। জামিন পায়নি। তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। বার দুয়েক তাকে ভ্যালেরিয়াম স্বাস্থ্যনিবাসের ‘ইন্টেলিভ কেয়ার ওয়ার্ডে’ নিয়ে যেতে হয়েছে। মিনিস্টার অব জাস্টিস্ মহামান্য আদালতকে তাগাদা দিলেন : তাড়াতাড়ি করুন। লোকটা বেঁচে থাকতে থাকতেই যেন শতাব্দীর সর্বকুখ্যাত সাজা হয়ে যায়! অবশেষে বসল সেই বিচার-সভা। সাতচল্লিশ সালের উনত্রিশে অক্টোবর।

ফোর্থ-চেম্বার এ বিচারালয়ের বিশালতম কক্ষ। তবু সব দর্শনার্থীর ঠাঁই হয়নি। আদালত-কক্ষটাকে আজ মনে হচ্ছে যেন একটা আর্ট-গ্যালারি। চার দেয়ালে একের পর এক বিশালায়তন সব তৈলচিত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের : ফ্রান্স হালজ্ দি হ্, ভেরমোর...না, না, কী-সব আবোল-তাবোল বক্ছি? সর্বজনশ্রদ্ধেয় আর্ট-কনৌশার দ্বারা গঠিত কমিশন তো ইতিপূর্বেই বলেছেন—ওগুলো হচ্ছে বিংশশতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চকের হস্তলাঘবতা। তা-হোক, বছর-খানেক আগেও ওগুলি বিশ্বের বিখ্যাত সব সংগ্রহশালায় শোভিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ

* “পরমপ্রিয় ফুরারকে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ—হান ভাঁ মীগেরেঁ।

ডলারে তাদের কেন্দ্র-বেচা হয়েছে, ক্যাটালগে ছাপা হয়েছে তাদের কৌলীন্যের পরিচয়। ঐ ছবিগুলির উপর থিসিস্ লিখে যাঁরা ডক্টরেট পেয়েছেন এবং যাঁরা সেন্সর থিসিস্ পরীক্ষা করে ডিগ্রি দিয়েছেন, তাঁরা তো কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াননি! তাঁরা তো অপমানিত, নিগৃহীত, দেউলিয়া হয়ে যাননি ঐ পলিতকেশ আসামীর মতো।

মাঝখানে বিচারকের আসন। তাঁর পিছনে হল্যান্ডের মহারানীর একটি বড় ছবি। কিন্তু সেটা আজ ম্লান দেখাচ্ছে, ক্ষুদ্রায়তন হয়ে গেছে—কারণ তার দু-পাশে দুখানি প্রকাণ্ড মাস্টারপিস্ : ‘ইন্ডায়ুস পাহুশালায় যীশু’ এবং ‘শেষ সায়মাশ’। যাদের মূল্য তদানীন্তন বাজারদরে ছয়লক্ষ পাউন্ড। বিপরীত প্রাচীরে যেন নূতন করে পলিটাস পীলেতের বিচারের প্রতীক্ষায় : যীশু—‘যুবক যীশু’। যে ছবিখানি আসামী পুলিশ-প্রহরায় ঐক্কেছে প্রমাণ দিতে যে, ভেরমেয়ারেরও রেজারেকশান হয়েছে!

ঠিক বেলা দশটায় প্রহরীর কাঁধে ভর দিয়ে অসুস্থ তাঁ মীগেরেঁ এসে বসল কাঠগড়ার চেয়ারে। পরমুহুর্তেই প্রবেশ করলেন অনারেবল্ জাস্টিস বৌল। সবাই উঠে দাঁড়ায়। বিচারক তাঁর আসন গ্রহণ করায় সবাই আবার বসে।

প্রেসের লোক আজ এসেছে ; কিন্তু আদালতকক্ষের ভিতর তাদের ফটো তোলা বারণ। লর্ড কিলব্রাথেনের গ্রন্থ পাঠে জানি—দর্শকদলে উপস্থিত ছিলেন আসামীর স্ত্রী জোহানা আর আসামীর কন্যা ঈনেভ।

নকীব প্রশ্ন করে : আপনার নাম অরিকুস আন্তোনিয়ুস ভাঁ মীগেরেঁ?

আসামী স্বীকার করল তার পিতৃদত্ত নামটা।

নকীব অতঃপর পাঠ করে শোনালো আট পাতার অভিযোগপত্রটি। পিনাল কোড-এর 326B এবং 326B ধারা মোতাবেক অর্থাৎ প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অন্যায় উপার্জন ও সংই জাল করা।

বিচারক এবার প্রশ্ন করেন : অভিযুক্ত। তুমি অপরাধদ্বয় স্বীকার করছ, না কংহ না?

আসামী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আমি বহুবার বলেছি, আজও বলছি : হ্যাঁ!

বিচার চলছিল বারই নভেম্বর পর্যন্ত।

বিস্তারিত বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন। আসামী তার অসুস্থ দেহ সত্ত্বেও বরাবর প্রফুল্ল ছিল। মাঝে মাঝে শাগিত যুক্তিতে নিজেই সওয়াল করেছিল—তীব্র আক্রমণে ভূতলশয়ী করেছিল সাক্ষীদের।

— একথা কি সত্য যে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি নিজেই একদিন ঐ ছবিখানি ‘অরিজিনাল ভেরমিয়ার’ বলে সার্টিফাই করেছিলেন, আর আপনার সুপারিশ মোতাবেক সরকার ঐ ছবিখানা বারো লক্ষ গিল্ডার্স দিয়ে কিনেছিল?

— হ্যাঁ, সত্য!

— আপনি বিশেষজ্ঞ-হিসাবে পরীক্ষা করে রায় দিয়ে আপনার ন্যায্য ‘প্রফেশানাল ফী’ হাত পেতে গ্রহণ করেছিলেন?

— অবজেকশন য়োর অনার। ইন্টারেলিভ্যান্ট। —আপত্তি জানায় বিপক্ষের উকিল।

— অবজেকশান ওভাররুলড। সাক্ষী জবাব দিন। —বিচারক রায় দেন।

— আঞ্জে হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।

মীগেরেঁ পুনরায় স্বলে ওঠে, এবং বর্তমানে আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে বলছেন, এ ছবিটি নকল? এবারও আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার ফী হাত পেতে নিচ্ছেন?

— আজে হ্যাঁ!

মীগেরেঁ বিচারকের দিকে ফিরে একটি বাও করে বলেন, এমন বিশেষজ্ঞকে আমার কোন প্রশ্ন নেই হুজুর!

বারই নভেম্বর বিচারক রায় দিলেন : গিল্টি! উভয় অপরাধই প্রমাণিত। সেজন্য অপরাধীকে তিনি এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিলেন। আইন-মোতাবেক এটিই ন্যূনতম শাস্তি! শতাব্দীর সর্বকুখ্যাত প্রবঞ্চককে এর কম শাস্তি দেবার ক্ষমতা স্বয়ং বিচারকেরও নেই।

অর্থদণ্ডের প্রশ্নই ওঠে না। আসামী ইতিপূর্বেই ‘দেউলিয়া’।

বিচারক আরও আদেশ দিলেন—তৈলচিত্রগুলি যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেখানে ফেরত পাঠাতে! শুধু অস্ট-ওসী থেকে উদ্ধার পাওয়া ‘অ্যাডলটারেস’-খানা হবে রাজকোষের সম্পত্তি। আসামীকে আপীল দায়ের করার জন্য দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া হল।

আসামী দৃঢ়কণ্ঠে ওখানেই বলে এল : দেয়ার শ্যাল বি নো অ্যাপীল!

অনেক পরে জানা গেছে, জেলখানায় অজ্ঞাতনামা এক অতি উচ্চপদস্থ সরকারী-অফিসার মীগেরেঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল টাইপ করা একটি আবেদনপত্র — ‘মার্সি পিটিশন’। তিনি বস্তৃত ছিলেন হল্যান্ডের মহামান্য মহারানীর ব্যক্তিগত দূত। মহারানী নাকি স্বয়ং ইচ্ছাপ্রকাশ করছেন—বন্দীকে মুক্তি দিতে। বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি যে কোন বন্দীকে মুক্তি দিতে পারেন, আবেদনপত্রটি পেলেই।

যে প্রবঞ্চক হাল্জ, দি-ব্, কিম্বা ভেরমেয়ারের স্বাক্ষর করতে সমর্থ সে নিজ নামটা ঐ কাগজের তলায় সই করতে পারল না। বললে, মাপ, করবেন! তা আমি পারব না! মহারানীকে বলবেন, তাঁর এই ক্ষমাসুন্দর প্রস্তাবটি হস্তগত হবার আগেই আমি অন্তরে আর একটি আমন্ত্রণবর্তা পেয়েছি। মহারানীর মায়ের কাছ থেকে—

বিস্মিত অফিসার অবাক হয়ে বলেন, মহারানীর মা! তার মানে?

— তাঁকে বলবেন, তিনি বুঝবেন! মা মেরী আমাকে কোলে টেনে নিতে সম্মত হয়েছেন।

‘প্রবঞ্চক’ বলে দূরে ঠেলে দেননি। অচিরেই এই কারা যন্ত্রণার অবসান হবে আমার।

তাই হল।

মাত্র দেড়মাসের মধ্যে ওঁকে স্থানান্তরিত করতে হল হাসপাতালে। সেখানে ঊনত্রিশে ডিসেম্বর ঐ প্রবঞ্চক সব প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেল। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিল একটি ফ্রেঞ্চ মহিলা—যেন নিকট-আত্মীয়! আর কিছু না, ঐ আর্টিস্টের নজরে পড়েছিল সেই অনাত্মীয়া মেয়েটির মুখের আদল তার একটি প্রিয়জনের মিষ্টি মুখের আদলে!

“গল্পের নায়ক-নায়িকাকে যদি ভালবাসতে না পার তবে কলমকে অব্যাহতি দিও—সেটা কলম-কালি আর কালের অপব্যয়।”—এ পরামর্শ অনুজ লেখকদের দিখে থাকি। নিজেও মেনে চলি। হান ভাঁ মীগেরেঁ—যত বড় ঘৃণ্য প্রবঞ্চকই হোক না কেন—আমি তাকে ভালবেসেছিলাম!

যে-অর্থে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের সর্বকুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক’কে ভালবেসেছিলাম, ঠিক সে-অর্থে হয়তো বিংশ শতাব্দীর চিত্রজগতের সর্বকুখ্যাত ‘প্রবঞ্চক’কে ভালবাসিনি। ‘বিশ্বাসঘাতক’ ডক্টর ক্রুজ ফুকস্-এর জন্য ছিল শ্রদ্ধা, আর ‘প্রবঞ্চক’ ভাঁ মীগেরেঁর প্রতি

নিছক ভালবাসাই!

কিছুতেই ভুলতে পারি না সেই উনিশ শো ষোল সালে দেখা তরুণ শিল্পযশপ্রার্থীকে!

যে ছেকরা এসেছিল ঘড়ি-আংটি বাঁধা-দেওয়া তার একক প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্রটি হাতে হাতে বিলি করতে আমার এই ভবানীপুর চক্রেবেড়িয়া বাড়িতে। বলেছিল, আসবেন স্যার দয়া করে। আমি বলেছিলুম, আমাকে কেন ভাই? আমি ইঞ্জিনিয়ার-মানুষ...তাছাড়া আমি তো কোন পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নই...

— জানি! তবু আসবেন!

উনিশ শো ষোল সালে অবশ্য আমার জন্মই হয়নি। না হোক, তাতে কী? ঐ মীগেরেঁ ছেকরাকে তো তারপরেও কতবার দেখেছি। আপানারাও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন তাকে—ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে যেতে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ময়দানে, যাদুঘরের উল্টোদিকে, হাওড়া-স্টেশনে, রুমাল বিছিয়ে স্কেচ করে চলেছে। দেখেননি? ইদানিং তাকে বইমেলাতেও নিশ্চয় দেখেছেন। মনে পড়ছে না? সেই যে রোগা, লম্বা, একহারা চেহারা, একমাথা চুল, এক মুখ দাড়ি, গায়ে তাল্লি দেওয়া আখময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে চম্পল, কাঁখে গেরুমারঙের শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ? ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলে-পুড়ে শাক হয়ে যাওয়া চারমিনার অথবা লালসুতোর বিড়ি?

একটু লক্ষ্য করে দেখবেন—চিনতে পারবেন মীগেরেঁকে। বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখবেন ওর চোখ দুটো। সে চোখের দৃষ্টিতে কখনো জঠরাগ্নির—দীপক, কখনো বেদনার—মল্লার, আবার কখনো বা লাজুক—বাহার!

আমাকে ও ভোলেনি, ভুলতেও দেয়নি। কী জানি কোথা থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আজও মাঝে মাঝে চিঠি পাঠায়। সাইক্লোস্টাইল-করা হাতে-লেখা আমন্ত্রণ-লিপি : আমি হান! তাঁ মীগেরেঁ। একটি একক-প্রদর্শনীর আয়োজন করা গেছে। দয়া করে একবার দেখতে আসবেন? কখনো সময় করে উঠতে পারি না। কখনো যাই, দেখে আসি। গেলে ও দারুণ খুশি হয়। আমি যখন ওর আঁকা স্কেচ-জলরঙ-তেলরঙের ছবিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি ও থাকে আমার পাশে-পাশে। বিদায় নেবার উপক্রম করলেই ভিজিটার্স-বুকখানা মেলে ধরে বলে : যা হোক কিছু লিখে দিন!

আমি পকেট থেকে কলমটা বার করবার উপক্রম করতেই আবার তাড়াতাড়ি একটা চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেয়। বলে, গলাটা আগে ভিজিয়ে নিন দাদা, কমেন্টস্ লেখা তো আছেই!

তখন ওর চোখে মল্‌হারী-দৃষ্টি।

আবার চা-পানান্তে যখন ওর খাতায় মন্তব্য লেখার উপক্রম করি তখন হঠাৎ নজরে পড়ে ও আমাকে ফেলে ছুটে যাচ্ছে দ্বারের দিকে। কোনও নামজাদা বাজারে-পত্রিকার পেশাদার সমালোচক এলেন হয়তো! আমি কী লিখলাম-না-লিখলাম তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। ও তখন ঐ শিল্প পণ্ডিতের পিছু পিছু ঘুরছে। সশঙ্ক চিত্তে! উনি না সর্বসমক্ষে বলে বসেন : অন্য কোন চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখ না বাপু—এখনো সময় আছে।

তবে হ্যাঁ, কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে অর্ধ শতাব্দীতে। ওকথা শুনে ও আর লজ্জায় মেদিনী-নিবদ্ধ দৃষ্টি হয় না। তখন লক্ষ্য করে দেখেছি, মীগেরেঁর চোখে জ্বলে ওঠে : দীপকরাগিণী!

